সাধনা।

মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

প্রথম বর্ষ।

প্রথম ভাগ।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

আগে চল্ আগে চল্ ভাই!
পড়ে' থাকা পিছে, মরে' থাকা মিছে,
বেঁচে মরে' কিবা ফল ভাই!
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

মাসের সূচিপত্র।

চিত্রের সূচিপত্র।

সূচিপত্র।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১৩	২০	গ্রন্থবৎ	যন্ত্রবৎ
৩৫৫	৮	গুপ্ত	তপ্ত
৩৬৮	১৭	অনুসারে	অনুমানের
৩৭০	২৩	থাকেন	থাকে

যে ভুলগুলি থাকায় অর্থবোধের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা সেইগুলিই সংশোধিত হইল। অন্যান্য ত্রুটি পাঠক মহাশয়েরা সংশোধন করিয়া লইবেন।

ভবন হইতে লোকাকীর্ণ পথের এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত সমস্তই তোমার কল্পনা-চক্ষে আবির্ভূত হইল; সেই কল্পনার ছবির উপরে তোমার বুদ্ধির আলোক নিপতিত হইবামাত্র তুমি বলিয়া উঠিলে "হইয়াছে—আমার বন্ধুর বাটীতে দুর্গোৎসব—তাহার চতুর্দ্দিকে দীন দরিদ্র কৃষকপল্লী—চারিটি পথের মধ্যে এইটির দিকেই সবা'র ঝোঁক—অতএব এইটিই ঠিক্ পথ।" এইরূপে বুদ্ধির আলোকে স্মৃতির মেঘাচ্ছন্ন আকাশ নিমেষের মধ্যে পরিষ্কার হইয়া গেল।

উপরে সাধনের চারিটি পার্শ্বরক্ষক দেখিতে পাওয়া গেল—চক্ষের আলোক, স্মৃতির আলোক, অনুরাগের আলোক, বুদ্ধির আলোক; কিন্তু এ চারিটি আলোকের কেহই সূর্য্যালোক নহে—কেহ বা জোনাকের আলোক, কেহ বা প্রদীপের আলোক, কেহ বা চন্দ্রের আলোক—এই মাত্র। আত্মার আলোকই সূর্য্যের আলোক। মনুষ্যকে চক্ষের আলোকে দেখিলে তাহাকে শরীর-যন্ত্র ছাড়া কিছুই মনে হয় না; মনের আলোকে দেখিলে রাগ-দ্বেষাদি পরিপূর্ণ জন্তুর অধিক মনে হয় না; অনুরাগের আলোকে দেখিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উন্নত জীব বলিয়া মনে হয়; বুদ্ধির আলোকে দেখিলে স্বার্থাভিষন্ধিপূর্ণ বিষয়ী ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়; আত্মার আলোকে দেখিলে অমৃতের পুত্র অমৃতনিকেতনের যাত্রী বলিয়া মনে হয়। এই আত্মার আলোকই সাধনের সূর্য্যালোক। এই আত্মার আলোকেই আমরা আপনার আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মাকে দর্শন করি—অন্য মনুষ্যের শরীর মন ভেদ করিয়া তাহাকে আধ্যাত্মিক ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করি, এবং প্রত্যেক পরমাণু ভেদ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে পরমেশ্বরের মহীয়সী শক্তি উপলব্ধি করি।

আত্মার আলোকেই আমরা আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মা—জগতের অভ্যন্তরে পরমেশ্বর এবং মনুষ্যের অভ্যন্তরে অন্তর্যামী ভগবান্—এইরূপে সর্ব্বত্রই আমরা একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মকে বর্ত্তমান দেখিয়া—সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ যে মনুষ্যজীবনের সার্থক্য-সাধন সেই সাধনে অকুতোভয়ে প্রবৃত্ত হই। সূর্য্যোদয়ে যেমন কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইয়া যায় আত্মার আলোকে সেইরূপ বাধাবিঘ্ন অপসারিত হইয়া গিয়া সাধনের পথ চতুর্দ্দিকে পরিষ্কৃত হইয়া যায়। ঈশ্বর আমাদের সাধনার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সেই বিঘ্নবিনাশন আলোক বিতরণ করুন্।

শকুন্তলা।

ধীর তপোবনে সাড়া শব্দ নাই
বেলা যায় নিরিবিলি ;
আলবালে সব জলসেক করে
ঋষিবালিকারা মিলি।

অদূরে হোথায় বহিছে তটিনী
ওই দেখা যায় ঘাট ;
প্রাতঃস্নান পরে যোগী ঋষি যত
করিছেন বেদপাঠ।

শকুন্তলা।

ধীর সমীরণে আরো কত যেন
স্তবধ আকাশ বন ;
চুপি চুপি শুধু তরুতলছায়ে
খেলে এরা কয়জন।

শিলার উপরে কেহ বা বসিয়া
হাতে ল'য়ে ছোট ঘট ;
চারিদিকে এক ঝরিছে খসিয়া
ছায়া-ঘেরা কালো বট।

ফুলভরা যত তরুলতা হ'তে
ঝরিছে শিশিরবারি—
শকুন্তলা পাশে অনসূয়া সখী
স্নিগধ-হৃদয় নারী।

শ্যাম দূর্ব্বাদলে শুয়ে দলে দলে
কোমল হরিণগুলি,
কোন বালা এসে বুলাইছে হাত
নয়ন পড়িছে ঢুলি।

নদী ব'হে যায় নীরবে নীরবে
অবিরাম কুলুকুল ;

সাধনা।

বনে এক পাশে মুনির কুটীর
মাঝে ক'টি বনফুল!

প্রশান্ত অরণ্যে মলয় সমীরে
স্তম্ভিত অবশকায়;
রাজহংসী দুটি ডাকিতে ডাকিতে
মন্থরে চলিয়া যায়।

বেলা ব'হে যায় হেসে খেলে যেন
দূরে সংসার বাতাস—
মুখে চোখে যেন সরল হৃদয়
খেলিছে এদের পাশ।

নিদাঘের মৃদু প্রভাত সময়ে
ফুলগুলি যায় ঝ'রে;
বেলা বেড়ে যায় খেলা ক'রে এরা
কখন যাইবে ঘরে!

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরী করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি। লম্বা চুল, বড়

হাতে সোণার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুইবেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক এক গ্রাসে মুখে পূরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড় ভাঙ্গার অবিশ্রাম ঝুপ্‌ঝাপ্‌ শব্দ এবং জলের গর্জ্জনে দশদিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুত-বেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্রগতি প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহ্নে মেঘ করিয়া ছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালি ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই—মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল পরপারে জনহীন বালুকাতীরে শব্দ-হীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্য্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা একদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "চন্ন, ফু!" অনতিদূরে সজল পঙ্কিল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদম্ব বৃক্ষের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদমফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লুব্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই চারি দিন হইল রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে কদম্ব ফুলের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল,তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙ্গিয়া ফুল তুলিতে যাইতে চন্নর প্রবৃত্তি হইল না—তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "দেখ দেখ ও—ই দেখ পাখী—ওই উড়ে—এ গেল! আয়রে পাখী আয় আয়" এইরূপ অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল। কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ্ হইবার কোন সম্ভাবনা আছে,তাহাকে এরূপ সামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা—বিশেষতঃ চারিদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখী লইয়া অধিকক্ষণ কাজ চলে না। রাইচরণ বলিল "তবে তুমি গাড়িতে বসে থাক, আমি চট্ করে ফুল তুলে আন্‌চি। খবরদার জলের ধারে যেয়ো না।" বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ব বৃক্ষের অভিমুখে চলিল। কিন্তু ঐ যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্ব ফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্ত্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্ খল্ ছল্ ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্ এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশুপ্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে। তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল—একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল—দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বারবার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়! রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম ফুল

ল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল কেহ নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কোথাও কাহারও কোন চিহ্ন নাই। মুহূর্ত্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁয়ার মত হইয়া আসিল। ভাঙ্গা-বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল "বাবূ—খোকাবাবূ, লক্ষ্মি, দাদাবাবু আমার!" কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোন শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ব্ববৎ ছল্ ছল্ খল্ খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না, এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চারিদিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লণ্ঠন হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মত সমস্ত ক্ষেত্রময় "বাবূ, খোকাবাবু আমার" বলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম্ করিয়া মা ঠাকরুণের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে "জানিনে মা!"

যদিও সকলেই মনে মনে বুঝিল পদ্মারই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে এক দল "বেদে"র সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না। এবং মাঠাকুরাণীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে; এমন কি, তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয়পূর্ব্বক বলিলেন "তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে—তুই যত টাকা চাস্ তোকে দেব।" শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাঁহাকে দূর

করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। অনুকূল বাবু তাঁহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কি উদ্দেশে করিতে পারে! গৃহিণী বলিলেন "কেন? তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এত কাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে, বৎসর না যাইতেই তাহার স্ত্রী অধিকবয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সম্বরণ করিল। এই নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর এক মাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগ্নী যদি না থাকিত তবে এ শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বেশি দিন ভোগ করিতে পাইত না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, এই ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাট পার হইতে আরম্ভ করিল, এবং সর্ব্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি, ইহার কণ্ঠস্বর হাস্যক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মত। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত, রাইচরণের বুকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত, মনে হইত দাদা বাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে। ফেল্না রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম

রাখিয়াছিল ফেল্‌না—যথা সময়ে পিসিকে পিসি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল—তবে ত খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে ত আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাট্য যুক্তি ছিল। প্রথমতঃ, সে যাইবার অনতিবিলম্বেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়তঃ, এতকাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কথনই স্ত্রীর নিজগুণে হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, এও হামাগুড়ি দেয়, টল্‌মল্ করিয়া চলে, এবং পিসিকে পিসি বলে। যে সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ্ হইবার কথা, তাহার অনেকগুলি ইহাতে বর্ত্তিয়াছে। তখন মাঠাকরুণের সেই দারুণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল—আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে কহিল "আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে!"—তখন, এতদিন যে শিশুকে অযত্ন করিয়াছে, সে জন্য বড় অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্‌নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে বড় ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির টুপি আনিল। মৃত স্ত্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোন ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না—রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

ফেল্‌নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ

নিজের জোতজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে একটি চাকরীর যোগাড় করিয়া ফেল্‌নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন-তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিত না। মনে মনে বলিত, বৎস, ভালবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোন অযত্ন হইবে, তা হইবে না।

এম্‌নি করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে শুনে ভাল, এবং দেখিতে শুনিতেও বেশ,হৃষ্টপুষ্ট উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—কেশ-বেশ-বিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ্ কিছু সুখী এবং সৌখীন। বাপকে ঠিক বাপের মত মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ, এবং সেবায় ভৃত্য ছিল, এবং তাহার আর একটি দোষ ছিল, সে যে ফেল্‌নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্‌না বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙ্গাল রাইচরণকে লইয়া সর্ব্বদা কৌতুক করিত, এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্‌নাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসল-স্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড় ভাল বাসিত, এবং ফেল্‌নাও ভাল বাসিত, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঠিক বাপের মত নহে, তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্ম্মে সর্ব্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলি ভুলিয়া যায়—কিন্তু যে পূরা বেতন দেয় বার্দ্ধক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এদিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া

আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্‌না আজকাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্ব্বদা খুঁৎখুঁৎ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্ম্মে জবাব দিল এবং ফেল্‌নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল,—আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছু দিনের মত দেশে যাইতেছি। এই বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূল বাবু তখন সেখানে মুন্সেফ ছিলেন।

অনুকূলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনো সেই পুত্রশোক বক্ষের মধ্যে লালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্ত্রী একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্তান কামনায় বহুমূল্যে একটি শিকড় ও আশীর্ব্বাদ কিনিতেছেন—এমন সময় প্রাঙ্গনে শব্দ উঠিল—জয় হোক্ মা! বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কেরে! রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল আমি রাইচরণ। বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকূলের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন করিলেন এবং আবার তাহাকে কর্ম্মে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন। রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল "মাঠাকরুণকে একবার প্রণাম করতে চাই।" অনুকূল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাঠাকরুণ রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না—রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া যোড়হস্তে কহিল—"প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর

কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি।”—অনুকূল বলিয়া উঠিলেন “বলিস্ কিরে! কোথায় সে!” “আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে আমি পরশ্ব আনিয়া দিব।”

সে দিন রবিবার। কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রী পুরুষে দুইজনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্‌নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূলের স্ত্রী কোন প্রশ্ন কোন বিচার না করিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া, অতৃপ্ত নয়নে তাহার মুখনিরীক্ষণ করিয়া কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক, ছেলেটি দেখিতে বেশ—বেশভূষা আকার প্রকারে দারিদ্র্যের কোন লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব। দেখিয়া অনুকূলের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন প্রমাণ আছে? রাইচরণ কহিল—এমন কাজের প্রমাণ কি করিয়া থাকিবে? আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না। —অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে,ছেলেটিকে পাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগ্‌লাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করা সুযুক্তি নহে; যেমনি হোক্, বিশ্বাস করাই ভাল। তা ছাড়া, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে? এবং বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে?—ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনও তাহাকে পিতার ন্যায় ব্যবহার

উপযুক্ত একপ্রকার প্রাণী আবিষ্কৃত হইয়াছে ইংরাজি বিজ্ঞানবিৎরা উহাকে প্রটোপ্ল্যাস্ম্ নাম দিয়াছেন। বাঙ্গলায় ইহাকে প্রাণপঙ্ক নাম দেওয়া যাইতে পারে। কারণ, ইহা সমুদ্রের তলায় বহুদূর ব্যাপিয়া পঙ্কের ন্যায় বাস করে। উহার প্রাণের পরিমাণ এতই অল্প যে উহা জড়-জগতের কি জীব-জগতের অন্তর্গত বুঝাই কঠিন। ইহা দেখিতে ডিম্বের শ্বেত অংশের মত। কোন প্রকার অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় নাই—সমস্ত শরীর দ্বারা সমুদ্র হইতে সার শোষণ করিয়া নূতন প্রটোপ্ল্যাস্ম্ পুনরুৎপাদন করিতে পারে মাত্র, প্রাণের আর কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিলে প্রত্যেক খণ্ড স্বতন্ত্র ভাবে জীবন ধারণ করিতে পারে—আবার কতকগুলি খণ্ড একত্র করিয়া দিলে সমস্তটা একই জীবের ন্যায় কার্য্য করিতে থাকে। যখন এই প্রটোপ্ল্যাস্ম্ অনির্দ্দিষ্ট আয়তন ত্যাগ করিয়া একটি বিশেষ কোষের মধ্যে ঘনীভূত হইয়া স্বাতন্ত্র্য ধারণ করে তখন তাহাকে সাধারণ প্রটোপ্ল্যাস্ম্ হইতে এক ধাপ উচ্চের জীব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই ক্ষুদ্র প্রটোপ্ল্যাস্ম্ কোষগুলি কেন্দ্র স্থানে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া নিজ বংশ রক্ষা করিয়া থাকে; প্রত্যেক ভাগ একটি সম্পূর্ণ জীব হইয়া দাঁড়ায়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন সকল প্রকার জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এই প্রটোপ্ল্যাস্ম্ কোষ এবং আর কয়েকটি জড়পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত।

সর্ব্বপ্রথম অঙ্গবিশিষ্ট জীব এইরূপ কতকগুলি প্রটোপ্ল্যাস্ম্ কোষের সমষ্টি মাত্র। উহার সমস্ত শরীর অঙ্গের এবং ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিয়া থাকে। সমস্ত শরীরকে অঙ্গুলীবৎ এক দিকে লম্বা করিয়া দেয়—সে দিকে কোন বিপদ অনুভব করিলে তৎক্ষণাৎ

টানিয়া লয়। কোন দিকে খাদ্য দ্রব্যের স্পর্শ অনুভব করিলে সে দিকে সমস্ত শরীর লইয়া যায় এবং খাদ্যকে নিজ শরীর দ্বারা ঘেরিয়া ফেলিয়া তাহার সার শোষণ করিয়া আত্মসাৎ করে। এই জাতীয় নানাবিধ গঠনের অসংখ্য জীব আছে। উহারা নিতান্তই ক্ষুদ্র—এক ইঞ্চি স্থানে ৪।৫ লক্ষ অনায়াসে ধরে। ইহারা অপরিণত অবস্থায় বায়ু পূর্ণ করিয়া ভাসিতে থাকে। প্রতি নিশ্বাসে আমরা যে কত টানিয়া লই তাহার ঠিক নাই। জীবন ধারণের উপযুক্ত স্থানে আসিয়া পড়িলে এত শীঘ্র উহাদের পরিণতি ও বংশ বৃদ্ধি হইতে থাকে যে দেখিতে দেখিতে সে স্থান ছাইয়া ফেলে। সকলেই জানেন এক পাত্র জলে কিছু ভিজাইয়া রাখিলে শীঘ্রই সে জল নষ্ট হইয়া যায়—এই জীবগুলির প্রাদুর্ভাবই তাহার কারণ। ইহারা না থাকিলে কোন জিনিষ পচিয়া যাইত না। মৃতদেহ সমান অবস্থায় চিরদিন থাকিত। আমরা যেখানে মৃত্যুর হাত দেখি সেখানে আসলে জীবন কার্য্য করিতেছে। এই জীবাণুরাই বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া মৃতদেহে বসতি করিয়া তাহার কতক অংশ ভক্ষণ করিয়া তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলে। আজকাল আর এক মত প্রচলিত হইতেছে যে, ইহারাই আমাদের সকল প্রকার রোগের কারণ। শরীরের সবল সুস্থ অবস্থায় ইহারা তাহাতে তিষ্ঠিতে পারে না কিন্তু কোন অত্যাচারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেই ইহারা শরীর জুড়িয়া রোগ নামক বিকৃত অবস্থা ঘটায়। এক এক জাতীয় জীব এক এক বিশেষ রোগের কারণ।

এই ক্ষুদ্র অথচ ভয়ানক জাতিকে বাদ দিলে অবশিষ্ট জীবকে দুই ভাগ করা যায়—উদ্ভিদ এবং জন্তু। দুয়ের মধ্যে প্রধান

প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত জীবেরা জড়জগৎ হইতেই নিজ শরীর পোষণের উপযুক্ত পদার্থ নির্ম্মাণ করিতে পারে কিন্তু শেষোক্ত জীব উদ্ভিজ্জ পদার্থ ব্যতীত নিজ শরীর রক্ষা করিতে পারে না। ইহার পর এই দুই দলভুক্ত কত ভিন্ন প্রকারের জীব আছে তাহার আর সংখ্যা নাই। কিন্তু তন্ন তন্ন করিয়া প্রত্যেককে দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই। সমস্ত শ্রেণীটা কিরূপ দাঁড়াইল একবার ভাল করিয়া দেখা যাক। রামধনু দেখিলে প্রথমে মনে হয় যে তাহাতে সাতটি মাত্র রং। কিন্তু ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলে দেখা যায় যে কোন দুই অংশের এক রং নহে এবং আমরা যাহাকে এক রং বলিতেছি তাহার শেষ সীমা কোথায় বা তাহার পরবর্ত্তী বর্ণের আরম্ভ কোথায় ঠিক করা অসম্ভব। আমাদের কৃত জীব-শ্রেণী-বিভাগ কতকটা এই রামধনুর মত। উহাকে প্রথম দেখিলে এই অসংখ্য প্রকার জাতির ভিন্নতাই দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতে গেলে জাতির শেষ এবং পরবর্ত্তী জাতির আরম্ভ অলক্ষ্যে মিলিয়া যায়। মনুষ্য এবং বানর ভিন্ন-জাতীয় কিন্তু শ্রেষ্ঠ সভ্য মনুষ্য ও পাশব অসভ্য মনুষ্যে যে প্রভেদ অধম মনুষ্য ও শ্রেষ্ঠ বানরের মধ্যে তদপেক্ষা অল্প প্রভেদ। আবার এমন বানরও দেখা যায় যাহাকে কুকুর জাতীয় বলিয়া ভ্রম হয় এবং কোন কোন বানরের মধ্যে বিড়াল জাতির অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষীদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিশেষরূপে আছে বলিয়া সহজেই মনে হয় কিন্তু এমন পক্ষী আছে যাহার সহিত সরীসৃপ জাতির নিকট সম্বন্ধ স্পষ্ট বুঝা যায়। পক্ষীর এবং সরীসৃপের অস্থি পাশাপাশি রাখিলে দেখা যায় যে দুয়ের গঠন একই, তবে পক্ষীতে সম্মুখের দুই পা ঊর্দ্ধগামী হইয়া

ডানার কার্য্য করিতেছে। জলচরে স্থলচরে বিস্তর প্রভেদ কিন্তু ভেকজাতি অর্দ্ধজীবনকাল জলচর অর্দ্ধজীবন স্থলচর।

ডার্বিন যখন জীবজন্তু সম্বন্ধে অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন তখন ভিন্ন জাতির মধ্যে উল্লিখিত যোগাযোগ দেখিতে পাইয়া কিছুতেই প্রচলিত বিশ্বাসে সম্মতি দিতে পারিলেন না। কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে প্রত্যেক জাতি এক এক জোড়া করিয়া স্বতন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন যে, জীবজগতে সর্ব্বত্র দুইটি নিয়ম কার্য্য করিতেছে—১। সকল প্রকার জীব নিজ নিজ সন্ততিবর্গকে নিজ নিজ গুণ প্রদান করে। ২। জল বায়ু প্রভৃতির প্রভাবে জীবপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে এবং এই নূতন অর্জ্জিত পরিবর্ত্তনও তাহারা নিজের সন্ততিকে কিয়ৎ পরিমাণে প্রদান করিতে পারে। গোড়ায় এক প্রটোপ্ল্যাস্মের সৃষ্টি ধরিয়া লইয়া এই দুই নিয়ম অবলম্বন করিয়া সকল জাতির উৎপত্তি বুঝান যাইতে পারে।

বলা বাহুল্য এই তত্ত্ব তিনি দুই এক দিনেই স্থির করিতে পারেন নাই। সমস্ত জীবন অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন মাত্র। মৃত্যুর পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। অতএব কি দেখিয়া ইহা স্থির করিয়াছিলেন কোন্ প্রণালী অনুসারে প্রামাণ করিতেছিলেন তাহা এইরূপ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সরল করিয়া বুঝান অসম্ভব। উক্ত দুইটি নিয়ম কিরূপে কার্য্য করে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে মাত্র। অষ্ট্রেলিয়ায় এক চাষা দেখিল যে তাহার মেষপালের মধ্যে একটি শাবক অপেক্ষাকৃত ছোট পা লইয়া জন্মাইয়াছে; এই খর্ব্বতার নিমিত্ত অন্যান্য মেষের ন্যায় তাহার

বেড়া ডিঙ্গাইয়া পলাইবার ক্ষমতা ছিল না। চাষা এই অঙ্গ-বিকৃতির সুবিধা দেখিয়া ইহার বাচ্ছাদের মধ্যে যে গুলিতে ইহার ন্যায় বিকৃতি দেখা দিল সে গুলিকে পরস্পরের সহিত জুড়ি মিলাইয়া দিল। তাহাদের বাচ্ছার এই বিকৃতি আরও স্পষ্টরূপে দেখা দিল এবং দুই চারিবার এইরূপ বিকৃত জোড়া মিলাইবার পর এক নূতন জাতীয় মেষের সৃষ্টি হইল।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, মনুষ্যসাহায্য ব্যতীত আপনা হইতেই জাতিভেদের সৃষ্টি হইল কি উপায়ে? বিশেষ গুণ-বিশিষ্ট জীব কে নির্ব্বাচন করিল এবং জোড়াই বা কে মিলাইয়া দিল? প্রকৃতির প্রণালী কিরূপ তাহা আর এক দৃষ্টান্ত দেখিলেই বুঝা যাইবে। প্রথমে এক মাত্র ভল্লুক জাতি ছিল—একজাতি হইলেও অবশ্য বল, গঠন, লোমের রং প্রভৃতি সকল গুণেরই কিয়ৎপরিমাণে তারতম্য ছিল। ইহারা যদি চিরকাল একই স্থানে থাকিত তাহা হইলে চিরকালই একই জাতি হইয়া থাকিতে পারিত কোন বিশেষ গুণের প্রাধান্য ঘটিবার কোন কারণ থাকিত না। কিন্তু কালক্রমে ইহারা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। কতকগুলি পর্ব্বতপ্রধান স্থানে গিয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে যাহারা গুহায় থাকিবার উপযুক্ত ছিল না তাহারা আশ্রয়স্থান অভাবে টিঁকিতেই পারিল না। যাহারা বিশেষ কারণে যোগ্য ছিল তাহারাই টিঁকিয়া গেল। গুহাবাসী ভল্লুক ক্রমে এক স্বতন্ত্র জাতি হইয়া দাঁড়াইল। আবার কতকগুলি শীত-প্রধান দেশে গিয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে যাহাদের অপেক্ষাকৃত শ্বেতবর্ণ লোম ছিল তাহারাই বরফে লুকাইয়া মনুষ্য এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তুর হাত এড়াইতে পারিল অন্যগুলি মারা

পড়িল। শ্বেত ভল্লুক এক জাতি প্রস্তুত হইল। প্রকৃতি এইরূপে আপনিই বাছাই করিয়া লয়। আহার অভাব প্রভৃতি নানা কারণে জীবকে দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতেই হয়। এবং বিশেষ দেশের বিশেষ উপযোগী গুণ যাহাদের আছে তাহারাই টিঁকিয়া গিয়া নূতন জাতির সৃষ্টি করে। ইহাই প্রকৃতির জাতি-ভেদ ঘটাইবার উপায়। ডার্বিনের প্রমাণপ্রণালীও ইহা হইতে কতকটা বুঝা যাইবে। যখন দেখান যাইতে পারিবে যে প্রটোপ্ল্যাস্ম্ হইতে মনুষ্য অবধি যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে প্রত্যেক পরিবর্ত্তন পরিবর্ত্তিত জীবের জীবন রক্ষার জন্য নিতান্ত আবশ্যক ছিল তখনই ডার্বিনের মতের সম্পূর্ণ প্রমাণ হইবে।

ইহা অধিকাংশ স্থানে দেখান হইয়াছে—কিন্তু কতক এখনও বাকি আছে—প্রধানতঃ মনুষ্যের ন্যায়-অন্যায়বোধের সৃষ্টি।

আদি সৃষ্টি হইতে অবাধে চলিয়া আসিয়া আমরা জড়জগতের সীমায় প্রাণের আরম্ভে একবার ঠেকিয়াছিলাম এক্ষণে পুনর্ব্বার মনুষ্যের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিতে আসিয়া বাধা পাইলাম। বিজ্ঞানের বর্ত্ত-মান অবস্থায় এই দুই বাধা আমাদের অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই। জড় হইতে জীবন প্রস্তুত করিবার এবং মনুষ্যের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিকে মনুষ্যের জীবনরক্ষার জন্য নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা আজও চলিতেছে কিন্তু সে চেষ্টা এখনও সফল হয় নাই। এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, আদি সৃষ্টির পর পরমেশ্বর পুনরায় দুইবার দুই নূতন সৃষ্টি করিলেন মনে করা অপেক্ষা প্রথম পরমাণুর মধ্যেই সকলপ্রকার উন্নতির বীজ নিহিত ছিল মনে করিতে অধিকাংশ আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ভাল বাসেন।

স্বপ্নপ্রয়াণ ।

সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ,
সাগর-সীমায় যথা অস্ত যায় জ্বলন্ত-তপন ।
স্বপন-রমণী
আইল অমনি,
নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ ॥

সুকোমল চরণ-কমল দুটি
ছোঁয় কি না-ছোঁয় মাটি, আঁচল ধরায় পড়েলুটি';
করে পদ্ম-ফুল
করে দুল-দুল,
অলসিত আঁখিসম আধো-আধো ফুটি' ॥
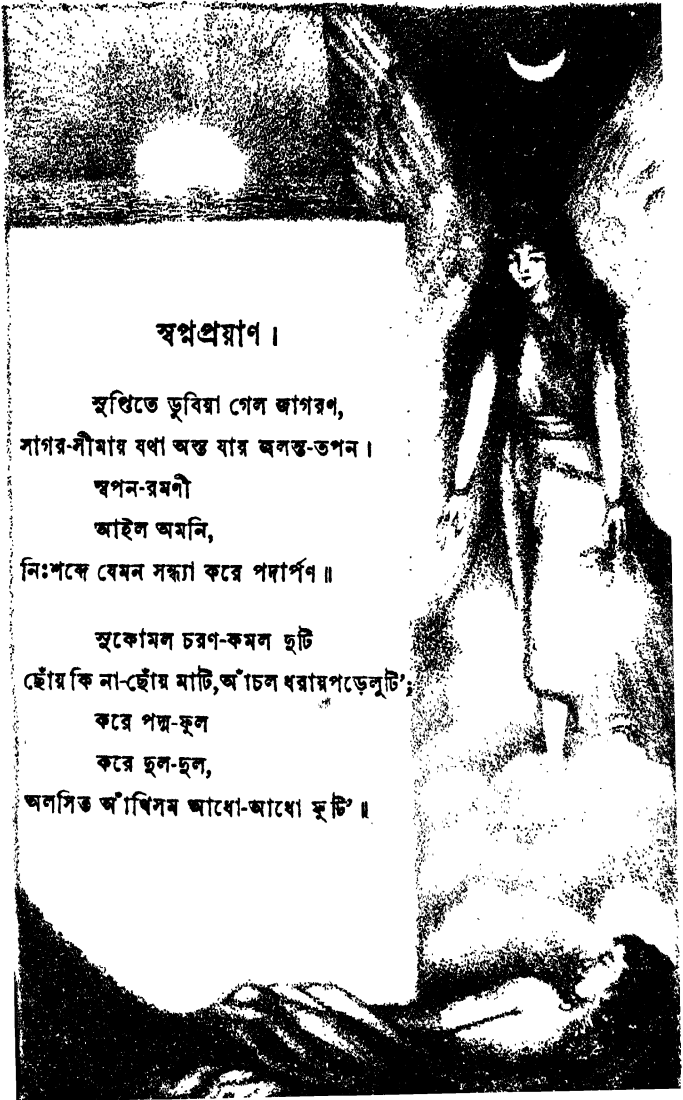
সার্গম স্বরলিপির "আকার-মাত্রিক"

নূতন পদ্ধতি।

সার্গম স্বরলিপির যে কয়েকটি পদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে "বালক"-এ প্রকাশিত পদ্ধতিটি ও "গীত-সূত্রসার"-এ প্রকাশিত পদ্ধতিটি সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুবিধা-জনক। এই উভয় পদ্ধতিতে ঘর-গড়া চিহ্নের বেশি আড়ম্বর নাই, সুতরাং তদনুসারে লিখিত স্বরলিপি সকল ছাপাখানাতেই অনায়াসে ছাপা হইতে পারে। ইহা একটি কম সুবিধার কথা নহে। "বালক"-এর পদ্ধতি যদিও গীত-সূত্র-সারের পদ্ধতি অপেক্ষা সহজ, কিন্তু তেমন সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ নহে এবং বালকের পদ্ধতিতে স্বরলিপি করিতে গেলে অনেকটা স্থানের অপব্যয় হয়। গীত-সূত্রসারের পদ্ধতিটিতে বিশেষ অসুবিধা এই, তাহার মাত্রা-চিহ্ন সকল অধিকাংশই বিন্দুর দ্বারা নির্দ্দেশিত, সুতরাং চোখ এড়াইয়া যাইতে পারে এবং তাহার খণ্ডমাত্রা-গুলিকে যোড়া-তাড়া দিয়া পূর্ণমাত্রাকে আয়ত্ত করিতে একটু পূর্ব্ব-পর প্রণিধান করিয়া দেখিতে হয়, একেবারেই চোখে পড়ে না। নচেৎ, গীতসূত্রসারের পদ্ধতি অনুসারে লিখিত স্বরলিপি দেখিতে অতি সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মাত্রা-চিহ্নের ইতর-বিশেষের উপর পদ্ধতি-বিশেষের সুবিধা অসুবিধা অনেকটা নির্ভর করে। তাহাতেই তাহাদের বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। "বালক"-এর পদ্ধতিতে পূর্ণমাত্রার চিহ্ন কসি, অতএব উহাকে "কসি-মাত্রিক"

পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। "গীত-সূত্রসার"-এর পূর্ণমাত্রার চিহ্ন দ্বিবিন্দু, অতএব উহাকে "বিন্দু-মাত্রিক" পদ্ধতি বলা যাইতে পারে। এবং আমাদের এই পদ্ধতিতে পূর্ণমাত্রার চিহ্ন আকার, অতএব ইহাকে "আকার-মাত্রিক" পদ্ধতি বলা যাইতে পারে।

"আকার-মাত্রিক" পদ্ধতির সঙ্কেত।*

স্বর-চিহ্ন।

১। স, র, গ, ম, প, ধ, ন, এই সাতটি স্বর লইয়াই এক একটি সপ্তক। আমাদের সঙ্গীতে মন্দ্র, মধ্য, তার—কি না, খাদ মাঝারি ও উচ্চ এই তিন সপ্তকের অধিক ব্যবহার নাই। খাদ সপ্তকের স্বরের চিহ্ন = হসন্ত ও উচ্চ সপ্তকের স্বরের চিহ্ন = রেফ। মাঝারি সপ্তকের স্বরে কোন চিহ্ন দিতে হয় না। যথা স্‌, স, র্স। তিন সপ্তকের অধিক যদি কখনও স্বরের ব্যবহার আবশ্যক হয়, তখন রেফ কিম্বা হসন্তের সংখ্যা বাড়াই-লেই চলিবে।

২। কোমল ও কড়ি স্বরের জন্য স্বতন্ত্র অক্ষর হইলে অনে-কটা সুবিধা হয়। স্বরের মাথার উপর পারতপক্ষে যত কম চিহ্ন ব্যবহার হয় ততই ভাল। স্বরের শিরোদেশে উপর্য্যুপরি চিহ্নের ভার চাপাইলে বড় গোলযোগ বাধে। এই জন্য কোমল

*যাঁহারা সঙ্গীতের পরিভাষা বোঝেন না, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণধন বাবুর রচিত "গীতসূত্রসার" পড়িতে অনুরোধ করি; ওরূপ উৎকৃষ্ট সুপাঠ্য সঙ্গীত-তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর দ্বিতীয় নাই। ওরূপ গ্রন্থ য়ুরোপে প্রকাশ হইলে উহার যে কত আদর হইত তাহা বলা যায় না। উহা দ্বারকিন কোম্পানীর বাদ্যযন্ত্রের দোকানে প্রাপ্তব্য।

ঋ-র চিহ্ন ল ; কোমল গ-র চিহ্ন ঙ্গ ; কোমল ধ-র চিহ্ন দ ; কোমল ন-র চিহ্ন ঞ ; এবং কড়ি ম-র চিহ্ন হ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সঙ্কেত মনে রাখাও সহজ। কেন না, উচ্চারণের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে র, গ, ধ, ও ন-কে কোমল করিয়া উচ্চারণ করিলে স্বভাবতই ল, ঙ্গ, দ, ও ঞ হইয়া পড়ে ; এবং ম-কে কড়া করিয়া উচ্চারণ করিলে স্বভাবতই হ্ম হইয়া পড়ে।

ক। কড়ি কোমল স্বতন্ত্র চিহ্নও কখন কখন আবশ্যক হইতে পারে। এই জন্য কোমলের চিহ্ন ঁ ও কড়ির চিহ্ন ী নির্দ্দিষ্ট হইল। সুবিধা বিবেচনা হইলে, কোন কোন স্থলে, কোমল কড়ির স্বরাক্ষর না লিখিয়া সুরের মাথায় কোমল কড়ির চিহ্ন দিলেই হইবে। গীতসূত্রসারে কোমলের চিহ্ন ো-কার এবং কড়ির চিহ্ন ী-কার নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু ো-কার চিহ্নটি ে-কারে ও া-কারে যোড়া বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় উহাকে চিহ্ন করিলে ভাল দেখিতে হয় না। তাই, ো-র পরিবর্ত্তে ঁ স্থির করা হইল। তা-ছাড়া, সানুনাসিক চিহ্নের দ্বারা দুর্ব্বলতা—কোমলতা সহজে মনে আসে। ী-কার কড়ির উপযুক্ত চিহ্নই হইয়াছে। কেন না, সংস্কৃততে কড়িকে তীব্র বলে, তাই তীব্রের ী-কারটি সহজে মনে আসিবার কথা। তা-ছাড়া, ী-র স্বাভাবিক আকৃতিটাও কতকটা খাঁড়ার ন্যায় তীব্র।

পদ-বিভাগ বা তালি-বিভাগ চিহ্ন।

৩। গানের সুরে কোথায় কোথায় প্রধান ঝোঁক অথবা তালি পড়ে তাহা দেখিয়া পদ বিভাগ করিতে হয়। যে-যে সুরে

এই সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মটি এই—যে স্থলে কোন নির্দ্দিষ্ট মাত্র কালের মধ্যে দুই, তিন, বা ততোধিক স্বর সমপরিমাণে প্রকাশ করিতে হইবে, সেই স্থলে স্বরগুলিকে একত্র আনিয়া শেষ স্বরটির গায়ে সেই নির্দ্দিষ্ট মাত্রার চিহ্নটি বসাইতে হইবে। অতএব সরঃ = স০র০; সরা = সঃ রঃ; সরগমা = স০র০গ০ম০ কিম্বা = সরঃ-গমঃ।

বিরাম-চিহ্ন।

৫। কিয়ৎকাল থামিয়া থাকিবার নাম বিরাম। পূর্ণমাত্র বিরামের চিহ্ন ফুলষ্টপ্ চিহ্নের ন্যায় একটি বিন্দু। যে কয়েক পূর্ণমাত্রা-কাল বিরাম হইবে ততটি করিয়া বিন্দু বসাইতে হইবে। অর্দ্ধমাত্রা-কালে বিরামচিহ্ন = ; এবং সিকি-মাত্রার বিরাম-চিহ্ন =,-কমা চিহ্ন। এই বিরামের চিহ্নসকল পদ-বিভাগের মধ্যেই বসিবে।

পুনরাবৃত্তির-চিহ্ন।

৬। পুনরাবৃত্তি সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গীতের সাধারণ নিয়মটি এই যে, আস্থায়ী অন্তরা প্রভৃতি এক একটি কলি গাওয়া শেষ হইলে আস্থায়ীর আরম্ভ হইতে কিম্বা আস্থায়ীর কোন অংশ হইতে পুনরায় গাহিতে হয় এবং আস্থায়ীর এক স্থলে ছাড়িয়া দিয়া আবার অন্য কলি ধরিতে হয়। কখন কখন, আবার আস্থায়ীতে ফিরিয়া না গিয়া একেবারেই আর একটি কলি ধরা হয়। এইরূপ পুনরাবৃত্তি অনেকটা গায়কের ইচ্ছাধীন। যে কলির পর এইরূপ পুনরাবৃত্তি করা যাইতে পারে সেই কলির শেষে যুগল-ছেদ বসিবে। আস্থা-

য়ীর যে পদ হইতে পুনরাবৃত্তি হইবে তাহারও আরম্ভে যুগল-ছেদ বসিবে। এইরূপ আস্থায়ীর পুনরাবৃত্তির কালে আস্থায়ীর যেখানে ছাড়িয়া দিয়া অন্য কলি ধরিতে হয় কিম্বা সমস্ত গান শেষ হইলে আস্থায়ীতে ফিরিয়া আসিয়া যেখানে একেবারেই থামিতে হয় সেই স্থানের শিরোদেশে যুগল-ছেদ বসিবে। যথা, ।স ॥ গা।

(ক) পূর্ব্বোক্ত সাধারণ নিয়মটি ছাড়া যে স্থলে বিশেষ করিয়া কোন স্থান হইতে পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে তাহার চিহ্ন এইরূপ { } গুম্ফ-বন্ধনী। যেখানে এই বিমুখী } গুম্ফ-বন্ধনীটি দেখিবে সেইখানে গান ছাড়িয়া দিয়া যেখানে এই প্রমুখী { গুম্ফ-বন্ধনীটি দেখিবে সেইখান হইতে পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। আবার আর এক স্থলে যদি এইরূপ বিশেষ পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয় তবে যুগল গুম্ফ-বন্ধনীর {{ }} দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিতে হইবে।

(খ) উল্লিখিত বিশেষ পুনরাবৃত্তির সময়ে কতকগুলি স্বর ডিঙ্গাইয়া যাওয়া কখন কখন আবশ্যক হয়। সেইস্থলে, যে স্বর-গুলিকে ডিঙ্গাইতে হইবে তাহাদিগকে বক্র বন্ধনীর ( ) দ্বারা আবদ্ধ করিয়া পরিচিহ্নিত করিতে হইবে। যথা, (লক্ষ্ণৌ-ঠুংরির উদাহরণ যাহা পরে দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রণিধান করিয়া দেখ।)

এই স্বরলিপির অন্তরার আরম্ভ হইতে গান ধরিয়া বরাবর চলিতে চলিতে যেখানে এই } বিমুখী গুম্ফ-বন্ধনীটি পাইবে সেই-খানে গান ছাড়িয়া দিয়া যেখানে এই প্রমুখী { বন্ধনীটি দেখিবে সেইখান হইতে পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে এবং এইরূপ পুনরাবৃত্তি করিবার সময় বক্র-বন্ধনীবদ্ধ এই (পা ধঞ্ধা পমা গা) স্বরগুলিকে

ডিঙ্গাইয়া পা-সুরটাকে ধরিয়া আবার বরাবর নিয়মমত চলিতে থাকিবে।

অলঙ্কার-চিহ্ন।

৭।

(১) আশ। গানের কথার একটি অক্ষরে দুই বা ততোধিক সুরকে উচ্চারণ করাকে আশ কহা যায়।

আশের চিহ্ন=কসি। যথা, । সা–রা–গা মা।
। রা — — ম।

(২) অতি ঘন সংলগ্ন আশকে মীড় বলা যায়।

মীড়ের চিহ্ন=আশযুক্ত সুরের নীচে বড় কসি, যথা
। সা—রা—গা—মা।

(৩) গমকের চিহ্ন=সুরের মাথায় এক এক বিন্দু; যথা—

। সা—া—া—া। ইহাতে প্রত্যেক সুর প্রধ্বনিত অথচ সংলগ্ন ভাবে উচ্চারিত হইবে। অলগ্ন ভাবে যেখানে গমক ব্যবহার হইবে সেখানে আশের চিহ্ন থাকিবে না।

(৪) সুরের আওয়াজের চিহ্ন এইরূপ যথা; প্রবল আওয়াজের চিহ্ন=(ব); মৃদু আওয়াজের চিহ্ন=মৃ; আওয়াজ বৃদ্ধির চিহ্ন=(বৃ); হ্রাসের চিহ্ন=(হ্র); অতি প্রবল আওয়াজের চিহ্ন=(বব); অতি মৃদুর চিহ্ন=(মৃমৃ); মধ্য বলের চিহ্ন (ম); ক্রমশঃ বৃদ্ধির চিহ্ন=(ক্র-বৃ); ক্রমশঃ হ্রাসের চিহ্ন=(ক্র-হ্র); ইত্যাদি। এই অক্ষর গুলি সুরের মাথায় বসিবে।

গানের কথা-স্থাপন প্রণালী।

৮।

স্বরলিপিতে সুরগুলির ঠিক্ নীচে নীচে কথার অক্ষরগুলি বসিবে। যেথানে স্বতন্ত্র অক্ষর নাই, কেবল পূর্ব্ব অক্ষরের যুক্তস্বর অকার আকার প্রভৃতির টানটি চলিয়া আইসে, সেথানে কসি সুরের নীচে নীচে বসাইবে। যথা

। সা—রা—গা মা।
। রা — — ম।

স্বরলিপিতে যে সকল চিহ্নের দ্বারা পদ-বিভাগ প্রভৃতি সূচিত হয় তাহারই অনুরূপ চিহ্নের দ্বারা গানের কথাগুলিও বিভক্ত হইবে। এইরূপে সুরের সহিত গানের কথার ঘনিষ্ঠ যোগ সহজে উপলব্ধি হইবে। কিন্তু গানের কথাগুলি ছেদের দ্বারা এইরূপ বিভক্ত হইলে অর্থবোধের ব্যাঘাত হইতে পারে। তাহা নিবারণের জন্য ছেদ-ব্যবধানের মধ্যেই কমা সেমিকোলন বসাইয়া কথাগুলির পার্থক্য নির্দ্দেশিত হইবে। যথা ;

। সা—রা—গা মা।—পা ধা না সা।
। রা — ম, শ্যা। — ম, আ দি; ।

স্বরলিপির উদাহরণ।

লক্ষ্ণৌ ঠুংরি।

॥ রা গা। সা—রা সা মা। গা—া ॥ গা গা। মা—া
॥ ক ত,। কা — ল, প। রে,— ব ল,। ভা—

পা পা। পধঞা—ধপমা গা গা। মা—া পা পা।
র ত,। রে, — দু খ। সা— গ র,।

পা-ধা র্সা ঞা। ধা—মা পা মা। গা—া ॥ গা গা।
সাঁ,— তা রে,। পা —র, হ। বে ;— ॥ প র,।

{মা—া ধা ধা। ধা—া ধা ধা। ধঞর্সা—া ঞা ধা।
{দী— প, মা। লা,— ন গ। রে, — ন গ।

(পা—ধঞধা পমা গা) }। পা—া মা গা। মা—া পা পা।
(রে, — প র,)}। রে,— তু মি,। যে,— তি মি।

পা—র্সা ঞা ধা। মা—পা ধা মা। গা—া॥
রে, — তু মি,। সে — তি মি। রে —॥

আগামী বারে তাল লয় প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের "মায়ার খেলা" নামক গীতিনাট্যের স্বরলিপি প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

সাময়িক সারসংগ্রহ।

নাইণ্টীন্থ্ সেঞ্চুরি।

মণিপুরের বর্ণনা।

সার জেম্স্ জন্ষ্টন্ জুনমাসের নাইণ্টীন্থ্ সেঞ্চুরি পত্রিকায় মণিপুরের যে বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া সহসা মনের মধ্যে একটি বিষাদের ভাব উদয় হয়।

স্থানটি রমণীয়। চারিদিকে পর্ব্বত, মাঝখানে একটি উপত্যকা; বাহিরের পৃথিবীর সহিত কোন সম্পর্ক নাই। ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা, মানুষগুলি সরল এবং উদ্যোগী, রাজকর নাই বলিলেই হয়, রাজাকে কেবল বরাদ্দমত পরিশ্রম দিতে হয়। যে শস্য উৎপন্ন হয় আপনারাই সম্বৎসর খায় এবং সঞ্চয় করে, বাহিরে পাঠায় না, বাহির হইতেও আমদানী করে না। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে এখানকার দৃশ্যটি বড় মনোহর হইয়া উঠে। দিন উজ্জ্বল, আকাশ পরিষ্কার, বাতাস শীতল; পাকাধানে শস্যক্ষেত্র সোনার বর্ণ ধারণ করিয়াছে। মেয়েরা শোভন বস্ত্র পরিয়া দলে দলে ধান কাটিতেছে, বলিষ্ঠ পুরুষেরা শস্যের আঁটি বহন করিয়া ঘরে লইয়া যাইতেছে। নিকটে গোরুগুলি ধীর গতিতে প্রদক্ষিণ করিয়া ধান মাড়াই করিতেছে, শস্যবিচ্ছিন্ন তৃণ এক পার্শ্বে রাশীকৃত হইতেছে, ধান যখন ঘরে আসিবে তখন সেই তৃণে আনন্দোৎসবের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে।

রাজধানীতে সন্ধ্যাবেলায় হাট বসে, সেইটেই দিবসের মধ্যে প্রধান ঘটনা। যতই বেলা পড়িয়া আসিতে থাকে পথ হাট লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। পুরুষদের নির্ম্মল শুভ্র বসন এবং মেয়েদের নানাবিধ উজ্জ্বলবর্ণের বিচিত্র সজ্জা। মেয়েরাই বিক্রেতা। দেখিতে পাওয়া যায় মাথায় পণ্য দ্রব্য এবং কোলে অথবা পিঠে কচি ছেলে লইয়া তাহারা "সেনা কাইথেল" অর্থাৎ সোনাবাজারে হাট করিতে আইসে, পথ উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

বাজারের কাছে পোলো খেলিবার মাঠ। সহরের ভাল ভাল খেলোয়াড় এমন কি রাজপুত্রগণ সেইখানে প্রায় প্রত্যহ খেলা

করে ; সেখানে কুস্তিও চলে এবং রাজসৈন্যদের কুচও হইয়া থাকে।

রাজবাড়ির চারিদিকে খাল কাটা আছে সেইখানে আশ্বিন মাসে একবার করিয়া নৌকা বাচ হয়। সেই উপলক্ষে মহা সমাগম হয়। রাজা, রাজকুটুম্ব, রাণী এবং রাজকন্যাগণ নির্দ্দিষ্ট মঞ্চে বসিয়া বাচ খেলা দেখেন ; মেয়েদের কোনরূপ পর্দ্দা নাই, অবগুণ্ঠন নাই।

ইহা ছাড়া জন্মাষ্টমী, দেওয়ালি, হোলি, রথযাত্রা প্রভৃতি আরো অনেক উৎসব আছে। আষাঢ় মাসে এক ব্যায়াম-উৎসব হইয়া থাকে তখন চারিদিক হইতে সমাগত পাহাড়িয়াদিগের সহিত মণিপুরীদের কুস্তি প্রভৃতি নানাবিধ ব্যায়ামনৈপুণ্যের পরীক্ষা হয়।

এই প্রচ্ছন্ন পর্ব্বতপুরীতে ঐশ্বর্য্য আড়ম্বরের কোন চিহ্ন দেখা যায় না, কিন্তু এখানে সরল সুখ সন্তোষের লেশ মাত্র অভাব নাই। রাজা যথেচ্ছাচারী, কিন্তু প্রজাদিগের মনে স্বজাতীয় রাজগৌরব সর্ব্বদা জাগরূক। তাহারা বহুকাল হইতে আপনাদের রাজা এবং রাজকীয় বিবিধ অনুষ্ঠান, আপনাদের সোনার হাট, নৌকাখেলা, উৎসব আমোদ লইয়া শৈলকুলায়ের মধ্যে সুখে বাস করিতেছে। এই জগতের একান্তবর্ত্তী সন্তোষকলকূজিত নিভৃত নীড়ের মধ্যে সভ্যতার নির্ম্মম হস্তক্ষেপ দেখিলে এই কথা মনে পড়ে,

গড়ন ভাঙ্গিতে, সখি, আছে নানা খল,
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল।

আমেরিকার সমাজচিত্র।

বিখ্যাত ইংরাজলেখক হ্যামিল্টন্ আইডে লিখিতেছেন যে যদিও অ্যামেরিকায় আইরিশ হইতে আরম্ভ করিয়া কাফ্রী এবং চিনেম্যান্ প্রভৃতি বিচিত্র জাতির সমাবেশ হইয়াছে তথাপি তাহা-দের মধ্যে একটা স্বভাবের ঐক্য দেখা যায়। যাহার টাকাকড়ি আছে সে আপন নিবাসস্থান সহরের উন্নতির জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করা প্রধান কর্ত্তব্য বোধ করে। তাহা ছাড়া খাঁটি মার্কিন বিশ্রাম কাহাকে বলে জানে না; একদণ্ড স্থির থাকিতে হইলে তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া যায়। নিজের কাজই করুক্ বা সাধারণের কাজেই লিপ্ত থাকুক প্রাণপণ খাটুনির ক্রটি নাই। চিকাগো সহর একবার আগুন লাগিয়া ধ্বংশ হইয়া গেল আবার দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যে এমনি কাণ্ড করিয়া তুলিল যে আজকাল অত বড় সহর মুলুকের মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই। ইংরাজ যেখানে হতাশ্বাস হইয়া নিরস্ত হয়, মার্কিন সেখানে কিছুতেই দমে না। ব্যবসায়ে একবার যথাসর্ব্বস্ব খোওয়াইয়া পুনর্ব্বার নবোদ্যমে অর্থসঞ্চয় আমেরিকায় প্রতিদিন দেখা যায়। ইহারা হাল ছাড়িয়া দিবার জাত নয়। ইংরাজের একান্ত অধ্য-বসায় দেখিয়া আমাদের তাক্ লাগিয়া যায়, ইংরাজ আবার আমেরিকার অপ্রতিহত উদ্যম দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতেছে।

কিন্তু লেখক বলেন, অবিশ্রাম কাজ করিয়া ইহারা যে সুখী আছে তাহা বলা যায় না। পুরুষদের মধ্যে অতিরিক্ত শ্রমের পর শ্রান্তি এবং মেয়েদের মধ্যে নিয়ত চাঞ্চল্য ও পরিবর্ত্তন-প্রিয়তাকে সুখের অবস্থা বলা যায় না। আমেরিকায় দেখা

যায় উচ্চ শ্রেণীর নাট্যাভিনয় অপেক্ষা ভাঁড়ামি মস্করামি প্রভৃতিতে অধিকসংখ্যক লোক আকৃষ্ট হয়। লোকেরা এত অধিক মাত্রায় পরিশ্রম করে যে, অবসরের সময় তাহারা নিছক্ আমোদ চায়, যাহাতে মনোযোগ, চিন্তা বা মনোবৃত্তি বেশি উদ্রেক করে এমন কিছুই তাহাদের সহ্য হয় না।

মেয়েরা কেবলি বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে চঞ্চল ভাবে উড়িয়া বেড়াইতেছে। সহর হইতে দূরে আপনার নিভৃত কুটীরের মধ্যে গার্হস্থ্য এবং গ্রাম্য কর্ত্তব্য লইয়া দিনযাপন করা মার্কিন মেয়ের পক্ষে অসাধ্য। কোথায় ব্রাউনিং সম্বন্ধে ব্যাখ্যা হইতেছে, কোথায় বাগ্নারের সঙ্গীত সম্বন্ধে তর্ক চলিতেছে, কোথায় কোন্ পণ্ডিত আজ্‌তেক জাতির বিবরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছে, কোথায় ভূতনামান হইতেছে, চঞ্চল কৌতূহল লইয়া সর্ব্বত্রই আমেরিকানী উপস্থিত আছেন। সাধারণ ইংরাজ মেয়ে বিদ্যালয় ছাড়িলেই মনে করে শিক্ষা সমাপ্ত হইল, কিন্তু মার্কিন মেয়ে একটা না একটা কোন অধ্যয়ন লইয়া লাগিয়া আছেই। সকলেরই প্রায় ক্ষুদ্র পরিবার এবং দুটি চারটি চাকর, গৃহকর্ম্ম সামান্য, এই জন্য মেয়েরা আমোদ অথবা শিক্ষা লইয়া চঞ্চলভাবে ব্যাপৃত থাকে। অনেক গৃহস্থ আপন কন্যাদিগকে শিক্ষার্থে য়ুরোপে প্রেরণ করেন। তাঁহারা বলেন আমেরিকায় মেয়েরা বড় শীঘ্র পাকা হইয়া যায়। নিতান্ত অল্প বয়স হইতেই লোকলৌকিকতা আমোদ অনুষ্ঠানে সকলের সহিত সমকক্ষভাবে দেখা সাক্ষাৎ ও প্রেমাভিনয়ে অকালেই তাহাদের তারুণ্যের স্নিগ্ধ সৌরভ দূর হইয়া যায়। যাহা হউক, ইংরাজলেখক বলিতেছেন এমন অতিকর্ম্মশীলতা এবং অতিচাঞ্চল্য সুখের অবস্থা নহে।

পৌরাণিক মহাপ্লাবন।

বাইবল্ কথিত মহাপ্লাবনের বিবরণ সকলেই বিদিত আছেন। এবারকার পত্রিকায় বিখ্যাত বিজ্ঞান-অধ্যাপক হক্স্লি তাহার অসম্ভাব্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। আমাদের দেশে প্রাচীন ধর্ম্ম যে যে স্থানে জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে নব্য পণ্ডিতেরা সেইখানে বিজ্ঞানের "ঠেকো" দিয়া তাহাকে অটল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইংলণ্ডে সেইরূপ বিচিত্র কৌশলে বিজ্ঞানকে শাস্ত্রোদ্ধারের কার্য্যে নিযুক্ত করার প্রয়াস চলিতেছে। কিন্তু সত্যের দ্বারা ভ্রমকে বজায় রাখা অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলেও সুসিদ্ধ হয় না। যখনি দেখা যায় সরল বিশ্বাসের স্থানে কুটিল ভাষ্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তখনি জানা যায় শাস্ত্রের স্বাভাবিক মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে। ইতিহাসে শুনা যায় প্রাচীন গ্রীক ধর্ম্মশাস্ত্র মরিবার প্রাক্কালে নানা প্রকার রূপক ব্যাখ্যার ছলে আপনার সার্থকতা প্রমাণের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তৈল না থাকিলে কেবল দীর্ঘ বর্ত্তিকায় প্রদীপ জ্বলে না; কালক্রমে বিশ্বাস যখন হ্রাস হইয়াছে তখন বড় বড় ব্যাখ্যাকৌশল সূক্ষ্ম শির তুলিয়া অন্ধকারকে আলো করিতে পারে না।

মুসলমান মহিলা।

কোন তুরস্কবাসিনী ইংরাজরমণী মুসলমান নারীদিগের একান্ত দুরবস্থার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রমাণ না পাইলে

সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত জ্ঞান করি না। কিন্তু অসূর্য্যম্পশ্যা জেনানার সুখ দুঃখ সত্য মিথ্যা কে প্রমাণ করিবে? তবে, আমাদের নিজের অন্তঃপুরের সহিত তুলনা করিয়া কতকটা বুঝা যায়।

লেখিকা গল্প করিতেছেন, তিনি দুইটি মুসলমান অন্তঃপুরচারিণীর সহিত গল্প করিতেছেন এমন সময়ে হঠাৎ দেখিলেন তাহাদের মধ্যে এক জন তক্তার নীচে আর এক জন সিন্দুকের তলায় তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া পড়িল। ব্যাপারটা আর কিছুই নয় তাহাদের দেবর দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে ভ্রাতৃবধুর দৃষ্টিপথে ভাসুরের অভ্যুদয় হইলে কতকটা এই মতই বিপর্য্যয় ব্যাপার উপস্থিত হয়। নব্য মুসলমানেরা এইরূপ সতর্ক অবরোধ সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন—"বহুমূল্য জহরৎ কি কেহ রাস্তার ধারে ফেলিয়া রাখে? তাহাকে এমন সাবধানে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক যে সূর্য্যালোকেও তাহার জ্যোতিকে ম্লান না করিতে পারে।" আমাদের দেশেও যাঁহারা বাক্যবিন্যাসবিশারদ তাঁহারা এইরূপ বড় বড় কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা শাস্ত্রের শ্লোক ও কবিত্বের ছটার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, যাহাকে তোমরা মনুষ্যত্বের প্রতি অত্যাচার বল তাহা প্রকৃত পক্ষে দেবত্বের প্রতি সম্মান। কিন্তু কথায় চিঁড়া ভিজে না। যে হতভাগিনী মনুষ্যসুলভ ক্ষুধা লইয়া বসিয়া আছে তাহাকে কেবলি শাস্ত্রীয় স্তুতি দিয়া মাঝে মাঝে পার্থিব দধি না দিলে তাহার বরাদ্দ একমুষ্টি শুষ্ক চিঁড়া গলা দিয়া নাবা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

লেখিকা একটি অতিশয় রোমহর্ষণ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। জেনাবের যখন দশ বৎসর বয়স তখন তাহার বাপ

তাহাকে হীরা জহরাতে জড়িত করিয়া পুত্তলিবেশে আপনার চেয়ে বয়সে ও ধনে সম্ভ্রমে বড় একটি বৃদ্ধ স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। একবার স্বামীগৃহে পদার্পণ করিলে বাপ মায়ের সহিত সাক্ষাৎ বহু সাধনায় ঘটে বিশেষতঃ যখন তাঁহারা কুলে মানে স্বামীর অপেক্ষা ছোট। জেনাব দুই ছেলের মা হইল তথাপি বাপের সহিত একবার দেখা হইল না। নানা উপদ্রবে পাগলের মত হইয়া একদিন সে দাসীর ছদ্মবেশে পলাইয়া পিতার চরণে গিয়া উপস্থিত হইল। কাঁদিয়া বলিল "বাবা আমাকে মারিয়া ফেল কিন্তু শ্বশুরবাড়ি পাঠাইও না।" ইহার পর তাহার প্রাণসংশয় পীড়া উপস্থিত হইল। তাহার অবস্থা ও আকৃতি দেখিয়া বাপের মনে বড় আঘাত লাগিল। বাপ জামাতাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "কন্যার প্রাপ্য হিসাবে এক পয়সা চাহিনা বরঞ্চ তুমি যদি কিছু চাও ত দিতে প্রস্তুত আছি তুমি তোমার স্ত্রীকে মুসলমান বিধি অনুসারে পরিত্যাগ কর।" সে কহিল "এত বড় কথা! আমার অন্তঃপুরে হস্তক্ষেপ! মশাল্লা! এত সহজে যদি সে নিষ্কৃতি পায় তবে যে আমার দাড়িকে সকলে উপহাস করিবে!"

তাহার রকম সকম দেখিয়া দূতেরা বাপকে আসিয়া কহিল "যে রকম গতিক দেখিতেছি তোমার মেয়েকে একবার হাতে পাইলেই বিষম বিপদ ঘটাইবে।" বাপ বহুযত্নে কন্যাকে লুকাইয়া রাখিলেন।

বলিতে হৃৎকম্প হয় পাষণ্ড স্বামী নিজের অপোগণ্ড বালক দুটিকে ঘাড় মটকাইয়া বধ করিয়া তাহাদের সদ্যমৃত দেহ স্ত্রীর নিকট উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া দিল।

মা কেবল একবার আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া আর মাথা তুলিল না, দুই চারি দিনেই দুঃখের জীবন শেষ করিল।

এরূপ অমানুষিক ঘটনা জাতীয় চরিত্রসূচক দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা লেখিকার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে বলিতে পারি না কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, একীকরণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যিনিই যত বড় বড় কথা বলুন, মানুষের প্রতি মানুষের অধিকারের একটা সীমা আছে; পৃথিবীর প্রাচ্য প্রদেশে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার সেই সীমা এতদূর অতিক্রম করিয়াছে যে আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া কতকগুলা আগ্‌ড়ম্ বাগ্‌ড়ম্ বকিয়া আমাদিগকে কেবল কথার ছলে লজ্জা নিবারণ করিতে হইতেছে।

প্রাচ্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব।

মে মাসের পত্রিকায় আচার্য্য ম্যাক্‌স্‌মূলার লিখিতেছেন প্রাচীনতার একটি বিশেষ গৌরব আছে সন্দেহ নাই কিন্তু প্রাচ্যতত্ত্ব আলোচনায় সেইটেকেই মুখ্য আকর্ষণ জ্ঞান করা উচিত হয় না। যাহা কিছু বহুকেলে এবং সৃষ্টিছাড়া তাহাই যে বিশেষ আদরের সামগ্রী তাহা নহে। বরঞ্চ প্রাচীনের সঙ্গে যখন নবীনের যোগ দেখা যায়, যখন সম্পর্কসূত্রে নবীন প্রাচীন হইয়া যায় এবং প্রাচীন নবীন হইয়া আসে, তখনি আমাদের যথার্থ আনন্দ বোধ হয়। আর্য্য সভ্যতা আবিষ্কারের প্রধান মাহাত্ম্য এই যে ইহার দ্বারা দূর নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এবং যাহাদিগকে পর মনে করিতাম তাহাদিগকে আপনার বলিয়া জানিয়াছি। মনুষ্যপ্রেম বিস্তারের, পৃথিবীর দেশ বিদেশের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপ-

নের একটি প্রাচীন পথ পাওয়া গিয়াছে। অতএব এ কেবল একটি শুষ্ক তত্ত্বমাত্র নহে, মনুষ্যত্বই ইহার আত্মা, মানবই ইহার লক্ষ্যস্থল।

তিনি বলিতেছেন একবার ভাবিয়া দেখ "ইণ্ডো-য়ুরোপিয়ান্" শব্দটার মধ্যে কতটা মহত্ত্ব আছে। এই নামে ইংরাজি, জর্ম্মান্, কেল্টিক্, স্লাভোনিক, গ্রীক এবং লাটিন-ভাষীদের সহিত সংস্কৃত, পারসীক এবং আর্ম্মাণীভাষীরা এক হইয়া গিয়াছে। এই নামে এমন একটি বৃহৎ মিলন-মণ্ডলীর সৃষ্টি হইয়াছে পৃথিবীর সমস্ত মহত্তম জাতি যাহার অঙ্গ—এই নামের প্রভাবে সেই সমস্ত জাতি আপনাদের অন্তরের মধ্যে বৃহৎ ইণ্ডো-য়ুরোপীয় ঐক্যের, প্রাচীন আর্য্য ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের একটি মহৎ মর্য্যাদা অনুভব করিতে পারিতেছে।

ম্যাক্সমূলার মহাত্মার মত কথা বলিয়াছেন। হায়, তিনি জানেন না তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই "আর্য্য" শব্দ লইয়াই আমাদের দেশে দূরে নিকটে, মানবে মানবে কাল্পনিক ব্যবধান স্থাপিত হইতেছে। বাঙ্গালী পণ্ডিতের মুখে যখন এই "আর্য্য" নাম উচ্চারিত হয় তখন তাহার সুদূরব্যাপী উদারতা ঘুচিয়া গিয়া তাহা একটা গ্রাম্য দলাদলির কলহকোলাহলে পরিণত হয়। নামের দোষ নাই, যাহার যেমন প্রকৃতি, ভাষা তাহার মুখে তেমনি আকার ধারণ করে।

এই উপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত "আর্য্যামি এবং সাহেবিয়ানা" পুস্তিকাখানি আমরা পাঠকগণকে পড়িতে সবিনয় অনুরোধ করি।

সোরাব ও রোস্তম।*

১

পারস্যের পূর্ব্ব প্রান্তে সিস্তান নামে একটি পার্ব্বত্যপ্রদেশ। বহুদূরব্যাপী মরুভূমি এই প্রদেশের চারিপাশ দিয়া চলিয়াছে। দূরে স্থানে স্থানে শুষ্কভূমি ভেদ করিয়া দুই একটি ক্ষুদ্র নদী মন্দ স্রোতে বহিয়া যাইতেছে। যে স্থান দিয়া নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই স্থানের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি যা' একটু উর্ব্বরা—শস্যক্ষেত্রে শোভিত, নতুবা দিগন্তহারা বালুকার স্তর কেবল ধূধূ করিতেছে। গ্রীষ্মকালে এই প্রদেশে উত্তপ্ত বায়ু থাকিয়া থাকিয়া হুহু করিয়া বহিয়া যায়, যাহা সম্মুখে পায় তাহা উষ্ণনিশ্বাসে একেবারে দগ্ধ করিয়া ফেলে। মধ্যাহ্নে এই বায়ুর অগ্নি-স্পর্শ সহ্য করিতে না পারিয়া পশুপক্ষীগণ বালুকার ভিতর মুখ গুঁজিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়িয়া থাকে, অনেক সময়ে তাহাদিগকে মৃত বলিয়া ভ্রম হয়। মধ্যে মধ্যে দগ্ধ ধরণীর স্ফোটকের ন্যায় দুই একটি ছোট ছোট পাহাড়ও দেখা যায়, সেই পাহাড়ের উপর হরিণশিশুরা খেলা করিয়া বেড়ায়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাহাদের বড় একটা দেখা যায় না। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে প্রকৃতি দেবী এই প্রদেশ দিয়া অতি লঘু পদক্ষেপে চলিয়া গিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহার শ্যামল চরণের চিহ্ন তেমন ফুটিতে পারে নাই। মধ্যাহ্নে গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সকলে স্থির হইয়া বসিয়া থাকে, কোথাও সাড়া শব্দ শুনা যায় না। মনে হয় যেন কোন এক ভীম-

---

* এই গল্পের কিয়দংশ ম্যাথিউ আর্ণল্ডের কাব্য হইতে গৃহীত।

দর্শন নিষ্ঠুর দৈত্য সমস্ত প্রদেশটির বুকে চাপিয়া তাহার রক্ত শোষণ করিতেছে।

এইরূপ একদিন গ্রীষ্মকালে, একটি জলাভূমির প্রান্তবর্ত্তী নিভৃত গৃহে পারস্যের সর্ব্বপ্রধান বীর রোস্তম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বসিয়া আছেন। পারস্যরাজ কায়কাউস এককালে তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন, সমস্ত রাজ্যের ভার তাঁহার হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার অপ্রতিহত ক্ষমতায় পারস্যরাজের মনে এক্ষণে বিদ্বেষ ও আশঙ্কার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। সেই জন্য রোস্তম একটু ক্ষুণ্ণ, মর্ম্মব্যথিত। তিনি বসিয়া গম্ভীর ভাবে মনে মনে কি একটা স্থির করিতেছেন। পার্শ্বে সজলনয়নে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্ত্রী তাহ্‌মিনা। অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ে নিস্তব্ধ, কাহারও মুখে একটি কথা নাই। অবশেষে তাহ্‌মিনা অঞ্চল দিয়া নয়নের জল মুছিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একটি মাত্র ভিক্ষা, তাহাও কি পূর্ণ করিবে না? আমি আর কিছু চাহিনা, শুধু এই চাহি যে আমার গর্ভে যে সন্তান আছে, সেই সন্তান যদি পুত্র হইয়া জন্মলাভ করে, তাহা হইলে তাহাকে শৈশবে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইওনা—মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে রণক্ষেত্রে লইয়া যাইও না।"

বলিতে বলিতে তাহ্‌মিনার চক্ষুদ্বয় অশ্রুতে ভরিয়া আসিল, বসনে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

রোস্তম মাটির দিকে মুখ করিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে তাহ্‌মিনাকে পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, "রমণী তোমরা কি কেবল আমাদের কর্ত্তব্য পথের বিঘ্ন? চিরকালই কি কেবল আমাদিগকে শৃঙ্খলের মত বাঁধিয়া রাখিবে? পুরুষের শত

সহস্র কর্ত্তব্য আছে; গৃহ, পরিবার, সেই কর্ত্তব্যের আনন্দ-অবসর, বিশ্রামভূমি মাত্র। কন্যা হইলে তাহার জন্য পুষ্পশয্যা রচনা করিয়া সযত্নে ঢাকিয়া রাখিও, কিন্তু পুত্রের জন্য কণ্টকশয্যা চাহি কর্ম্মক্ষেত্র চাহি। অষ্টবর্ষ পরে আমি আবার ফিরিয়া আসিব, তোমার যদি পুত্রসন্তান হয়, তাহা হইলে তাহাকে লইয়া আবার কর্ম্মক্ষেত্রে যাইব। আর দেখিও, আমি চলিয়া গেলে তোমার বৃদ্ধ শ্বশুরকে যেন সমধিক যত্ন করিও।”

রোস্তম এই কথাগুলি একটু দৃঢ়স্বরে রুক্ষভাবে বলিলেন। রোস্তমের হৃদয় যে সম্পূর্ণ অবিচলিত ছিল তাহা নহে, তবে বীর হইয়া, পুরুষ হইয়া স্ত্রীর নিকটেও হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ করিতে তিনি একটু কুণ্ঠিত, লজ্জিতও বটে। হৃদয়ের প্রকৃত ভাব গোপন করিতে গিয়া আমরা ছদ্মভাবকে প্রায়ই অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়াইয়া তুলি।

তাহ্মিনা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অভিমানভরে কহিতে লাগিলেন—“তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদিগকে যে দিকে টানিয়া লইয়া যায় সেই তোমাদের কর্ত্তব্যপথ, আর তোমরা আমাদিগকে গলায় রজ্জু দিয়া যে দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে আমাদের কর্ত্তব্য-পথ সেইদিকে। তা’ যদি সেই বন্ধনে প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া আসে তবু একটি কথা কহিবার যো নাই, তাহা হইলে তোমাদের কর্ত্তব্য-পথে বাধা পড়ে!”

অন্ধকারে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া সন্ধ্যা হইয়া আসিলে অন্তঃপুররক্ষক আসিয়া সম্বাদ দিল যে প্রস্থানের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, অশ্ব সজ্জিত হইয়া দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছে।

রোস্তম উঠিলেন। স্বীয় বাহু হইতে স্বনামখোদিত একটি

কবচ খুলিয়া তাহ্মিনার হাতে দিয়া বলিলেন, "পুত্র হইলে তাহার দক্ষিণ বাহুতে এই কবচটি বাঁধিয়া দিও।"

এই বলিয়া রোস্তম দ্বারদেশে গিয়া রুক্শ্ নামক অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

২

(বিংশতি বর্ষ পরে)

তাতার প্রদেশের মধ্য দিয়া অক্সস নদী সবেগে প্রবাহিত। সফেণ স্রোত রৌদ্রালোকে ঝিক্ ঝিক্ করিয়া ছুরির মত সশব্দে যেন তীর কাটিয়া চলিয়াছে। বিদেশী পথিক দূর হইতে এই জলের শব্দ শুনিয়া অনেক সময়ে থমকিয়া দাঁড়ায়, কাণ পাতিয়া কিসের শব্দ ঠিক করিয়া আবার ধীরে ধীরে চলিয়া যায়। তীরে এখানে সেখানে গোমেষাদির কঙ্কাল পড়িয়া রহিয়াছে। গ্রীষ্মকালে পর্ব্বতশিখর হইতে তুষার গলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল-স্রোত নানা দিক হইতে এই নদীতে আসিয়া পড়ে। তখন নদীর কূলে কূলে জল, জলে তীর ভাসিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে দুই একটি গোমেষও ভাসিতে থাকে—জল সরিয়া গেলে কেবল কঙ্কালগুলি তীরে পড়িয়া থাকে। স্থানে স্থানে শতপাকে জড়াইয়া দুই একটি শুষ্ক লোণা লতাবৃক্ষ মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া আছে, ইহা ভিন্ন কোথাও গাছপালা বড় একটা দেখা যায় না।

তরঙ্গায়িত বেলাভূমির উপর তাতারবাসী ও পারসীক উভয় পক্ষের শিবির—মধ্যে বালুকাময় ভূমিখণ্ড ব্যবধান। সারি সারি ছোট ছোট লালরঙের তাম্বু পড়িয়াছে, মধ্যাহ্ন-কিরণে সেইগুলি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। একদিকে বড় বড় শিরস্ত্রাণ

পরিয়া শ্রেণীবদ্ধ পারসীক অশ্বসৈন্য—পশ্চাতে অসংখ্য পদাতিক গায়ে গায়ে মিশিয়া, কেহ তীর ধনুক লইয়া, কেহ তলোয়ার লইয়া, কেহ বল্লম হস্তে, কেহ বা শরপরিপূর্ণ তূণীর হস্তে দণ্ডায়মান। অন্যদিকে সহস্র সহস্র তুরাণী সৈন্য মেষচর্ম্মে মস্তক আবৃত করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘোটকে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছে। শিবিরের বাহিরে নানা রঙের পতাকা উড়িতেছে। মাথার উপর শকুনি ভাসিতেছে। যুদ্ধ আরম্ভের আর বিলম্ব নাই।

দ্বিপ্রহর অতীত হইলে তুরী ভেরী প্রভৃতি রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, অস্ত্রের ঝঞ্চন শব্দ আরম্ভ হইল, অশ্বের হ্রেষারব ও খুরধ্বনি শুনা গেল। শৃঙ্খলাবদ্ধ হিংস্র জন্তুর ন্যায় সৈন্যেরা রণে ঝাঁপ দিবার জন্য উন্মুখ।

এমন সময়ে তুরাণী সৈন্যদিগের মধ্য দিয়া যুবক বীর সোরাব বালুকার উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সোরাবের কটীতে তরবারি, দক্ষিণ হস্তে বল্লম, বামহস্তে একটি ফলক। চারিদিক একবার উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া সোরাব বলিলেন, "সৈন্যগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। পারসীকদিগের মধ্যে যদি এমন কোন বীর থাকেন, যিনি আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে সক্ষম—আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি।"

সোরাবের এই গর্ব্বিত বাক্য শুনিয়া বীর রোস্তম পারসীক সৈন্যদিগকে ঠেলিয়া, তাঁহার সেই দীর্ঘ আয়ত দেহ লইয়া সোরাবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রোস্তমকে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে দেখিয়া পারসীক সৈন্যদিগের মধ্যে আনন্দপ্রবাহ বহিতে লাগিল। রোস্তম দেখিলেন অল্প দূরে তাঁহার সম্মুখে, কোমলতনু

অথচ তেজস্বী এক যুবক উপেক্ষাভরে লতিকার ন্যায় ঈষৎ হেলিয়া দণ্ডায়মান। রোস্তম একদৃষ্টে, স্নেহপূর্ণ নয়নে যুবকের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার কিশোর সুন্দর মুখ দেখিয়া তাঁহার অন্তরে বাৎসল্য জাগিয়া উঠিল। রোস্তম হাত তুলিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "বৎস! যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হও! আমার পুত্র নাই, তুমি আমার পুত্র হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক!"

প্রভাতের সমীরণস্পর্শে পত্রোপরি শিশিরবিন্দু যেরূপ টলমল করিয়া উঠে, রোস্তমের কথা শুনিয়া সোরাবের অন্তরে সেইরূপ অস্পষ্ট একটা ভাব কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি রোস্তমের পদ-তলে নতজানু হইয়া, রোস্তমের দুই হাত বজ্রমুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন, "বল, সত্য করিয়া বল, তুমি কে? তুমি কি রোস্তম?"

রোস্তম ভাবিলেন যে তাঁহার নাম শুনিলে, নানা ছল বাহির করিয়া সোরাব আর যুদ্ধ করিবে না। পরাজয় স্বীকার না করিয়া, তাতারে ফিরিয়া গিয়া সকলের নিকটে সাহঙ্কারে বলিবে—"আমি পারসীক বীরদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করি। ভয়ে কেহই অগ্রসর হইল না, কেবল রোস্তম যুদ্ধে সম্মত হইলেন। অবশেষে পরস্পরে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া যুদ্ধ আর হইল না।" এই ভাবিয়া রোস্তম সজোরে হাত টানিয়া লইয়া দূরে সরিয়া গেলেন। সোরা-বের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন, "আমি রোস্তম কি কে তাহা জানিয়া তোমার লাভ কি? তুমি কি কেবল রোস্তমের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহ! রোস্তম এখানে থাকিলে তোমাকে আর যুদ্ধ করিতে হইত না, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া

তুমি ভয়ে পলায়ন করিতে! উদ্ধত যুবক! তুমি রোস্তমের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহ—তোমার এত স্পর্দ্ধা!"

রোস্তমের কথায় রাগে সোরাবের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "এস তবে যুদ্ধ আরম্ভ কর।"

রোস্তম কোনও উত্তর দিলেন না। তাঁহার বৃহৎ বল্লম তুলিয়া ধরিয়া সোরাবকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুৎবেগে নিক্ষেপ করিলেন। সোরাব ত্রস্ত মৃগের ন্যায় লাফাইয়া ঈষৎ সরিয়া দাঁড়াইলেন। বল্লম সোরাবের গায়ে লাগিল না, হিস্ হিস্ শব্দে পাশ কাটিয়া বালুকার উপর গিয়া পড়িল। সোরাব তাঁহার বল্লম নিক্ষেপ করিলেন। রোস্তমের ফলকের উপর ঝনাৎ করিয়া লাগিয়া বল্লমের মুখ ভাঙ্গিয়া গেল।

নিষ্ফলপ্রয়াস হইয়া রোস্তম সক্রোধে সোরাবের উদ্দেশে তাঁহার ভীষণ গদা নিক্ষেপ করিলেন। সোরাব পূর্ব্বের ন্যায় চকিতে সরিয়া দাঁড়াইলেন, গদা বালুকার ভিতর প্রোথিত হইয়া রহিল। এবং রোস্তম সেই ভারক্ষেপের বেগে টলিয়া পড়িলেন। সোরাব ইচ্ছা করিলেই সেই মুহূর্ত্তে রুস্তমকে ছিন্নশির করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিলেন না। রোস্তমের কাছে আসিয়া, স্কন্ধে হাত দিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "উঠ, আমার উপর রাগ করিও না! তোমাকে দেখিলে আমার রাগ দ্বেষ কিছুই থাকে না—তুমি আমাকে এমনই বিকল করিয়াছ! আমি বালক সত্য বটে, কিন্তু আমিও অনেক যুদ্ধ দেখিয়াছি—ছিন্নবাহু ছিন্নপদ আহতদিগের কাতর ক্রন্দন অনেক শুনিয়াছি, কথনও আমার পাষাণহৃদয় এইরূপ বিচলিত হয় নাই! সত্য কি তুমি রোস্তম নও?"

সোরাবের কথা শেষ না হইতে, রোস্তম উঠিয়া ভূমি হইতে তাঁহার ধূলি-মলিন বল্লম তুলিয়া আনিলেন। প্রদীপ্ত অঙ্গারের ন্যায় তাঁহার নেত্র জ্বলিতে লাগিল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া তিনি বলিলেন, "বালক! সাদর সম্ভাষণে তুমি আমাকে ভুলাইতে চাহ!" এই বলিয়া রোস্তম বল্লম তুলিয়া ধরিলেন। সোরাবও খাপ হইতে তরবারি খুলিলেন, সূর্য্যালোকে ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। তৎপরে আঘাতের পর আঘাত উভয়ের অঙ্গে বর্ষিত হইতে লাগিল। রোস্তম বল্লম দ্বারা সোরাবের বর্ম্মে আঘাত করিলেন, বর্ম্মের খানিকটা ভিন্ন হইয়া গেল। সোরাবও তরবারি দ্বারা রোস্তমের শিরস্ত্রাণে আঘাত করিলেন, শিরস্ত্রাণ খসিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। ভীমকান্তির উপর কোমল শুভ্রতা অর্পণ করিয়া রোস্তমের ধবল কেশ দেখা দিল—রোস্তম লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন। রোস্তমের আসন্ন বিপদ দেখিয়া রুক্শ্ এই সময়ে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল—সেই শব্দে নদীর জল কাঁপিতে লাগিল।

মেঘ আসিয়া সূর্য্যকে ঢাকিল; জলে কালো ছায়া পড়িল, কিন্তু যুদ্ধ তবুও থামিল না। রোস্তম অনেকক্ষণ কিছুই বলিলেন না, কেবল আপন মনে গুমরিতে থাকিলেন। পরে দেহের সমস্ত রুদ্ধ শক্তির বেগে "রোস্তম" বলিয়া বজ্রধ্বনিতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। এই নাম শুনিয়া সোরাব রোস্তমের মুখের দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্তকাল প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্তব্ধ হইয়া গেলেন। হাত হইতে ফলক পড়িয়া গেল। অবসর দেখিয়া রোস্তম শাণিত অস্ত্র সোরাবের বক্ষে বিদ্ধ করিলেন। সোরাব বক্ষবিদ্ধ অসি বাম হস্তে ধরিয়া বালুকার উপর পড়িয়া গেলেন।

সোরাবকে পতিত দেখিয়া রোস্তম উপেক্ষাভরে কহিলেন "তুমি আপন দোষে প্রাণ হারাইলে।"

সোরাব নির্ভীকচিত্তে কহিলেন, "বৃথা অহঙ্কার করিও না! তুমি আমাকে মার নাই, রোস্তম আমাকে মারিয়াছেন! তোমার মত বিংশতি বীরকে আমি একাকী ভূমিশায়ী করিতে পারি। কিন্তু তোমার মুখনিঃসৃত ঐ রোস্তমের নাম আমার বলবীর্য্য সব কাড়িয়া লইল আর তুমি সুবিধা পাইয়া চোরের মত আসিয়া আমাকে মারিলে! শীঘ্রই ইহার প্রতিফল পাইবে। রোস্তম যখন তাঁহার সন্তানের মৃত্যুর কথা শুনিবেন, তখন দীপ্তশিরা হইয়া পুত্রঘাতক তোমাকে ইহার উচিত শাস্তি দিবেন।"

পদতলে সন্তান পড়িয়া রহিয়াছে, রোস্তম তাহা জানিতে পারিলেন না। সোরাবের কথায় বিশ্বাস না করিয়া তিনি বলিলেন, "নির্ব্বোধ! কেন বৃথা প্রলাপ বকিতেছ! রোস্তমের পুত্র হয় নাই, শুধু একটি মাত্র কন্যা আছে।"

সোরাবের বাকশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সুতীব্র বেদনা সমস্ত শরীরে কম্পনাকারে ব্যক্ত হইতেছে। তথাপি ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমি মিথ্যা বলি নাই; রোস্তমের পুত্র আছে—সেই পুত্র আমি। বিংশতি বর্ষের মধ্যে একদিনের জন্যও আমি পিতার মুখ দেখি নাই। মাতাকে পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নীরব হইয়া থাকিতেন। শেষে আর না থাকিতে পারিয়া আমি পিতার অন্বেষণে বাহির হইলাম। ভাবিয়াছিলাম তাতারবাসীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পারসীক বীরদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলে রোস্তমকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব। কিন্তু আমার আশা পূর্ণ হইল না। মনে করিয়া দেখ, যখন

রোস্তম তাঁহার একটি মাত্র পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে জানিবেন তখন তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ আঘাত লাগিবে! পিতার কথা ততটা ভাবি না—আমার মাতা আমাকে না দেখিয়া কি রূপে বাঁচিবেন! বিদায় লইবার সময় মাতা কতবার অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিয়াছিলেন—"বৎস, শীঘ্র যুদ্ধ হইতে ফিরিও—বিলম্ব করিও না।" আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আর তাঁহার সহিত দেখা হইল না।" এই বলিয়া সোরাব বালকের ন্যায় উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

রোস্তমের এখনও বিশ্বাস হইল না যে সোরাবই তাঁহার পুত্র। পুত্র হইয়াছে শুনিলে রোস্তম শৈশবে তাহাকে কাড়িয়া লইবেন এই ভয়ে তাহ্‌মিনা রোস্তমকে তাঁহার কন্যা হইয়াছে এই মিথ্যা সম্বাদ দেন। সেই অবধি রোস্তমের বিশ্বাস যে তাঁহার পুত্র হয় নাই কন্যা হইয়াছে। তবুও সোরাবের কথা শুনিয়া যৌবনের স্মৃতিবিজড়িত অনেক কথা মনে পড়িয়া রোস্তমের চোখে জল আসিল। তিনি দুঃখিত স্বরে বলিলেন, "তোমার মত পুত্র পাইলে রোস্তমের আনন্দের আর সীমা থাকিত না। কিন্তু তুমি ভুল বলিতেছ, রোস্তমের পুত্র হয় নাই।"

এক হস্তের উপর ভর দিয়া, অল্প একটু উঠিয়া সোরাব ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "বিশ্বাস করিতেছ না! যতদিন বাঁচিয়াছিলাম মিথ্যা হইতে দূরে ছিলাম—এখন মরিতে আসিয়া কি মিথ্যা বলিব! আমি রোস্তমের পুত্র কি না প্রমাণ দেখিতে চাহ?" এই বলিয়া সোরাব দক্ষিণ বাহুতে রোস্তমের নামখোদিত কবচ দেখাইয়া কহিলেন—"রোস্তম এই কবচ মাতাকে দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন যে, পুত্র হইলে তাহার দক্ষিণ হস্তে এই কবচ বাঁধিয়া দিও।"

কবচ দেখিয়া রোস্তমের শরীর কাঁপিতে লাগিল,চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। শেষে উর্দ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বৎস, তুমি মিথ্যা বল নাই। আমিই রোস্তম তোমার পিতা! পিতার হস্তে তোমার মৃত্যু হইল!" স্বীয় বক্ষে বিদ্ধ করিবার জন্য রোস্তম তরবারি বাহির করিলেন।

সোরাব অতি কষ্টে সরিয়া রোস্তমকে জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, "পিতা, আমি নিজের দোষে প্রাণ হারাইয়াছি, তোমার কোন দোষ নাই। কেন মিথ্যা শোক করিতেছ?" এই বলিয়া রোস্তমের হাত হইতে তরবারি লইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রোস্তম তরবারি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সোরাবকে বুকের মধ্যে লইয়া তাহাকে বারবার চুম্বন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রুকৃশ্ আসিয়া, সোরাবের মুখের কাছে মুখ আনিয়া কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। রোস্তম তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "রুকৃশ, এখন তুমি দুঃখ করিতেছ, কিন্তু তুমিই ত বহন করিয়া আমাকে রণক্ষেত্রে আনিয়াছ!"

রুকৃশের নাম শুনিয়া সোরাব তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই রুকৃশ! ইহার কথা আমি মাতার নিকট শুনিয়াছিলাম।" এই বলিয়া রুকৃশের মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সোরাব আবার বলিলেন, "পিতা, আমার মৃতদেহ সিস্তানে লইয়া যাইও, আর আমার সমাধি-প্রস্তরের উপর লিখিয়া রাখিও——বীর রোস্তমের পুত্র সোরাব এইখানে শয়ন করিয়া আছে। পিতা না জানিয়া পুত্রকে বধ করেন।" এই বলিয়া সোরাব বক্ষ হইতে অসি টানিয়া বাহির

করিলেন। রক্ত ঝরিতে লাগিল। সোরাব রোস্তমের ক্রোড়ে অচৈতন্য হইয়া শুইয়া পড়িলেন, আর নড়িলেন না।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। একে একে শিবিরের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। রোস্তম একাকী, সোরাবের মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া নদীতীরে বালুকার উপরে পড়িয়া রহিলেন।

স্ত্রীপুরুষের ভেদাভেদ।

(হর্বর্ট স্পেন্‌সরের মত)

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই সমাজের প্রধান উপকরণ; কোন সমাজের অন্তর্ভূত স্ত্রী ও পুরুষের যেরূপ প্রকৃতি, তদনুসারে সেই সমাজের গঠন ও অনুষ্ঠান সকলও কতকটা অনুরঞ্জিত হইয়া থাকে। তাই, এই প্রশ্নটি উপস্থিত হয়—স্ত্রী ও পুরুষজাতির প্রকৃতি কি একই? সমাজতত্ত্ববিৎদিগের নিকট এই প্রশ্নটি একটি অতি গুরুতর প্রশ্ন। যদি উভয়ের প্রকৃতি সমান হয়, তবে কোনও সমাজে স্ত্রীজাতির প্রভাব বৃদ্ধি হইলে সেই সমাজের আদর্শে কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হওয়া সম্ভব নহে, আর যদি উভয়ের প্রকৃতি সমান না হয় তবে স্ত্রীজাতির প্রভাববৃদ্ধি সহকারে সেই সমাজের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইবার কথা।

শারীরিক বিষয়ে স্ত্রী পুরুষ সমান এ কথা যেমন অসত্য মানসিক বিষয়েও এ কথা তেমনি অসত্য। বংশ-সংরক্ষণে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যাহার যে বিশেষ কাজ তদনুসারে যেরূপ তাহাদের মধ্যে শারীরিক প্রভেদ—সেইরূপ সন্তানপালনে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে

যাহার যেটুকু বিশেষ কাজ তদনুসারে তাহাদের মানসিক গঠনেরও ভিন্নতা উপলব্ধি হয়। ইহা যদি মনে করা যায় যে, উহাদের উভয়ের মধ্যে সন্তানবিষয়িনী উদ্যম-চেষ্টার তারতম্য আছে অথচ মানসিক শক্তি ও প্রবৃত্তি বিষয়ে কোন প্রভেদ নাই, তাহা হইলে প্রকারান্তরে বলা হয়, প্রকৃতি এই স্থলেই একটা নূতন নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন;—অর্থাৎ বিশেষ কার্য্যের জন্য যে বিশেষ শক্তির আবশ্যক যাহা অন্য সর্ব্বত্র দেখা যায়, প্রকৃতি এই স্থলেই তাহার ব্যতিক্রম করিয়াছেন। স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির মধ্যে শারীরিক ও মানসিক গঠন সম্বন্ধে দুই শ্রেণীর প্রভেদ লক্ষিত হয়। পিতার উপযোগী কর্ত্তব্য ও মাতার উপযোগী কর্ত্তব্য তাহার মূলে অধিষ্ঠিত। পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে স্ত্রীলোকের ব্যক্তিগত বিকাশ অপেক্ষাকৃত একটু শীঘ্র বন্ধ হইয়া যায়; সন্তান-উৎপাদনে যে জীবনী-শক্তি পরে ব্যয় হয় তাহা এইরূপে পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যাবৎ না পুরুষের দেহ-পুষ্টি ও দেহ-বৃদ্ধিরূপ আয় ব্যয়ের মধ্যে কতকটা সমতা হইয়া আসে, তাবৎ পুরুষের ব্যক্তিগত বিকাশ-ক্রিয়া চলিতে থাকে, কিন্তু স্ত্রীলোকের ব্যক্তিগত বিকাশ থামিয়া গেলেও অনেকটা তাহার শারীরিক পুষ্টির সংস্থান অবশিষ্ট থাকে; তাহা না হইলে সন্তানোৎপাদনের কোন সম্ভাবনা থাকিত না। এই জন্যই বালক অপেক্ষা বালিকারা শীঘ্র পরিপক্কতা লাভ করে। এবং এই জন্যই তাহাদের মধ্যে দৈহিক গঠনের এত প্রভেদ; দেহের যে সকল অঙ্গের সাহায্যে বাহিরের কার্য্য সকল সম্পাদিত হয় এবং শারীরিক শক্তির অধিক ব্যয় হয় সেই হস্তপদবক্ষদেশাদির অপেক্ষাকৃত বিশালতা পুরুষদেহে লক্ষিত হয়। এবং এই জন্যই

স্ত্রীলোকেরা সকল সময়েই বিশেষতঃ সন্তানোৎপাদনের উপযোগী বয়সে শরীরের গুরুতার তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ আঙ্গারিক অম্ল নিঃশ্বাস দ্বারা পরিত্যাগ করে; ইহাতে এই প্রকাশ পায় যে স্ত্রীলোকদিগের দৈহিক শক্তির বিকাশ শুধু আপেক্ষিকরূপে কম নহে—আসলেই কম। স্ত্রীলোকের ব্যক্তিগত বিকাশ অপেক্ষাকৃত শীঘ্র থামিয়া যাওয়ায় তাহাদের দেহের স্নায়ব পৈশিক-তন্ত্র ততটা বৃদ্ধি পাইতে পারে না—একটু ক্ষুদ্রাকারের হয়; সুতরাং যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল দেহের কাজ করে এবং যে মস্তিষ্ক অঙ্গ প্রত্যঙ্গদিগকে কাজ করায় এ উভয়ই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়া থাকে—এবং এই কারণে স্ত্রীলোকের মনের উপর দুইটি ফল হয়। তাহাদের মানসিক বৃত্তি-সমূহের প্রকাশে তেমন শক্তিমত্তা কিম্বা প্রকাণ্ডতা উপলব্ধি হয় না; এতদ্ব্যতীত মানবীয় ক্রম-বিকাশের যে দুইটি চরম ফল, বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাব-বৃত্তি এই উভয় বৃত্তিতেই কিঞ্চিৎ ন্যূনতা দৃষ্ট হয়; সূক্ষ্মতম তত্ত্বমূলক যুক্তি তাঁহারা বুদ্ধি দ্বারা তেমন গ্রহণ করিতে পারেন না কিম্বা সূক্ষ্মতম ভাব—যেমন ন্যায়পরতা—তাঁহারা তেমন মনো-মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারেন না। যে অনুরাগ-বিরাগ ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি অনুভূত হয় তাহাই তাঁহারা বুঝিতে পারেন কিন্তু ন্যায়পরতা কিনা ব্যক্তিগত অনুরাগ-বিরাগের উপর একান্ত নির্ভর করে না, তাই সে ভাবটি তাঁহারা চট্ করিয়া ধরিতে পারেন না।

এ তো গেল স্ত্রীপুরুষের পরিমাণ-গত প্রভেদ। এখন প্রকৃতি-গত প্রভেদ কি তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ ও স্ত্রীপুরুষের সহিত নিজ

সন্তানের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ হইতেই এই প্রকৃতি-গত প্রভেদ উৎপন্ন হইয়াছে। অপত্যস্নেহের গোড়া ধরিতে গেলে উহা নিরুপায় ও নিরাশ্রয়ের প্রতি ভালবাসা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই অপত্যস্নেহ যদিও পিতা মাতা উভয়েতেই বর্ত্তমান, তথাপি উহার মধ্যে একটু ইতর-বিশেষ আছে। শৈশবের নিরুপায় অবস্থা হইতে যে স্নেহ উৎপন্ন হয় তাহা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মনে যে অধিক প্রবল তাহাতে সন্দেহ নাই।

পুরুষের মনে এই ভাব স্ত্রীলোকের ন্যায় তত বিশেষ আকারে সংস্কারবদ্ধ নহে—তবে সাধারণতঃ আশ্রয়াধীন দুর্ব্বল ব্যক্তি মাত্রের প্রতি কথঞ্চিৎ পুরুষের মনেও এই ভাবের উদ্রেক হয়। স্ত্রীলোকদিগের এই বিশেষ সংস্কার হইতেই শিশু-জীবনের রক্ষণাবেক্ষণে তাহাদের একটা বিশেষ পটুতা জন্মিয়াছে—তাহাদের আচরণের সহিত তাহাদের স্বাভাবিক ভাবের বেশ মিল হইয়াছে। এ স্থলে শারীরিক বিশেষত্বের সঙ্গে সঙ্গে একটা মানসিক বিশেষত্বও যে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না; এবং গোড়ায় যদিও এই মানসিক বিশেষত্বের সহিত সন্তানপালনেরই বিশেষ সম্বন্ধ, তত্রাপি স্ত্রীলোকের সমস্ত জীবনই কতক পরিমাণে ইহার প্রভাবে সংস্পৃষ্ট। স্ত্রীপুরুষের অবশিষ্ট প্রকৃতি-গত মানসিক প্রভেদসকল দুর্ব্বল সবলের সম্বন্ধ হইতে প্রসূত। সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় সবল পুরুষজাতির সহিত ব্যবহারে অবলা স্ত্রীজাতি কতকগুলি বিশেষ মানসিক লক্ষণ অর্জ্জন করিয়াছে।

প্রথমতঃ দেখা যায়, যে সকল অসভ্য জাতি বলবান ও সাহসী এবং তা-ছাড়া আতায়ী, সদসৎজ্ঞানশূন্য ও অত্যন্ত স্বার্থপর ছিল

তাহারাই জীবনসংগ্রামে টিঁকিয়া গিয়াছে। এবং এই সকল বিজয়ী অসভ্য জাতি হইতেই সভ্য জাতিদিগের উৎপত্তি। সুতরাং সভ্যজাতিদিগের পূর্ব্বপুরুষের প্রকৃতিতে পাশব-বৃত্তির যে প্রাবল্য ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কাজে কাজেই, এই সকল জাতির অন্তর্গত স্ত্রীলোকদিগের সহিত নিষ্ঠুর পুরুষদিগের সংসর্গ হওয়ায় ঐ সকল স্ত্রীলোক পুরুষদের মন যোগাইয়া যে পরিমাণে চলিতে পারিত সেই পরিমাণে তাহারা সুখ সম্পদের ভাগী হইত। সেই সকল স্ত্রীলোক স্বীয় বলের দ্বারা তো নিজ সত্ত্ব রক্ষা করিতে পারিত না—তবে কি উপায়ে তাহা বজায় রাখিত? বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া তাহাদের কতকগুলি বিশেষ মানসিক লক্ষণ উৎপন্ন হয়,তাহারই প্রভাবে তাহারা জীবন-সংগ্রামে সফলতা লাভ করিত।

প্রথমতঃ মনোরঞ্জন করিবার ক্ষমতা—এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসা লাভের ইচ্ছা তাহাদের বলবতী ছিল। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তৎকালে পুরুষদিগের দয়ার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া স্ত্রীলোকমাত্রকেই থাকিতে হইত; সুতরাং যে সকল স্ত্রীলোক পুরুষদের বেশি মন যোগাইতে পারিত তাহারাই টিঁকিয়া থাকিয়া নিজ বংশ রাখিয়া যাইত। এবং বংশানুক্রমে এই সকল গুণ স্ত্রীজাতিতে প্রবাহিত হইয়া আদর যত্ন পাইবার বিশেষ ইচ্ছা এবং তাহার আনুষঙ্গিক বিশেষ হাব-ভাব স্ত্রী স্বভাবে যে বদ্ধমূল হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

আবার, যে সকল স্ত্রীলোক নিষ্ঠুর অসভ্য স্বামী কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়াও নিজ মনোকষ্ট গোপন করিয়া রাখিতে পারিত তাহাদেরই সর্ব্বপ্রকারে ভাল হইত। এবং এইরূপে এই ধৈর্য্য-গুণও কৌলিক নিয়ম প্রভাবে স্ত্রীজাতিতে বদ্ধমূল হইয়াছে।

স্ত্রীলোকদিগের আর একটি বিশেষ [illegible] আছে- তাহারও এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। স্ত্রীলোক স্বভাবতই ইঙ্গিতজ্ঞ। স্ত্রীলোকেরা আত্মীয় স্বজনের মনের ভাব মুখের ভাব দেখিয়া চট্ করিয়া ধরিতে পারে। একটু ভাবান্তর হইলেই তাহারা বুঝিতে পারে। পূর্ব্বতন অসভ্যকালে যে সকল স্ত্রীলোক স্বামীদিগের মুখের ভাবে, গলার স্বরে, ক্রোধের পূর্ব্বলক্ষণসকল বুঝিতে পারিত তাহারাই স্বামীদিগের রোষাগ্নিরূপ বিপদ হইতে রক্ষা পাইত এবং তাহারাই টি'কিয়া থাকিয়া উত্তর বংশে এই গুণটি সংক্রামিত করিয়াছে।

বলবানের প্রতি আসক্তি আর একটি স্ত্রীলোকদের প্রকৃতিগত ভাব। এই গুণ থাকাতেই মানব-কুলের উন্নতি হইয়া আসিয়াছে; যে সকল স্ত্রীলোক বল শক্তির প্রাধান্যে মোহিত হইয়া স্বামী নির্ব্বাচন করিত তাহারাই তাহাদের আশ্রয়-প্রভাবে জীবন-সংগ্রামে টি'কিয়া যাইত; পক্ষান্তরে যে সকল স্ত্রীলোক দুর্ব্বল পুরুষদিগকে স্বামীত্বে বরণ করিত তাহারা অনতিকালমধ্যে ধ্বংশ হইয়া যাইত—এইরূপে প্রতাপ-বিক্রমের প্রতি আসক্তি কৌলিক নিয়ম প্রভাবে স্ত্রীস্বভাবের লক্ষণ হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য অনেক সময়ে এই অদ্ভুত দৃশ্যটি দেখা যায়, বলবান স্বামী স্বীয় স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেও স্ত্রী সমানরূপে তাহার প্রতি আসক্ত, কিন্তু যে স্বামী দুর্ব্বল সে ভাল ব্যবহার করিলেও তাহার প্রতি স্ত্রী ততটা আসক্ত নহে। শুধু নিজ স্বামী কেন অসাধারণ শক্তিশালী ক্ষমতাবান ব্যক্তিমাত্রেরই প্রতি স্ত্রীলোকের ভক্তি এইরূপে জন্মিয়াছে—এই শক্তিপূজা হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি—এই জন্য স্ত্রীজাতির মধ্যে ধর্ম্মভাবের

মিলে' গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত করে' দিলে তখন দেখ্লুম সমুদ্রের পক্ষে জলখেলা বটে কিন্তু আমার পক্ষে নয়।

ভাব্লুম এই বেলা মানে মানে কুঠরির মধ্যে ঢুকে কম্বলটা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়িগে। যথাসম্ভব ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করে' কাঁধ হতে কম্বলটি একটি বিছানার উপর ফেলে' দরজা বন্ধ করে' দিলুম। ঘর অন্ধকার। বুঝ্লুম, আলো নিবিয়ে দিয়ে দাদা তাঁর বিছানায় শুয়েচেন। শারীরিক দুঃখ নিবেদন করে' একটু-খানি স্নেহ উদ্রেক করবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করলুম "দাদা, ঘুমিয়েচেন কি ?" হঠাৎ নিতান্ত বিজাতীয় মোটা গলায় কে একজন হুহুঙ্কার দিয়ে উঠ্ল "হু'জ্ দ্যাট্ !" আমি বল্লুম "বাস্‌রে! এ ত দাদা নয় !" তৎক্ষণাৎ বিনীত অনুতপ্তস্বরে জ্ঞাপন কর্লুম "ক্ষমা করবেন দৈবক্রমে ভুল কুঠরিতে প্রবেশ করেচি।" অপরিচিত কণ্ঠ বল্লে "অল্ রাইট্ !" কম্বলটি পুনশ্চ তুলে নিয়ে কাতর শরীরে সঙ্কুচিত চিত্তে বেরোতে গিয়ে দেখি দরজা খুঁজে পাইনে। বাক্স তোরঙ্গ লাঠি বিছানা প্রভৃতি বিচিত্র জিনিষের মধ্যে খট্ খট্ শব্দে হাত্‌ড়ে বেড়াতে লাগ্‌লুম। ইঁদুর কলে পড়্‌লে তার মানসিক ভাব কিরকম হয় এই অবসরে কতকটা বুঝ্‌তে পারা যেত কিন্তু তার সঙ্গে সমুদ্রপীড়ার সংযোগ হওয়াতে ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত জটিল হয়ে পড়েছিল।

এ দিকে লোকটা কি মনে করচে! অন্ধকারে পরের ক্যাবিনে ঢুকে বেরোবার নাম নেই—খট্ খট্ শব্দে দশ মিনিট কাল জিনিষপত্র হাৎড়ে বেড়ান—এ কি কোন সদ্বংশীয় সাধু-লোকের কাজ! মন যতই ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌চে শরীর ততই গলদ্‌ঘর্ম্ম এবং কণ্ঠাগত অন্তরিন্দ্রিয়ের আক্ষেপ উত্তরোত্তর অবাধ্য

হয়ে উঠ্‌চে। অনেক অনুসন্ধানের পর যখন হঠাৎ দ্বার উদ্‌ঘাটনের গোলকটি, সেই মসৃণ চিক্কন শ্বেতকাচনির্ম্মিত দ্বারকর্ণটি হাতে ঠেক্‌ল, তখন মনে হল এমন প্রিয়স্পর্শসুখ বহুকাল অনুভব করা হয় নি। দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে’ নিঃসংশয়চিত্তে তার পরবর্ত্তী ক্যাবিনের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত। গিয়েই দেখি, আলো জ্বলচে; কিন্তু মেজের উপর পরিত্যক্ত গাউন্ পেটিকোট্ প্রভৃতি স্ত্রীলোকের গাত্রাবরণ বিক্ষিপ্ত। আর অধিক কিছু দৃষ্টিপথে পড়বার পূর্ব্বেই পলায়ন করলুম। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে বারবার তিনবার ভ্রম করবার অধিকার সকলেরই আছে কিন্তু তৃতীয়বার পরীক্ষা করতে আমার আর সাহস হল না। এবং সেরূপ শক্তিও ছিল না। অবিলম্বে জাহাজের ছাতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেখানে বিহ্বলচিত্তে জাহাজের কাঠরার পরে ঝুঁকে পড়ে’ শরীর মনের একান্ত উদ্বেগ কিঞ্চিৎ লাঘব করা গেল। তার পরে বহুলাঞ্ছিত অপরাধীর মত আস্তে আস্তে কম্বলটি গুটিয়ে তার উপর লজ্জিত নতমস্তক স্থাপন করে একটি কাঠের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়লুম।

কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! এ কার কম্বল! এ ত আমার নয় দেখ্‌ছি! যে সুখসুপ্ত বিশ্বস্ত ভদ্রলোকটির ঘরের মধ্যে রাত্রে প্রবেশ করে’ দশমিনিটকাল অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলুম নিশ্চয় এ তারই। একবার ভাবলুম ফিরে গিয়ে চুপিচুপি তার কম্বল স্বস্থানে রেখে আমারটি নিয়ে আসি। কিন্তু যদি তার ঘুম ভেঙ্গে যায়! পুনর্ব্বার যদি তার ক্ষমা প্রার্থনা করবার আবশ্যক হয় তবে সে কি আর আমাকে বিশ্বাস করবে! যদি বা করে, তবু এক রাত্রের মধ্যে দু’বার ক্ষমা প্রার্থনা করলে নিদ্রাকাতর বিদেশীর খৃষ্টীয় সহিষ্ণু-

তার প্রতি অতিমাত্র উপদ্রব করা হবে না কি!—আরো একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হল। দৈববশতঃ দ্বিতীয়বার যে ক্যাবিনের দ্বারে গিয়ে পড়েছিলুম তৃতীয়বারও যদি ভ্রমক্রমে সেইখানে গিয়েই উপস্থিত হই এবং প্রথম ক্যাবিনের ভদ্রলোক-টির কম্বলটি সেখানে রেখে সেখানকার একটি গাত্রাচ্ছাদন তুলে নিয়ে আসি তাহলে কিরকমের একটা শোচনীয় প্রমাদ-প্রহে-লিকা উপস্থিত হয়! আর কিছু নয়, পরদিন প্রাতে আমি কার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে যাব এবং কে আমাকে ক্ষমা করবে! প্রথম ক্যাবিনচারী হতবুদ্ধি ভদ্রলোকটিকেই বা কি বল্‌ব এবং দ্বিতীয় ক্যাবিনবাসিনী বজ্রাহতা ভদ্ররমণীকেই বা কি বোঝাব! ইত্যাকার বহুবিধ দুশ্চিন্তায় তীব্রতাম্রকূটবাসিত পরের কম্বলের উপর কাষ্ঠাসনে রাত্রি যাপন করলুম।

২৩ আগষ্ট। আমার স্বদেশীয় সঙ্গী বন্ধুটি সমস্ত রাত্রির সুখ-নিদ্রাবসানে প্রাতঃকালে অত্যন্ত প্রফুল্ল পরিপুষ্ট সুস্থ মুখে ডেকের উপর দর্শন দিলেন। আমি তাঁর দুই হস্ত চেপে ধরে বল্লুম ভাই, আমার ত এই অবস্থা!—শুনে তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তির উপর কলঙ্ক আরোপণ করে হাস্যসহকারে এমন দুটো একটা বিশেষণ প্রয়োগ করলেন যা বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর থেকে আর কখনো শোনা হয় নি। সমস্ত রজনীর দুঃখের পর প্রভাতের এই অপমানটাও নিরুত্তরে সহ্য করলুম। অবশেষে তিনি দয়াপরবশ হয়ে আমার ক্যাবিনের ভৃত্যটিকে ডেকে দিলেন। তাকেও আবার একে একে সমস্ত ঘটনাটি খুলে বল্‌তে হল। প্রথমে সে কিছুই বুঝ্‌তে পারলে না, মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে বেচারার দোষ দেওয়া যায় না। তার জীবনের অভিজ্ঞতায় নিঃসন্দেহ এরকম

ঘটনা আর কথনো ঘটেনি, সুতরাং শোন্‌বামাত্রই ধারণা হওয়া কিছু কঠিন বটে। অবশেষে বন্ধুতে আমাতে মিলে যখন অনেকটা পরিষ্কার করে' বোঝান গেল তখন সে ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে একবার মুখ ফেরালে, এবং ঈষৎ হাস্‌লে; তার পর চলে গেল। কম্বলের কাহিনী অনতিবিলম্বেই সমাপ্ত হল।

কিন্তু সী-সিক্‌নেস্‌ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগ্‌ল। সে ব্যাধিটার যন্ত্রণা অনভিজ্ঞ স্থলচরদের কিছুতে বোঝানো যেতে পারে না। ভারতবর্ষের অন্ন নাড়িতে আর তিলমাত্র অবশিষ্ট রইল না। য়ুরোপে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে সমুদ্র এই দেহ হতে ভারতবর্ষটাকে যেন ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে একেবারে সাফ করে' ফেলবার চেষ্টা করচে। ক্যাবিনে চার দিন পড়ে আছি।

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। ১৫ শ ভাগ। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। এবারকার ভারতীতে লজ্জাবতী নামক একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। এ রচনাটি ছোট গল্পলেখার আদর্শ বলিলেই হয়। দুটি একটি বাঙ্গালী অন্তঃপুরবাসিনীর জাজ্জ্বল্যমান ছবি আঁকা হইয়াছে অথচ তাহাকে কোনপ্রকার কাল্পনিক ভঙ্গী করিয়া বসান হয় নাই, যেমনটি তেমনি উঠিয়াছে। কোন বাড়াবাড়ি নাই, রকম সকম নাই, রোমহর্ষণ ভাষাপ্রয়োগ নাই, অথচ পাঠ সমাপ্তিকালে পাঠকের চোখে অতি সহজে অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হইয়া আসে।— "বিলাপ" একটি গদ্যপ্রবন্ধ। কিন্তু ইহাতে না আছে গদ্যের সংযম, না আছে পদ্যের ছন্দ। আজকাল এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল

অমূলক প্রবন্ধ বাঙ্গলা ভাষায় প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন লেখার কোন আবশ্যক দেখি না।—লিটারেরি। ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে যেমন প্রতিধ্বনি থাকে তেমনি সকল দলেরই পশ্চাতে কতকগুলি অনুবর্ত্তী লোক থাকে তাহারা খাঁটি দলভুক্ত নহে অথচ ভাবভঙ্গীর অনুকরণ করিয়া দলপতির সঙ্গে একত্রে তরিয়া যাইতে চাহে। এরূপ লোক সর্ব্বত্রই উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। সেই-রূপ যাঁহারা সারস্বতমণ্ডলীর ছায়াস্বরূপে থাকিয়া সাহিত্যের ভড়ং করিয়া থাকেন্ লেখক তাঁহাদিগকে লিটারেরি নাম দিয়া কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গলা দেশে সে-রূপ মণ্ডলীও নাই এবং তাঁহাদের ফিকা অনুকরণও নাই। লেখক যে বর্ণনা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা বাঙ্গলা দেশের কোন বিশেষ দলের প্রতিই প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। লেখা পড়িয়াই মনে হয় সাহিত্য সম্বন্ধে কাহারও সহিত লেখকের তর্ক হইয়া থাকিবে, এবং প্রতিপক্ষের নিকট হইতে এমন কোন রূঢ় উত্তর শুনিয়া থাকিবেন যে, "ওসকল তুমি বুঝিবে কি করিয়া!" সেই ক্ষোভে তাঁহার প্রতিপক্ষের একটি বিরূপ প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়া অমনি কাগজে ছাপাইয়া বসিয়াছেন। লেখকের বিবেচনায় তাঁহার এ রচনা যতই তীব্র এবং অসামান্য ব্যঙ্গরসপূর্ণ হোক্ না কেন ইহা ছাপায় প্রকাশ করিবার যোগ্য নয়। এরূপ লেখা সত্যও নহে, সুন্দরও নহে, এবং ইহাতে কাহারও কোন উপকার দেখি না।—প্ল্যাঞ্চেট। আদি ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত নামে যে পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। প্ল্যাঞ্চেটে বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং একটি বালকের সহযোগে যে দুইটি ইংরাজি কবিতা বাহির

হইয়াছে তাহা অতিশয় বিস্ময়জনক। বিশেষতঃ শেষ কবিতাটি কোন বাঙ্গালীর নিকট হইতে আশা করা যায় না।—"একাল ও একালের মেয়ে" যে লেখিকার রচনা আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই। এরূপ সরল পরিষ্কার যুক্তিপূর্ণ এবং চিত্রিতবৎ লেখা কয়জন লেখক লিখিতে পারেন? লেখিকা কালের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যে গুটিকতক কথা বলিয়াছেন তাহা অতিশয় সারগর্ভ। যে লোক চিরকাল পদব্রজে চলিত সে আজ সুবিধা সম্মুখে দেখিয়াই ট্র্যামে চড়িতেছে; পূর্ব্বে যাহারা ঠন্‌ঠনের চটিও পরিত না আজ তাহারা বিলাতী জুতা মোজা পরিতেছে; জীবনযাত্রা সম্বন্ধে পুরুষসমাজে যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন প্রচলিত হইয়াছে তাহা কয়জন পূর্ব্বের সহিত তুলনা করিয়া দেখেন? কিন্তু আমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে বর্ত্তমান কালোচিত পরিবর্ত্তনের লেশমাত্র দেখিলেই এই নূতন ভাবের ভাবুক, এই নূতন বিদ্যালয়ের ছাত্র, এই নূতন পরিচ্ছদ পরিহিত নববিলাসী পরিহাস করেন, প্রহসন লেখেন এবং কেহ কেহ সীতা দময়ন্তীকে স্মরণ করিয়া প্রকাশ্যে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। তাঁহারা আশা করেন সমাজের পুরুষার্দ্ধ শিক্ষাকিরণে পাকিয়া রাঙা হইয়া উঠিবে এবং বাকি অর্দ্ধেক সনাতন কচিভাব রক্ষা করিবে। এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় না, এক ফলে পৃথক নিয়ম খাটে না। অতএব ভালই বল আর মন্দই বল—পুরুষের অনুগামিনী হওয়া স্ত্রীলোকের প্রাচীন ধর্ম্ম—বর্ত্তমান সহস্র নূতনত্বের মধ্যে সেই প্রাচীন মনুকথিত ধর্ম্ম অব্যাহত থাকিবার চেষ্টা করিতেছে। লেখিকা বর্ত্তমান আতিথ্য সম্বন্ধে যে দুএক কথা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে অনেক ভাবিবার বিষয় আছে।

নব্যভারত। আশ্বিন ও কার্ত্তিক। চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। বহুকাল হইতে এই প্রবন্ধ নব্যভারতে প্রকাশিত হইতেছে। চৈতন্যের জীবনচরিত ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে লেখক একটি কথাও বাকি রাখিতেছেন না। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক বিচার দ্বারা সত্য মিথ্যা নির্ব্বাচন করিয়া গেলে ভাল হইত। যাহা হৌক্ লেখকের পরিশ্রম এবং বিপুল সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হয় এবং সেই সঙ্গে সম্পাদককে বলিতে হয় এরূপ বিস্তারিত গ্রন্থ সাময়িক পত্রে প্রকাশের যোগ্য নহে। "সাঁওতালের বিবাহ প্রণালী" প্রবন্ধটি বিশেষ কৌতুকজনক। "মহা তীর্থযাত্রা" লেখকের নরোয়ে ভ্রমণ বৃত্তান্ত। বর্ণনাংশ বড় বেশি সংক্ষিপ্ত এবং লেখকের হৃদয়াবেগ অতিরিক্ত মাত্রায় প্রবল। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় "শকাব্দ" প্রবন্ধে শকাব্দ প্রবর্ত্তনের ইতিহাস সমালোচনা করিয়াছেন। সাধারণের বিশ্বাস, এই অব্দ বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক প্রচলিত। লেখক প্রমাণ করিতেছেন, যে, এক সময়ে মধ্য এসিয়াবাসী শক জাতি (ইংরাজিতে যাহাদিগকে সাইথিয়ান্‌স্ বলে) ভারতে রাজ্য স্থাপন করিয়া এই অব্দ প্রচলিত করে। লেখক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে অনেকগুলি প্রমাণ আবিষ্কার করিয়াছেন। রচনাটি অতিশয় প্রাঞ্জল হইয়াছে। সাধারণতঃ বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে পুরাতত্ত্ব প্রবন্ধগুলি অসংখ্য তর্কজালে জড়িত হইয়া পাঠকসাধারণের পক্ষে যেরূপ একান্ত দুর্গম ও ভীতিজনক হইয়া উঠে এ লেখাটিকে সে অপবাদ দেওয়া যায় না—আশ্চর্য্য এই যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সুসংলগ্ন সংক্ষিপ্ত এবং বোধগম্য। "আত্মসম্ভ্রম" প্রবন্ধ হইতে আমরা দুই এক জায়গা উদ্ধৃত

করি। বিলাতী পণ্যদ্রব্য ব্যবহার সম্বন্ধে লেখক লিখিতেছেন—“তুমি যাহার কাপড় পরিয়া আরাম পাও, যাহার হার্মোনিয়ম বাজাইয়া পুলকিত হও, যাহার রেলগাড়ি ও টেলিগ্রাফ দেখিয়া চমকিয়া যাও, যাহার পমেটাম ল্যাভেণ্ডার মাথায় দিয়া কৃতার্থ মনে কর, যাহার ফেটিঙে চড়িয়া স্বর্গসুখ লাভ কর, যাহার জাহাজ কামান তোমার দেবকীর্ত্তি বোধ হয় তাহার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ থাকুক্ বা না থাকুক্, তাহার গোলাম তোমাকে হইতেই হইবে। * * * ইংরাজের শিল্প সম্বন্ধে আমার এ বিশ্বাস অটল, যে, তাহার এ দেশের অর্দ্ধেক আধিপত্য রেল ও ষ্টীমার হইতে হইয়াছে; কারণ, সাধারণে এইগুলি সর্ব্বদা দেখিয়া থাকে ও বিস্ময়জনক মনে করে, সুতরাং ইহাতেই নিজের নিজের বল, সাহস ও অভিমান হারায়।”

সাহিত্য। দ্বিতীয় ভাগ। আশ্বিন। এই সংখ্যায় “ফুলদানী” নামক একটি ছোট উপন্যাস ফরাসীস্ হইতে অনুবাদিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ লেখক প্রস্পর মেরিমে প্রণীত এই গল্পটি যদিও সুন্দর কিন্তু ইহা বাঙ্গলা অনুবাদের যোগ্য নহে। বর্ণিত ঘটনা এবং পাত্রগণ বড় বেশি য়ুরোপীয়—ইহাতে বাঙ্গালী পাঠকদের রসাস্বাদনের বড়ই ব্যাঘাত করিবে। এমন কি সামাজিক প্রথার পার্থক্যহেতু মূল ঘটনাটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ মন্দই বোধ হইতে পারে। বিশেষতঃ মূল গ্রন্থের ভাষামাধুর্য্য অনুবাদে কখনই রক্ষিত হইতে পারে না, সুতরাং রচনার আব্রুটুকু চলিয়া যায়। “শিক্ষিতা নারী” প্রবন্ধে শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী বিস্তর গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় নারীদের অর্থোপার্জ্জনশক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপে মার্কিন

স্ত্রীডাক্তার স্ত্রীঅ্যাটর্নি এবং ইংরাজ স্ত্রীগ্রন্থকারদিগের আয়ের আলোচনা করা নিষ্ফল। বড় বড় ধনের অঙ্ক দেখাইয়া আমাদিগকে মিথ্যা প্রলোভিত করা হয় মাত্র। জর্জ্জ এলিয়ট্ তাঁহার প্রথম গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া লক্ষ টাকা মূল্য পাইয়াছিলেন। যদি নাও পাইতেন তাহাতে তাঁহার গৌরবের হানি হইত না। এমন দৃষ্টান্ত শুনা গিয়াছে অনেক পুরুষ গ্রন্থকার তাঁহাদের জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ নিতান্ত যৎসামান্য মূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা এই, পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অর্থোপার্জ্জন স্ত্রীলোকের কার্য্য নহে। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কোন স্ত্রীলোককে বাধ্য হইয়া স্বয়ং উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতে হয় তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া বা বাধা দেওয়া উচিত হয় না স্বীকার করি—কিন্তু সংসার রক্ষা করিতে হইলে সাধারণ স্ত্রীলোককে স্ত্রী এবং জননী হইতেই হইবে। সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালেই স্ত্রীলোক যে পুরুষের সমান শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন অবশ্যই তাহার একটা প্রাকৃতিক কারণ আছে। মানুষের প্রথম শিক্ষা বিদ্যালয়ে নহে, বহির্জগতে, কর্ম্মক্ষেত্রে। গর্ভধারণ এবং সন্তানপালনে অবশ্য নিযুক্ত হইয়া স্ত্রীলোক চিরকাল এবং সর্ব্বত্র সেই শিক্ষায় বহুল পরিমাণে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই জননীকর্ত্তব্যের উপযোগী হইবার অনুরোধে তাঁহাদের শারীরিক প্রকৃতিও ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ভিন্নতাই যে স্ত্রীপুরুষের বর্ত্তমান অবস্থাপার্থক্যের মূল প্রাকৃতিক কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে সভ্য সমাজের অবস্থা অনেক পরিমাণে নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। প্রথমতঃ, এককালে মানুষকে যাহা দায়ে পড়িয়া প্রকৃতির সহিত

সংগ্রাম করিয়া শিক্ষা করিতে হইত, এখন তাহার অধিকাংশ বিনা বিপদ ও চেষ্টায় বিদ্যালয়ে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ অবিশ্রাম যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি নিবারিত হইয়া স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ক্রমশঃ প্রকৃতির সামঞ্জস্য হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সভ্যতার একটি লক্ষণ এই, উত্তরোত্তর কর্ত্তব্যের ভাগ। কুঁড়ি যত ফুটিতে থাকে তাহার প্রত্যেক দল ততই স্বতন্ত্র হইয়া আসে। সভ্যতার উন্নতি অনুসারে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যও বাড়িয়া উঠিয়া তাহাকে পুরুষ হইতে পৃথক্ করিতে থাকিবে। অনেক পশু জন্মদান করিয়াই জননীকর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতি পায়। কিন্তু মনুষ্যমাতা বহুকাল সন্তানভার ত্যাগ করিতে পারেন না। অসভ্য অবস্থায় সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য অপেক্ষাকৃত লঘু ও ক্ষণস্থায়ী। যত সভ্যতা বাড়িতে থাকে, যতই মানুষের সম্পূর্ণতা পরিস্ফুট হইতে থাকে, ততই "মানুষ করা" কাজটা গুরুতর হইয়া উঠে। প্রথমে যাহা বিনা শিক্ষায় সম্পন্ন হইতে পারিত এখন তাহাতে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক করে। অতএব মানুষ যতই উন্নত হইয়া উঠিতে থাকে মাতার কর্ত্তব্য ততই গৌরবজনক এবং শিক্ষাসাধ্য হইয়া উঠে। তাহার পর, যিনি জননী হইয়াছেন, জননীর স্নেহ, জননীর সেবাপরায়ণতা, জননীর শিক্ষা বিশেষ করিয়া লাভ করিয়াছেন তিনি কি সন্তান যোগ্য হইবামাত্র সে গুলি বাক্সয় তুলিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন! তাঁহার সেই সমস্ত শিক্ষা তাঁহার সেই সমস্ত কোমল প্রবৃত্তির নিয়ত চর্চ্চা ব্যতীত তিনি কি চরিতার্থতা লাভ করিতে পারেন? এই জন্য তিনি স্বতই তাঁহার স্বামী ও পরিবারের জননীপদ গ্রহণ করেন—ইহা তাঁহার জীবনের স্বাভাবিক গতি। এবং

তাঁহার কন্যাও সেই জননীর গুণ প্রাপ্ত হয়, এবং নিঃসন্তান হইলেও হৃদয়ের গুণে তাঁহার সন্তানের অভাব থাকে না। প্রকৃতিই রমণীকে বিশেষ কার্য্যভার ও তদনুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া গৃহবাসিনী করিয়াছেন পুরুষের সার্ব্বভৌমিক স্বার্থপরতা ও উৎপীড়ন নহে—অতএব বাহিরের কর্ম্ম দিলে তিনি সুখী ও হইবেন না, সফলও হইবেন না। দেনা পাওনা, কেনাবেচা নিষ্ঠুর কাজ। সে কাজে যাহারা কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে চাহে তাহারা কেহ কাহাকেও রেয়াৎ করে না। পরস্পরকে নানা উপায়ে অতিক্রম করিয়া নিজের স্বার্থটুকুকে রক্ষা করা ব্যবসা, বিজ্‌নেস্। এই জন্য কার্য্যক্ষেত্রে সহৃদয়তা অধিকাংশ স্থলে হাস্যাস্পদ এবং বেশিদিন টিঁকিতেও পারে না। যিনি প্রকৃতির নিদেশানুসারে সংসারের মা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন তিনি যে শিক্ষা লাভ করিবেন তাহা বিক্রয় করিবার জন্য নহে, বিতরণ করিবার জন্য। অতএব আমেরিকায় যে দোকানদারী আরম্ভ হইয়াছে সে কথা না উথাপন করাই ভাল, তাহার ফলাফল এখনও পরীক্ষা হয় নাই।

তবে একথা সহস্রবার করিয়া বলিতে হইবে, মানুষকে "মানুষ করিয়া" তুলিতে শিক্ষার আবশ্যক। সেও যে কেবল সামান্য ছিটেফোঁটা মাত্র তাহা নহে, রীতিমত শিক্ষা। অবশ্য মানুষকে কেরাণী করিয়া তুলিতে বেশি শিক্ষা চাই না, স্তনদানের পালা সাঙ্গ করিয়া পাঠশালায় ছাড়িয়া দিলেই চলে; দোকানদার করিতে হইলেও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু আমরা সচরাচর মনে করি মানুষ হইয়া তেমন লাভ নাই, সুদে পোষায় না, যেমন তেমন করিয়া আপিসে প্রবেশ করিতে পারিলেই জীবনের কৃতার্থতা; অতএব মেয়েদের শিক্ষা দিবার আবশ্যক নাই, তাহারা স্তনদান

এবং রান্না বাড়্না করুক, আমরা সে কাজগুলাকে আধ্যাত্মিক আখ্যা দিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিব এবং শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সুখ সম্মানের পরিবর্ত্তে দেবী উপাধি দিয়া তাহাদিগকে বিনামূল্যে ক্রয় করিয়া রাখিব।

কার্ত্তিক। কার্ত্তিক মাসের সাহিত্যে "হিন্দুজাতির রসায়ণ" একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে অনেকগুলি প্রাচীন রাসায়ণিক যন্ত্রের বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যায় বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের আত্মজীবনচরিতের কয়েক পৃষ্ঠা বাহির হই-য়াছে। ইহাতে অলঙ্কারবাহুল্য বা আড়ম্বরের লেশমাত্র নাই। পূজনীয় লেখকমহাশয় সমগ্র গ্রন্থটি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া মনে একান্ত আক্ষেপ জন্মে। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে বাঙ্গালীদের পক্ষে শিক্ষার স্থল হইত। প্রথমতঃ একটি অকৃত্রিম মহত্ত্বের আদর্শ বঙ্গসাহিত্যে চিরজীবন লাভ করিয়া বিরাজ করিত, দ্বিতীয়তঃ আপনার কথা কেমন করিয়া লিখিতে হয় বাঙ্গালী তাহা শিখিতে পারিত। সাধারণতঃ বাঙ্গালী লেখকেরা নিজের জবানী কোন কথা লিখিতে গেলে অতিশয় সহৃদয়তা প্রকাশ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন—হায় হায় মরি মরি শব্দে পদে পদে হৃদয়াবেগ ও অশ্রুজল উদ্বেলিত করিয়া তোলেন। "আত্মজীবনচরিত" যতটুকু বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি সংযত সহৃদয়তা এবং নিরলঙ্কার সত্য প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীজাতির প্রতি লেখকমহাশয় যে ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কেমন সরল সমূলক ও অকৃত্রিম। আজকাল যাঁহারা স্ত্রীজাতির প্রতি আধ্যাত্মিক দেবত্ব আরোপ করিয়া বাক্-চাতুরী প্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহাদের সহিত কি প্রভেদ!

নূতন ডল্‌সেটিনা (হারমোনিয়ম)। মূল্য ৬৫৲ হইতে ৭৫৲।

প্যারিস প্রদর্শনীতে সর্ব্বোচ্চ স্বর্ণমেডেলধারী বিখ্যাত ফরাসীদেশীয় হারমোনিয়ম নির্ম্মাতা রডল্‌ফিল্‌স্‌ এণ্ড ডিবেন কর্ত্তৃক সলিড্‌ এবনাইজ্‌ড্‌ কাষ্ঠে প্রস্তুত। হাপর ভিতরে থাকাতে ঠাণ্ডা লাগে না পোকায় কাটে না। তিন গ্রাম, পাঁচ

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

রাজা ও রাণী	(নাটক)	এক টাকা।
বিসর্জ্জন	(নাটক)	এক টাকা।
রাজর্ষি	...	এক টাকা।
মানসী	...	দুই টাকা।
য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী	(ভূমিকা)	আট আনা।

উক্ত গ্রন্থকারের নিম্নলিখিত গ্রন্থ কলেজ ষ্ট্রীট পিপলস্ লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

কড়ি ও কোমল	...	এক টাকা।
সমালোচনা	...	এক টাকা।

সাধনা।

সপ্তস্বর।

সপ্তসুরে নিনাদিত ভারতীর বীণ—
চতুর্ব্বেদ চতুঃস্বর সা-রে-গা-মা সারি ;
সাম ঋক্ যজু এই আদি বেদ তিন
অথর্ব্ব মধ্যম ধ্বনি পূর্ণ হ'ল চারি।
বাল্মীকির উচ্চকণ্ঠে উঠিল পঞ্চম—
নিমেষে নগরী বন ছাড়ায়ে জগত
স্তরে স্তর হিমালয় করে অতিক্রম,
সপ্তলোক আরো উচ্চে ছায় ছায়া
কুরুক্ষেত্রকবি সেই বেদব্যাস বীর
একাকার চারিদিক সমুদ্রের মত—
অনন্ত গর্জ্জন যেন ধৈবতে গম্ভীর
ধ্বনি ধরণীতে ধায় চির ওতপ্রোত।
বিক্রমাদিত্য উদয়ে নবরত্ন-অলি
কালিদাস শেষ স্বর বাজে যুগে কলি।

সম্পত্তি সমর্পণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবন কুণ্ড মহা ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া তাহার বাপকে কহিল—"আমি এখনি চলিলাম।"

বাপ যজ্ঞনাথ কুণ্ড কহিল "বেটা অকৃতজ্ঞ, ছেলেবেলা হইতে তোকে খাওয়াইতে পরাইতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিবার নাম নাই, আবার তেজ দেখ না!"

যজ্ঞনাথের ঘরে যেরূপ অশন বসনের প্রথা, তাহাতে খুব যে বেশি ব্যয় হইয়াছে তাহা নহে। প্রাচীন কালের ঋষিরা আহার এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অসম্ভব অল্প খরচে জীবন নির্ব্বাহ করিতেন; যজ্ঞনাথের ব্যবহারে প্রকাশ পাইত বেশভূষা আহার বিহারে তাঁহারও সেইরূপ অত্যুচ্চ আদর্শ ছিল। সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই; সে কতকটা আধুনিক সমাজের দোষে, এবং কতকটা শরীররক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃতির কতকগুলি অন্যায় নিয়মের অনুরোধে। ছেলে যতদিন অবিবাহিত ছিল সহিয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পর হইতে খাওয়াপরা সম্বন্ধে বাপের অত্যন্ত বিশুদ্ধ আদর্শের সহিত ছেলের আদর্শের অনৈক্য হইতে লাগিল। দেখা গেল ছেলের আদর্শ ক্রমশই আধ্যাত্মিকের চেয়ে বেশি আধিভৌতিকের দিকে যাইতেছে। শীতগ্রীষ্মক্ষুধাতৃষ্ণাকাতর পার্থিব সমাজের অনুকরণে কাপড়ের বহর এবং আহারের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে। এ সম্বন্ধে পিতাপুত্রে প্রায় বচসা হইতে লাগিল। অবশেষে বৃন্দাবনের স্ত্রীর গুরুতর পীড়াকালে কবিরাজ

বহুব্যয়সাধ্য এক ঔষধের ব্যবস্থা করাতে যজ্ঞনাথ তাহাতেই কবিরাজের অনভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। বৃন্দাবন প্রথমে হাতে পায়ে ধরিল, তার পরে রাগারাগি করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। পত্নীর মৃত্যু হইলে বাপকে স্ত্রীহত্যাকারী বলিয়া গাল দিল। বাপ বলিল, "কেন, ঔষধ খাইয়া কেহ মরে না? দামী ঔষধ খাইলেই যদি বাঁচিত তবে রাজা বাদসারা মরে কোন্ দুঃখে! যেমন করিয়া তোর মা মরিয়াছে তোর দিদিমা মরিয়াছে তোর স্ত্রী তাহার চেয়ে কি বেশি ধুম করিয়া মরিবে?"

বাস্তবিক যদি শোকে অন্ধ না হইয়া বৃন্দাবন স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিত তাহা হইলে এ কথায় অনেকটা সান্ত্বনা পাইত। তাঁহার মা দিদিমা কেহই মরিবার সময় ঔষধ খান নাই। এ বাড়ির এইরূপ সনাতন প্রথা। কিন্তু আধুনিক লোকেরা প্রাচীন নিয়মে মরিতেও চায় না। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এদেশে ইংরাজের নূতন সমাগম হইয়াছে; কিন্তু সে সময়েও তখনকার সেকালের লোক তখনকার একালের লোকের ব্যবহার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অধিক করিয়া তামাক টানিত।

যাহা হউক্ তখনকার নব্য বৃন্দাবন তখনকার প্রাচীন যজ্ঞনাথের সহিত বিবাদ করিয়া কহিল "আমি চলিলাম!" বাপ তাহাকে তৎক্ষণাৎ যাইতে অনুমতি করিয়া সর্ব্বসমক্ষে কহিলেন, বৃন্দাবনকে যদি তিনি কখনো এক পয়সা দেন তবে তাহা গোরক্তপাতের সহিত গণ্য হইবে। বৃন্দাবনও সর্ব্বসমক্ষে যজ্ঞনাথের ধন গ্রহণ মাতৃরক্তপাতের তুল্যপাতক বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইহার পর পিতাপুত্রে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

বহুকাল শান্তির পরে এইরূপ একটি ছোটখাট বিপ্লবে গ্রামের লোক বেশ একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ যজ্ঞনাথের ছেলে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে যজ্ঞনাথের দুঃসহ পুত্রবিচ্ছেদদুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সকলেই বলিল, সামান্য একটা বৌয়ের জন্য বাপের সহিত বিবাদ করা কেবল একালেই সম্ভব। বিশেষতঃ তাহারা খুব একটা যুক্তি দেখাইল; বলিল, একটা বৌ গেলে অনতিবিলম্বে আর একটা বৌ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু বাপ গেলে দ্বিতীয় বাপ মাথা খুঁড়িলেও পাওয়া যায় না। যুক্তি খুব পাকা সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার বিশ্বাস, বৃন্দাবনের মত ছেলে এ যুক্তি শুনিলে অনুতপ্ত না হইয়া বরং কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইত।

বৃন্দাবনকে বিদায়কালে তাহার পিতা যে অধিক মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। বৃন্দাবন যাওয়াতে একত ব্যয় সংক্ষেপ হইল তাহার উপরে যজ্ঞনাথের একটা মহা ভয় দূর হইল। বৃন্দাবন কখন্ তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারে এই আশঙ্কা সর্ব্বদাই তাঁহার ছিল। যে অত্যল্প আহার ছিল তাহার সহিত বিষের কল্পনা সর্ব্বদাই লিপ্ত হইয়া থাকিত। বধূর মৃত্যুর পর এ আশঙ্কা কিঞ্চিৎ কমিয়াছিল এবং পুত্রের বিদায়ের পর অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ হইল।

কেবল একটি বেদনা মনে বাজিয়াছিল। যজ্ঞনাথের চারি-বৎসর বয়স্ক নাতি গোকুলচন্দ্রকে বৃন্দাবন সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। গোকুলের খাওয়াপরার খরচ অপেক্ষাকৃত কম ছিল। সুতরাং তাহার প্রতি যজ্ঞনাথের স্নেহ অনেকটা নিষ্কণ্টক ছিল।

তথাপি বৃন্দাবন যখন তাহাকে নিতান্তই লইয়া গেল তখন অকৃত্রিম শোকের মধ্যেও যজ্ঞনাথের মনে মুহূর্ত্তের জন্য একটা জমাখরচের হিসাব উদয় হইয়াছিল; উভয়ে চলিয়া গেলে মাসে কতটা খরচ কমে এবং বৎসরে কতটা দাঁড়ায়—এবং যে টাকাটা সাশ্রয় হয় তাহা কত টাকার সুদ।

কিন্তু তবু, শূন্য গৃহে গোকুলচন্দ্রের উপদ্রব না থাকাতে গৃহে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিল। আজকাল যজ্ঞনাথের এমনি মুস্কিল হইয়াছে, পূজার সময়ে কেহ ব্যাঘাত করে না, খাওয়ার সময় কেহ কাড়িয়া খায় না, হিসাব লিখিবার সময় দোয়াত লইয়া পালায় এমন উপযুক্ত লোক কেহ নাই। নিরুপদ্রবে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইল যেন মৃত্যুর পরেই লোকে এইরূপ উৎপাতহীন শূন্যতা লাভ করে; বিশেষতঃ বিছানার কাঁথায় তাঁহার নাতির কৃত ছিদ্র এবং বসিবার মাদুরে উক্ত শিল্পীকৃত অঙ্কিত মসীচিহ্ন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আরও অশান্ত হইয়া উঠিত। সেই অমিতাচারী বালকটি দুই বৎসরের মধ্যেই পরিবার ধুতি সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া পিতামহের নিকট বিস্তর তিরস্কার সহ্য করিয়াছিল; এক্ষণে তাহার শয়নগৃহে সেই শতগ্রন্থিবিশিষ্ট মলিন পরিত্যক্ত চীরখণ্ড দেখিয়া তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিয়াছিল; সেটি, পলিতাপ্রস্তুতকরণ কিম্বা অন্য কোন গার্হস্থ্য-ব্যবহারে না লাগাইয়া যত্নপূর্ব্বক সিন্ধুকে তুলিয়া রাখিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি গোকুল ফিরিয়া আসে এবং এমন কি, বৎসরে একখানি করিয়া ধুতিও নষ্ট করে তথাপি তাহাকে তিরস্কার করিবেন না। কিন্তু গোকুল ফিরিল না এবং

যজ্ঞনাথের বয়স যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠিল এবং শূন্য গৃহ প্রতিদিন শূন্যতর হইতে লাগিল।

যজ্ঞনাথ আর ঘরে স্থির থাকিতে পারেন না। এমন কি, মধ্যাহ্নে যখন সকল সম্ভ্রান্ত লোকই আহারান্তে নিদ্রাসুখ লাভ করে যজ্ঞনাথ হুঁকাহস্তে পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার এই নীরব মধ্যাহ্নভ্রমণের সময় পথের ছেলেরা খেলা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিয়া তাঁহার মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে স্থানীয় কবিরচিত বিবিধ ছন্দোবদ্ধ রচনা শ্রুতিগম্য উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিত। পাছে আহারের ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া তাঁহার পিতৃদত্ত নাম উচ্চারণ করিতে কেহ সাহস করিত না, এই জন্য সকলেই স্বেচ্ছামতে তাঁহার নূতন নামকরণ করিত। বুড়োরা তাঁহাকে যজ্ঞনাশ বলিতেন কিন্তু ছেলেরা কেন যে তাঁহাকে "চামচিকে" বলিয়া ডাকিত তাহার স্পষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় তাঁহার রক্তহীন শীর্ণ চর্ম্মের সহিত উক্ত খেচরের কোন্‌প্রকার শরীরগত সাদৃশ্য ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একদিন এইরূপে আম্রতরুচ্ছায়াশীতল গ্রামের পথে যজ্ঞনাথ মধ্যাহ্নে বেড়াইতেছিলেন—দেখিলেন এক জন অপরিচিত বালক গ্রামের ছেলেদের সর্দ্দার হইয়া উঠিয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন উপদ্রবের পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছে। অন্যান্য বালকেরা তাহার চরিত্রের বল এবং কল্পনার নূতনত্বে অভিভূত হইয়া কায়মনে তাহার বশ মানিয়াছে। অন্য বালকেরা বৃদ্ধকে দেখিয়া যেরূপ খেলায় ভঙ্গ দিত, এ তাহা না করিয়া চট্‌ করিয়া আসিয়া যজ্ঞ-

নাথের গায়ের কাছে চাদর ঝাড়া দিল এবং একটা বন্ধনমুক্ত গিরগিটি চাদর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার গা বাহিয়া অরণ্যাভিমুখে পলায়ন করিল—আকস্মিক ত্রাসে বৃদ্ধের সর্ব্ব-শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ছেলেদের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের কলরব পড়িয়া গেল। আর কিছুদূর যাইতে না যাইতে যজ্ঞনাথের স্কন্ধ হইতে হঠাৎ তাঁহার গামছা অদৃশ্য হইয়া অপরিচিত বালকটির মাথায় পাগ্ড়ির আকার ধারণ করিল। এই অজ্ঞাত মানবকের নিকট হইতে এইপ্রকার নূতন প্রণালীর শিষ্টাচার প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞনাথ ভারি সন্তুষ্ট হইলেন। কোন বালকের নিকট হইতে এরূপ অসঙ্কোচ আত্মীয়তা তিনি বহুদিন পান নাই। বিস্তর ডাকাডাকি করিয়া এবং নানামত আশ্বাস দিয়া যজ্ঞনাথ তাহাকে কতকটা আয়ত্ত করিয়া লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি?" সে বলিল "নিতাই পাল।" "বাড়ি কোথায়?" "বলিব না।" "বাপের নাম কি?" "বলিব না।" "কেন বলিবে না?" "আমি বাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়া আসিয়াছি।" "কেন?" "আমার বাপ আমাকে পাঠশালায় দিতে চা'য়।" এরূপ ছেলেকে পাঠশালায় দেওয়া যে একটা নিষ্ফল অপব্যয় এবং বাপের বিষয়বুদ্ধিহীনতার পরিচয়, তাহা তৎক্ষণাৎ যজ্ঞনাথের মনে উদয় হইল। যজ্ঞনাথ বলিলেন "আমার বাড়িতে আসিয়া থাকিবে?" বালকটি কোন আপত্তি না করিয়া এমনি নিঃসঙ্কোচে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিল যেন সে একটা পথ-প্রান্তবর্ত্তী তরুতল। কেবল তাহাই নয়, খাওয়াপরা সম্বন্ধে এমনি অম্লানবদনে নিজের অভিপ্রায়মত আদেশ প্রচার করিতে লাগিল যেন পূর্ব্বাহ্নেই তাহার পূরা দাম চুকাইয়া দিয়াছে।

এবং ইহা লইয়া মাঝে মাঝে গৃহস্বামীর সহিত রীতিমত ঝগড়া করিত। নিজের ছেলেকে পরাস্ত করা সহজ কিন্তু পরের ছেলের কাছে যজ্ঞনাথকে হার মানিতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যজ্ঞনাথের ঘরে নিতাই পালের এইরূপ অভাবনীয় সমাদর দেখিয়া গ্রামের লোক আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বুঝিল, বৃদ্ধ আর বেশি দিন বাঁচিবে না এবং কোথাকার এই বিদেশী ছেলে-টাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া যাইবে। বালকের উপর সকলেরই পরম ঈর্ষ্যা উপস্থিত হইল এবং সকলেই তাহার অনিষ্ট করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইল। কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে বুকের পাঁজরের মত ঢাকিয়া বেড়াইত। ছেলেটা মাঝে মাঝে চলিয়া যাইবে বলিয়া শাসাইত। যজ্ঞনাথ তাহাকে প্রলোভন দেখাইত "ভাই তোকে আমি আমার সমস্ত বিষয় আশয় দিয়া যাইব।" বালকের বয়স অল্প কিন্তু এই আশ্বাসের মর্য্যাদা সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিত।

তখন গ্রামের লোকেরা বালকের বাপের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সকলেই বলিল "আহা বাপমার মনে না জানি কত কষ্টই হইতেছে! ছেলেটাও ত পাপিষ্ঠ কম নয়!" বলিয়া ছেলেটার উদ্দেশে অকথ্য উচ্চারণে গালি প্রয়োগ করিত। তাহার এতই বেশি ঝাঁজ যে ন্যায়বুদ্ধির উত্তেজনা অপেক্ষা তাহাতে স্বার্থের গাত্রদাহ বেশি অনুভূত হইত।

বৃদ্ধ একদিন এক পথিকের কাছে শুনিতে পাইল, দামোদর পাল বলিয়া এক ব্যক্তি তাহার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, অবশেষে এই গ্রামের অভিমুখেই আসিতেছে।

নিতাই এই সংবাদ শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। ভাবী বিষয় আশয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া পলায়নোদ্যত হইল। যজ্ঞনাথ নিতাইকে বারম্বার আশ্বাস দিয়া কহিল, "তোমাকে আমি এমন স্থানে লুকাইয়া রাখিব যে, কেহই খুঁজিয়া পাইবে না। গ্রামের লোকেরাও না।" বালকের ভারি কৌতূহল হইল, কহিল "কোথায় দেখাইয়া দাওনা।" যজ্ঞনাথ কহিল "এখন দেখাইতে গেলে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। রাত্রে দেখাইব।" নিতাই এই নূতন রহস্য আবিষ্কারের আশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বাপ অকৃতকার্য্য হইয়া চলিয়া গেলেই বালকদের সঙ্গে বাজি রাখিয়া একটা লুকোচুরি খেলিতে হইবে এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিল। কেহ খুঁজিয়া পাইবে না! ভারি মজা! বাপ আসিয়া সমস্ত দেশ খুঁজিয়া কোথাও তাহার সন্ধান পাইবে না সেও খুব কৌতুক।

মধ্যাহ্নে যজ্ঞনাথ বালককে গৃহে রুদ্ধ করিয়া কোথায় বাহির হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিলে নিতাই তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল। সন্ধ্যা হইতে না হইতে বলিল "চল।" যজ্ঞনাথ বলিল "এখনো রাত্রি হয় নাই।" নিতাই আবার কহিল "রাত্রি হইয়াছে দাদা, চল।" যজ্ঞনাথ কহিল "এখনো পাড়ার লোক ঘুমায় নাই।" নিতাই মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়াই কহিল "এখন ঘুমাইয়াছে, চল।"

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। নিদ্রাতুর নিতাই বহুকষ্টে নিদ্রা সম্বরণের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি দুই প্রহর হইলে যজ্ঞনাথ নিতাইয়ের হাত ধরিয়া নিদ্রিত গ্রামের অন্ধকার পথে বাহির হইলেন। আর কোন শব্দ নাই, কেবল থাকিয়া থাকিয়া কুকুর ঘেউ ঘেউ

করিয়া ডাকিয়া উঠিল, এবং সেই শব্দে নিকটে এবং দূরে যতগুলা কুকুর ছিল সকলে তারস্বরে যোগ দিল। মাঝে মাঝে নিশাচর পক্ষী পদশব্দে ত্রস্ত হইয়া ঝট্‌পট্‌ করিয়া বনের মধ্য দিয়া উড়িয়া গেল। নিতাই ভয়ে যজ্ঞনাথের হাত দৃঢ় করিয়া ধরিল।

অনেক মাঠ ভাঙ্গিয়া অবশেষে এক জঙ্গলের মধ্যে এক দেবতাহীন ভাঙ্গা মন্দিরে উভয়ে গিয়া উপস্থিত হইল। নিতাই কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল "এইখানে!" যেরূপ মনে করিয়াছিল সেরূপ কিছুই নয়। ইহার মধ্যে তেমন রহস্য নাই। পিতৃগৃহ-ত্যাগের পর এমন পোড়ো মন্দিরে তাহাকে মাঝে মাঝে রাত্রি-যাপন করিতে হইয়াছে। স্থানটা যদিও লুকাচুরি খেলার পক্ষে মন্দ নয় কিন্তু তবু এখান হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

যজ্ঞনাথ মন্দিরের মধ্য হইতে একখণ্ড পাথর উঠাইয়া ফেলিল। বালক দেখিল নিম্নে একটা ঘরের মত, এবং সে-খানে প্রদীপ জ্বলিতেছে। দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় এবং কৌতুহল হইল, সেই সঙ্গে ভয়ও করিতে লাগিল। একটি মই বাহিয়া যজ্ঞনাথ নামিয়া গেলেন তাহার পশ্চাতে নিতাইও ভয়ে ভয়ে নামিল। নীচে গিয়া দেখিল চারিদিকে পিতলের কলস। মধ্যে একটি আসন এবং তাহার সম্মুখে সিঁদুর চন্দন ফুলের মালা পূজার উপকরণ। বালক কৌতূহলনিবৃত্তি করিতে গিয়া দেখিল ঘড়ায় কেবল টাকা এবং মোহর।

যজ্ঞনাথ কহিল, "নিতাই, আমি বলিয়াছিলাম আমার সমস্ত টাকা তোমাকে দিব। আমার অধিক কিছুই নাই, সবে এই ক'টি মাত্র ঘড়া আমার সম্বল। আজ আমি ইহার

সমস্তই তোমার হাতে দিব।” বালক লাফাইয়া উঠিয়া কহিল “সমস্তই? ইহার একটি টাকাও তুমি লইবে না?” “যদি লই তবে আমার হাতে যেন কুষ্ঠ হয়। কিন্তু একটা কথা আছে। যদি কখনো আমার নিরুদ্দেশ নাতি গোকুলচন্দ্র কিম্বা তাহার ছেলে কিম্বা তাহার পৌত্র কিম্বা তাহার প্রপৌত্র কিম্বা তাহার বংশের কেহ আসে তবে তাহার কিম্বা তাহাদের হাতে এই সমস্ত টাকা গণিয়া দিতে হইবে।” বালক মনে করিল যজ্ঞনাথ পাগল হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল, “আচ্ছা।” যজ্ঞনাথ কহিল “তবে এই আসনে বইস।” “কেন?” “তোমার পূজা হইবে।” “কেন?” “এইরূপ নিয়ম।” বালক আসনে বসিল। যজ্ঞনাথ তাহার কপালে চন্দন দিল, সিঁদুরের টিপ দিয়া দিল, গলায় মালা দিল; সম্মুখে বসিয়া বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিল।

দেবতা হইয়া বসিয়া মন্ত্র শুনিতে নিতাইয়ের ভয় করিতে লাগিল; ডাকিল “দাদা।” যজ্ঞনাথ কোন উত্তর না করিয়া মন্ত্র পড়িয়া গেলেন। অবশেষে এক একটি ঘড়া বহু কষ্টে টানিয়া বালকের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া উৎসর্গ করিলেন এবং প্রত্যেক-বার বলাইয়া লইলেন “যুধিষ্ঠির কুণ্ডের পুত্র গদাধর কুণ্ড তস্য পুত্র প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ড তস্য পুত্র পরমানন্দ কুণ্ড তস্য পুত্র যজ্ঞনাথ কুণ্ড তস্য পুত্র বৃন্দাবন কুণ্ড তস্য পুত্র গোকুলচন্দ্র কুণ্ডকে কিম্বা তাহার পুত্র অথবা পৌত্র অথবা প্রপৌত্রকে কিম্বা তাহার বংশের ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে এই সমস্ত টাকা গণিয়া দিব।”

এইরূপ বার বার আবৃত্তি করিতে করিতে ছেলেটা হতবুদ্ধির মত হইয়া আসিল। তাহার জিহ্বা ক্রমে জড়াইয়া আসিল। যখন

অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইয়া গেল তখন দীপের ধূম ও উভয়ের নিশ্বাস-বায়ুতে সেই ক্ষুদ্র গহ্বর বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। বালকের তালু শুষ্ক হইয়া গেল, হাত পা জ্বালা করিতে লাগিল, শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল।

প্রদীপ ম্লান হইয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল। অন্ধকারে বালক অনুভব করিল যজ্ঞনাথ মই বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। ব্যাকুল হইয়া কহিল "দাদা, কোথায় যাও!" যজ্ঞনাথ কহিলেন "আমি চলিলাম। তুই এখানে থাক্—তোকে আর কেহই খুঁজিয়া পাইবে না। কিন্তু মনে রাখিস্, যজ্ঞনাথের পৌত্র বৃন্দাবনের পুত্র গোকুলচন্দ্র।" বলিয়া উপরে উঠিয়াই মই তুলিয়া লইলেন। বালক রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠ হইতে বহুকষ্টে বলিল "দাদা, আমি বাবার কাছে যাব!" যজ্ঞনাথ ছিদ্রমুখে পাথর চাপা দিলেন এবং কান পাতিয়া শুনিলেন—নিতাই আর একবার রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল "বাবা"। তার পরে একটা পতনের শব্দ হইল, তার পরে আর কোন শব্দ হইল না।

যজ্ঞনাথ এইরূপে যক্ষের হস্তে ধন সমর্পণ করিয়া সেই প্রস্তর-খণ্ডের উপর মাটি চাপা দিতে লাগিলেন। তাহার উপরে ভাঙ্গা মন্দিরের ইঁট বালি স্তূপাকার করিলেন। তাহার উপর ঘাসের চাপড়া বসাইলেন, বনের গুল্ম রোপণ করিলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল কিন্তু কিছুতেই সে স্থান হইতে নড়িতে পারিলেন না। থাকিয়া থাকিয়া কেবলি মাটিতে কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল যেন অনেক দূর হইতে, পৃথিবীর অতলস্পর্শ হইতে একটা ক্রন্দনধ্বনি উঠিতেছে। মনে হইল যেন রাত্রির আকাশ সেই একমাত্র শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া

ভাগ করিয়াছেন। একদলের নাম দিয়াছেন এরোবি, অন্য দলের নাম অ্যানেরোবি। এরোবিগণ মৃতদেহের উপরিভাগে জন্মলাভ করিয়া তাহাকে পচাইয়া অল্পে অল্পে জ্বালাইয়া ধ্বংশ করিয়া ফেলে, এবং অ্যানেরোবিগণ গলিত পদার্থের নিম্নভাগে উৎপন্ন হইয়া তাহার ক্ষয় সাধন করিতে থাকে; বিশুদ্ধ বায়ুর অক্সিজেন বাষ্প লাগিলেই তাহারা মরিয়া যায় এবং উপরিতলস্থ এরোবিগণ তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলে। এইরূপে দুইদলে মিলিয়া পৃথিবীর সমস্ত মৃত পদার্থ অপসৃত করিতে থাকে। ইহারা না থাকিলে মৃত্যু অমর হইয়া থাকিত এবং অবিকৃত মৃতদেহস্তূপে ধরাতলে পা ফেলিবার স্থান থাকিত না। পৃথিবীর যে অংশে এই জীবাণুদের গতিবিধি নাই সেখানে জীবজন্তু উদ্ভিদ্ কিছুই নাই। সেখানে হয় বালুকাময় মরুভূমি নয় অনন্ত তুষারক্ষেত্র। সেখানে মৃতদেহ কিছুতেই পচিতে চায় না; শকুনি গৃধিনী ও দৈবাগত কোন মাংসাদ জীবের সাহায্য ব্যতীত সেখানকার মৃতদেহ অপসারণের অন্য কোন উপায় নাই।

ফ্রান্সে যখন একসময়ে গুটিপোকার মধ্যে একপ্রকার মড়ক উপস্থিত হইয়া রেশমের চাষের বিশেষ ব্যাঘাত করিতে লাগিল তখন বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া প্যাষ্টুর অন্য কর্ম্ম ফেলিয়া সেই গুটিপোকার রোগতথ্য অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্যাষ্টুর ডাক্তার নহেন, জীবতত্ত্ববিৎ নহেন, রসায়ণ শাস্ত্রেই তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি—মদ কি করিয়া গাঁজিয়া বিকৃত হইয়া উঠে সেই অনুসন্ধানেই তিনি অধিকাংশ সময়ক্ষেপ করিয়াছেন সহসা গুটিপোকার রোগ নির্ণয় করিতে বসা তাঁহার পক্ষে একপ্রকার অনধিকারচর্চ্চা বলিয়া মনে হইতে পারে। এবং প্যাষ্টুরও

এই কার্য্যভার গ্রহণ করিতে প্রথমে কিছু ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, অণুবীক্ষণের সাহায্যে কিছুদিন সন্ধান করিতে করিতে পণ্ডিতবর দেখিতে পাইলেন, জীবাণুতে যেমন মদ গাঁজিয়া উঠে, জীবাণুই তেমনি গুটিপোকার রোগের কারণ। মদের রোগ এবং প্রাণীর রোগের মধ্যে ঐক্য বাহির হইয়া পড়িল, এবং পূর্ব্বে তিনি যে সন্ধানে প্রবৃত্ত ছিলেন এখানেও তাহার অনুবৃত্তি ধরিতে পারিলেন। অবশেষে এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, জীবশরীরের অনেক রোগ এই জীবাণুর দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহারা অনুক্ষণ শনি ও কলির ন্যায় শরীরে প্রবেশ করিবার ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে; স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ইহারা সেই অবসরে দেহ আশ্রয় করিয়া বসে এবং শরীরের রসকে বিকৃত করিতে থাকে।

বাহিরে যখন আমাদের এত অদৃশ্য শত্রু অন্তরে অবশ্য তাহার কতকটা প্রতিবিধান আছে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে শত্রুও যেমন, আমাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী রক্ষকও সেইরূপ। কুকুরের অনুরূপ মুগুর। দুইই নিরতিশয় ক্ষুদ্র। ডাক্তার উইল্‌সন্‌ সাহেব তৎসম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন আমরা তাহারই কতক কতক সংকলন করিয়া দিলাম।

ভাল অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে গেলে রক্তকণা জলের মত বর্ণহীন দেখায়। তাহার কারণ এই, আসলে, বর্ণহীন রসের উপর অসংখ্য লোহিত কণা ভাসিতেছে; খালি চোখে সেই লোহিত বর্ণের কণাগুলিই আমাদের নিকটে রক্তকে লাল বলিয়া প্রতিভাত করে—অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত সেই বর্ণহীন রস আমরা

দেখিতে পাই না। রক্তের এই লোহিত কণাগুলির বিশেষ কাজ আছে। আমরা নিশ্বাসের সহিত যে বায়ু গ্রহণ করি ঐ লোহিত কণাগুলি তাহার মধ্য হইতে অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া লয় এবং শরীরের কার্ব্বনিক অ্যাসিড বাষ্প নামক বিষবায়ু ফুস্ফুসের নিকট বহন করিয়া আনে এবং আমরা তাহা প্রশ্বাসের সহিত নিক্রান্ত করিয়া দিই।

রক্তস্থ শ্বেতকণার কার্য্য অন্যরূপ। তাহারা প্রত্যেকে অতিশয় ক্ষুদ্র জীবনবিশিষ্ট কোষ। ইহাদের আয়তন এক ইঞ্চির পঁচিশ শত ভাগের একভাগ। গতসংখ্যক সাধনায় "প্রাণ ও প্রাণী" প্রবন্ধে প্রটোপ্ল্যাস্ম্ নামক সর্ব্বাপেক্ষা আদিম প্রাণীপিণ্ডের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে; রক্তের এই শ্বেতকণাগুলি সেই প্রটোপ্ল্যাস্ম্ কোষ। আমাদের শরীরে বাস করে বটে তথাপি ইহারা স্বাধীন জীব। এই লক্ষ লক্ষ প্রাণীপ্রবাহ আমাদের শরীরে যথেচ্ছ চলাফেরা করিয়া বেড়ায়; ইহাদের গতিবিধির উপরে আমাদের কোন হাত নাই। ইহারা অনেক সময় যেন যদৃচ্ছা-ক্রমে রক্তবহ নাড়ি ভেদ করিয়া আমাদের শরীরতন্তুর মধ্যে প্রবেশ করে, এবং দেহের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে বাহির হয়।

অনুবীক্ষণযোগে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় অ্যামীবা প্রভৃতি জীবাণুদের ন্যায় ইহারা অনুক্ষণ আকার পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। এবং ইহাও দেখা গিয়াছে খাদ্যকণা পাইলে ইহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া রীতিমত পরিপাক করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই আহারের ক্ষমতা দেখিয়াই পণ্ডিতগণ ইহার নাম "ফ্যাগোসাইট্" অর্থাৎ ভক্ষককোষ রাখিয়াছেন। ইহার অপর নাম "লিউকোসাইট্" বা শ্বেতকোষ।

ইহারা যে কিরূপ আহারপটু তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সকলেই জানেন ব্যাঙাচি ব্যাং হইয়া দাঁড়াইলে তাহার ল্যাজ অন্তর্হিত হইয়া যায়। আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, ব্যাঙাচির রক্তবহ নাড়ি ত্যাগ করিয়া বিস্তর শ্বেত-কোষ দলে দলে তাহার ল্যাজটুকু অধিকার করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সেখানকার স্নায়ু এবং মাংসপেশী ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। শরীরের অধিবাসীরা এমনতর মনঃসংযোগপূর্ব্বক লাগিলে তুচ্ছ পুচ্ছটুকু আর কতক্ষণ টিঁকিতে পারে! বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে ব্যাঙাচির কান্‌কা লোপ পায় সেও এইরূপ কারণে।

কেবল যে শরীরের অনাবশ্যক ভার মোচন ইহাদের কাজ তাহা নহে। রোগস্বরূপে বাহিরের যে সকল জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে ইহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া রীতি-মত হাতাহাতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। বাহিরের আক্রমণকারীগণ যদি যুদ্ধে জয়ী হয় তবে আমরা জ্বর প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি দ্বারা অভিভূত হই, আর যদি আমাদের শরীরের রক্ষক সৈন্যদল জয়ী হয় তবে আমরা রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাই।

স্মরণ হইতেছে, অন্যত্র কোন প্রবন্ধে পাঠ করিয়াছি কেবল রোগ কেন, পীড়াজনক যে কোন পদার্থ আমাদের শরীরে নিবিষ্ট হয় এই সর্ব্বভুক্‌গণ তাহাকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংশ করিতে চেষ্টা পায়। চোখে একটুক্‌রা বালি পড়িলে সেটাকে লোপ করিবার জন্য ইহারা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসে—চক্ষু সেই সংগ্রামচিহ্নে রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। শরীরে কিছু বিদ্ধ হইলে এই সৈন্যকণিকা-গুলি ভীড় করিয়া আসিয়া সেস্থান লাল করিয়া তোলে। ক্ষতস্থানের পূঁয পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, ব্যাধিবীজগুলিকে

ইহারা চারিদিক হইতে আক্রমণ করিয়া খাইবার চেষ্টা করিতেছে।

শরীরের সবল অবস্থায় বোধ করি এই শ্বেতকোষগুলি স্বভাবতঃ তেজস্বী থাকে এবং ব্যাধিবীজকে সহজে পরাহত করিতে পারে। অনাহার অতিশ্রম অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে শরীরের দুর্ব্বল অবস্থায় যখন ইহারা হীনতেজ থাকে তখন ম্যালেরিয়া ওলাউঠা প্রভৃতি ব্যাধিবীজগণ অকস্মাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করে।

যাহা হউক্, বায়ুবিহারী জীববীজাণুগণ ব্যাধিশস্য উৎপাদনের জন্য সর্ব্বদা উপযুক্ত ক্ষেত্র অনুসন্ধান করিতেছে এই কথা স্মরণ করিয়া আহার, পানীয় ও বাসস্থান পরিষ্কার রাখা আমাদের নিজের ও প্রতিবেশীদের হিতের পক্ষে কত অত্যাবশ্যক তাহা কাহারো অবিদিত থাকিবে না।

সাময়িক সারসংগ্রহ।

ক্ষিপ্ত রমণীসম্প্রদায়।

যে সকল ইংরাজ স্ত্রীলোক রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিয়া পুরুষের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে বিলাতের বিখ্যাত লেখিকা লিন্ লিণ্টন্ জুলাই মাসের নাইণ্টীন্থ্ সেঞ্চুরিতে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা গত সংখ্যক সাধনায় "সাহিত্যে" প্রকাশিত প্রবন্ধবিশেষের সমালোচনায় রমণী-

দের বিশেষ কার্য্য সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম পাঠকগণ লিন্ লিণ্টনের এই প্রবন্ধের সহিত তাহার বিস্তর ঐক্য দেখিতে পাইবেন।

লেখিকা বলেন, কথাটা শুনিতে ভাল লাগুক্ বা না লাগুক্, জননী হওয়াই স্ত্রীলোকের অস্তিত্বের প্রধান সার্থকতা, এবং প্রকৃতি সেই কারণেই তাহাকে অঙ্গে প্রত্যঙ্গে পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া গড়িয়াছে। যাহাতে করিয়া রমণীর সুস্থ সন্তান উৎপাদন ও শিশুসন্তান পালনপোষণ করিবার শক্তি হ্রাস করে তাহা সমাজ ও প্রকৃতির নিকটে অপরাধস্বরূপ গণ্য হওয়া উচিত।

মনুষ্যের কতকগুলি বিশুদ্ধ ও উচ্চ ভাবের আকরস্থল আছে গৃহ তাহার মধ্যে একটি। যদি পুরুষেরা উপার্জ্জন রাজ্যশাসন প্রভৃতি বাহিরের কার্য্য এবং স্ত্রীলোকেরা স্বজনসেবা সমাজ-রক্ষা প্রভৃতি ভিতরের কার্য্য না করে তবে এই গৃহ এক দণ্ড টিঁকিতে পারে না। সমাজের যতই উন্নতি হয় স্ত্রীপুরুষের কার্য্য-বিভাগ ততই সুনির্দ্দিষ্ট হইতে থাকে। সমাজের নিম্নস্তরেই দেখা যায় চাষাদের মেয়েরা কৃষিকার্য্যে পুরুষের সহযোগিতা করিয়া থাকে।

যাঁহারা একদিকে আত্মমাহাত্ম্য এবং অন্যদিকে রমণীর সুমিষ্ট সুকোমল হৃদয়বত্তার মধ্যে দোদুল্যমান হইতেছেন তাঁহা-দিগকে একটু বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। একসঙ্গে দুই দিক রক্ষা হয় না। হয় রাজনৈতিক সংগ্রাম নয় পারিবারিক শান্তি, হয় বক্তৃতামঞ্চ নয় গৃহ, হয় স্বাতন্ত্র্য নয় প্রেম, হয় ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির শুষ্কতা ও নিষ্ফলতা নয় উর্ব্বরা পরিপূর্ণা বিচিত্র ফল-শালিনী স্ত্রীপ্রকৃতি,এই দুয়ের মধ্যে একটাকে বরণ করিতে হইবে।

স্ত্রীলোকের হস্তে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দিবার বিরুদ্ধে এমন একটি যুক্তি আছে যাহার আর উত্তর সম্ভবে না। রাজকার্য্যে যখন আবশ্যক হইবে তখন পুরুষেরা রণক্ষেত্রে রক্তপাত করিতে বাধ্য কিন্তু স্ত্রীলোকের নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। অতএব যুদ্ধ বাধাইবার বেলা স্ত্রীলোক থাকিবেন আর রক্তপাতের বেলায় পুরুষ এটা ঠিক সঙ্গত হয় না। আর স্ত্রীলোক যে স্বভাবতই শান্তির পক্ষপাতী হইবে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। য়ুরোপের কতকগুলি দারুণতর যুদ্ধ স্ত্রীলোকের দ্বারাই ঘটিয়াছে। মাডাম্ ডে ম্যাণ্ট‍্নঁ কি শান্তিপ্রয়াসিনী ছিলেন? ফ্রাঙ্কোপ্রুশীয় যুদ্ধের প্রাক্কালে "বর্লিনে চল" বলিয়া ফ্রান্সে যে একটা রব উঠিয়াছিল, যে উন্মত্ততার ফলে এত রক্ত এবং এত অর্থব্যয় হইয়া গেল, সাম্রাজ্ঞী য়ুজেনীর কি তাহাতে কোন হাত ছিল না? রুশিয়ার সুন্দরী যুবতীদের মধ্যে কি এমন কোন নাইহিলিষ্ট্ নাই যাঁহারা হত্যা ও সর্ব্বনাশ প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন? বাতাসে উইলোপত্র যেরূপ কাঁপিয়া ওঠে, উত্তেজনাবাক্যে রমণীহৃদয় সেইরূপ বিচলিত হয়। তাহার পর একবার রমণী ক্ষেপিয়া দাঁড়াইলে তাহার বাধা বিপদের চেতনা থাকে না, হিতাহিতের জ্ঞান দূর হইয়া যায়।

ফ্রান্সে সর্ব্ববিষয়ে স্ত্রীলোকের শাসন যেরূপ বলবৎ এমন আর কোথাও নয়, কিন্তু সেখানে স্ত্রীলোক যখনি রাজ্যতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করিয়াছে তখনি বিপদ ঘটাইয়াছে।

সর্ব্বময় প্রভুত্বপ্রিয়তা এবং আপনার মতকেই পাঁচ কাহন করা স্ত্রীস্বভাবের অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। আমেরিকায় রমণী যখনি প্রবল হয় একেবারে জবরদস্তি করিয়া মদের দোকান ভাঙিয়া

দেয় এবং জোর হুকুমে মদ্যবিক্রয় বন্ধ করিয়া বসে। এদিকে ইঁহারা নিজে হয় ত চা, ইথর্ ক্লোরালে অভিষিক্ত হইয়া নিজের স্বাস্থ্য ও স্নায়ু জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছেন, অপ্রিয় কর্ম্মফল হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশে বিবিধ বিপজ্জনক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, কাহার সাধ্য তাহাতে হস্তক্ষেপ করে!

মাতৃত্বের মধ্যে একটি অপ্রতিহত কর্ত্তৃত্ব আছে। শিশুসন্তানের উপর মায়ের অখণ্ড অধিকার। এ সম্বন্ধে কাহারো কাছে তাহার কোন জবাবদিহি নাই। যুগযুগান্তর এই মাতৃকর্ত্তৃত্ব চালনা করিয়া রমণীহৃদয়ে একটা অন্ধ আত্মপ্রভুত্বের ভাব বদ্ধমূল হইয়া আছে। বংশরক্ষার পক্ষে এই নিজ হৃদয়ানুসারী কর্ত্তৃত্বপ্রিয়তা বিশেষ আবশ্যক কিন্তু রাজ্যরক্ষার পক্ষে, ব্যাপক ন্যায়াচরণের পক্ষে, সাধারণ হিতোদ্দেশে অল্পসংখ্যকের দমনের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

সীমান্ত প্রদেশ ও আশ্রিতরাজ্য।

ইংরাজ যে কি কৌশলে রাজ্যবিস্তার ও রাজ্যরক্ষা করিতেছেন, অগষ্ট মাসের নাইণ্টীন্থ সেঞ্চুরি পত্রিকায় সার্ অ্যাল্‌ফ্রেড্ লায়াল্ "সীমান্তপ্রদেশ ও আশ্রিত রাজ্য" নামক প্রবন্ধে তাহা অনেকটা প্রকাশ করিয়াছেন।

লেথক বলেন, নিজ অধিকারের সন্নিকটে যখন প্রবল প্রতিবেশী থাকে তখন ইংরাজ মাঝখানে একটি করিয়া আশ্রিত রাজ্যের ব্যবধান রাখিয়া দেন। আশ্রিতরাজ্য স্থাপনের অর্থ

এই যে, পার্শ্ববর্ত্তী দুর্ব্বল রাজাকে বল বা কৌশলের দ্বারা ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করান'। পরস্পরের মধ্যে এইরূপ করার থাকে যে ইংরাজ তাহাকে শত্রু আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে এবং সে ইংরাজ ছাড়া অন্য কোন প্রবল রাজাকে সাহায্য করিতে পারিবে না। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজ বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন তখন মহারাষ্ট্রাদের সংঘর্ষ হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশে মাঝখানে অযোধ্যাকে আশ্রিতরাজ্যস্বরূপ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে সেই কারণেই মধ্য ভারতের রাজপুত রাজ্যসকলকে আশ্রয় দান করা হইয়াছিল। পঞ্জাব অধিকারের পূর্ব্বে শিখদিগের আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য শতদ্রুতীরে গুটিকতক ছোট ছোট পোষ্য রাজা রাখিতে হইয়াছিল। এইরূপে বাঙ্গলাদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মাঝে মাঝে এক একটা বাঁধ বাঁধিয়া ইংরাজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লইল।

ভারতের নীচের দিকে সমুদ্র ও উপরের দিকে হিমালয়ের দুই মস্ত বেড়া আছে। অতএব মনে হইতে পারে একবার ভারতের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলে আর আশ্রিত রাজ্যপাতের আবশ্যক নাই। কিন্তু ওদিকে মধ্য এসিয়া হইতে রুশিয়া ঠিক ইংরাজের কৌশল অবলম্বন করিয়া এক এক পা অগ্রসর হইতেছে। সেও খানিকটা করিয়া দখল এবং খানিকটা করিয়া সন্ধিরাজ্য স্থাপন করে। এমনি করিয়া ইংরাজ ও রুশিয়া দুই সাম্রাজ্যের সন্ধিরাজ্য অক্সস্ নদীর দুই তীরে আসিয়া ঠেকিয়াছে। রুশিয়ার পক্ষে বোখারা এবং ইংরাজের পক্ষে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান। অতএব পর্ব্বতের আড়ালে আসিয়াও রক্ষা নাই, তাহার পরপারেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। আফগানিস্থান ও

বেলুচিস্তানের সহিত যে কোনরূপ পাকাপাকি লেখাপড়া আছে তাহা নহে—কিন্তু ইংরাজ এই পর্য্যন্ত একটা সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং পারস্য ও রুশিয়ার সহিত কথা আছে তাঁহারা সে সীমা লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না।

এইরূপে স্বরাজ্য ও সন্ধিরাজ্যে মিলিয়া ইংরাজের আধিপত্য ক্রমশই বিপুল হইয়া উঠিতেছে। এতদূর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে তাঁহারা নিজেই অনেক সময় শঙ্কা পান, কিন্তু সহসা আর অধিক বাড়িবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, এতদিন পরে ইংরাজের প্রতাপ পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুই শক্ত জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। উভয় পার্শ্বেই সুনিয়ন্ত্রিত দুই বৃহৎ রাজ্যের কঠিন বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। একদিকে রুশিয়া এবং একদিকে চীন।

ভারতবর্ষের উত্তরপ্রান্তে কাশ্মীর হইতে নেপাল পর্য্যন্ত কোন সন্ধিরাজ্য স্থাপনার আবশ্যক হয় নাই। কারণ সেখানে তিনটি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক প্রহরী আছে। হিমালয়, তৎপশ্চাতে মধ্য এসিয়ার উচ্চ মালক্ষেত্র এবং তাহার উত্তর মঙ্গোলীয় মরুভূমি। কিন্তু উত্তর রাষ্ট্র হইতে নেপালের সহিত কোনপ্রকার গোলযোগ ইংরাজ সহ্য করিবেন না; এবং এক সময় তিব্বত ইংরাজাশ্রিত সিকিমের ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া বছর দুয়েক হইল তাহার সহিত ইংরাজের একটি ছোটখাট খিটিমিটি বাধিয়া উঠিয়াছিল। এদিকে পূর্ব্বাঞ্চলে বর্ম্মার অভিমুখে চীনের সংস্রব সম্বন্ধে ইংরাজকে অনেকটা সাবধান থাকিতে হয়। যখন বর্ম্মা ইংরাজের হস্তে আসে নাই তখন উহা একটি ব্যবধানস্বরূপ ছিল—এখন বর্ম্মা অধিকার করিয়া ইংরাজ চীনের অত্যন্ত নিকট প্রতিবেশী হইয়াছেন; এই জন্য সম্প্রতি ইংরাজ বর্ম্মা ও চীনের

মধ্যবর্ত্তী ক্যাম্বোডিয়ার অর্দ্ধস্বাধীন অধিনায়কগণের সহিত সন্ধিবন্ধনে উদ্যোগী হইয়াছেন।

এইরূপে হিমালয়কে তাকিয়া করিয়া দুই দিকে দুই পাশবালিশ লইয়া ইংরাজ এক মস্ত রাজ-শয্যা পাতিয়াছেন কিন্তু গদি যে আর বেশি অগ্রসর হইবে এমন সম্ভাবনা সম্প্রতি নাই।

কেবল ভারতবর্ষের আশপাশ নহে ওদিকে ভূমধ্যসাগরে জিব্রাল্টর, সাইপ্রেস্ দ্বীপ, লোহিত সমুদ্রের প্রান্তে এডেন ইংরাজ-সতর্কতার পরিচয়স্থল। এডেন ভারতসমুদ্রপথে প্রবেশ করিবার প্রথম পদনিক্ষেপস্থান। এইখানে ইংরাজ একটি দুর্গ স্থাপন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে। এডেনের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ভূখণ্ড ইংরাজের আশ্রয় স্বীকার করিয়াছে। এডেনের অনতিদূরবর্ত্তী সাকোট্রা দ্বীপ ইংরাজের আশ্রিত এবং এডেনের পূর্ব্বদিকে ওমান হইতে মস্কট্ ও পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত আর-বের সমস্ত উপকূল ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইংরা-জের জাহাজ সেখানকার সামুদ্রিক পুলিশের কাজ করে এবং আরব নায়কগণ পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে ইংরাজের মধ্যস্থতা অবলম্বন করিয়া থাকে।

ইহার উপর আবার ঈজিপ্টের প্রতি ইংরাজের দৃষ্টি। সেটা পাইলে ইংরাজের রাজপথ আরো পাকা হইয়া উঠে। কিন্তু তাহার প্রতি সমস্ত য়ুরোপের সমান টান থাকাতে ইংরাজের তেমন সুবিধা দেখিতেছি না।

যাহা হউক্, ভারতের রাজলক্ষ্মীকে নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইংরাজের দূরদর্শিতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এমন আটেঘাটে বন্ধন, এমন অন্তরে বাহিরে পাহারা,

এমন ছোট বড় সমস্ত ছিদ্রাবরোধ কোন আসিরিক চক্রবর্ত্তীর কল্পনাতেও উদয় হইতে পারিত না।

ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

বিখ্যাত রণসংবাদদাতা আর্চিবল্‌ড্‌ ফর্ব্বস্‌ কয়েক সংখ্যক নাইণ্টীন্থ্‌ সেঞ্চুরিতে অনেকগুলি রণক্ষেত্রের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছেন। ফ্রাঙ্কোপ্রুসীয় যুদ্ধের সময় জর্ম্মান সৈন্য যখন প্যারিস্‌ নগরী অবরোধ করিয়াছিল তখন অবরুদ্ধ পুরীর মধ্যে মহা অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। বিস্‌মার্ক উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন প্যারিস্‌ আপন রসে আপনি সিদ্ধ হইতেছে। ঘোড়া কুকুর খাইয়া অবশেষে ক্ষুধার জ্বালা যখন অসহ্য হইয়া উঠিল তখন প্যারিস্‌ আপনার দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। রাজপথে আলো নাই, গ্যাস নির্ম্মাণ করিবার কয়লার অভাব, হোটেলে হাঁসপাতাল, আহারের দোকান বন্ধ, বাণিজ্যের চলাচল রহিত, পথে কেবল সারি সারি মৃতদেহ-বাহক চলিয়াছে, অধিবাসীগণ ক্ষুধায় শীর্ণ এবং অনেকেই খঞ্জ ও অঙ্গহীন। যুদ্ধাবসানে দানব্রত ইংরাজ প্যারিসে অন্নছত্র স্থাপন করিল। কিন্তু মানী লোকেরা বরঞ্চ মরিতে পারে কিন্তু দানগ্রহণ করিতে পারে না। লেখক বলিতেছেন, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের এ সম্বন্ধে অভিমান অত্যন্ত প্রবল। হয় ত খবর পাওয়া গেল দুই জন স্ত্রীলোক অমুক বাসায় উপবাসে দিনযাপন করিতেছে। বার্ত্তা লইতে গেলেই তাহারা মাথা তুলিয়া খাড়া হইয়া বসে, বলে, "ইংরাজ অতিশয় দয়ালু জাতি এবং ঈশ্বর তাহাদের কল্যাণ করুন্‌।

সার্গম স্বরলিপির আকার-মাত্রিক

নূতন পদ্ধতি।

লয়-নিয়ামক চিহ্ন।

১। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আমাদের পূর্ণ মাত্রার আদর্শ অঙ্ক ১ এক। এই ১ দ্রুতভাবেও আবৃত্তি করা যাইতে পারে, বিলম্ব করিয়াও আবৃত্তি করা যাইতে পারে। সমান সমান অন্তরে, দ্রুত ভাবে এইরূপ ১-এর আবৃত্তি করা যাইতে পারে যথা—১-১-১-১-১; আবার ধীর গতিতে এইরূপ আবৃত্তি করা যাইতে পারে যথা ১——১——১——১——১। এখন কথাটা এই, যখন বলা যায় কোনও গানের প্রতি পদে ৪টি করিয়া মাত্রা আছে, তখন তাহার এক একটি মাত্রা কিরূপ গতিতে উচ্চারিত হইবে? ইহার নির্ণয় না হইলে গানের লয় স্থির হইতে পারে না। "গীতের আদ্যোপান্তে কাল-পরিমাণের নিয়ম এক-সমান রাখাকে লয় বলে" (গীতসূত্রসার); এই লয় তালিবিভাগের দ্বারা নিয়মিত হয় এবং তালিবিভাগ আবার মাত্রার দ্বারা নিয়মিত হয়—কিন্তু মাত্রার স্থায়িত্ব কিরূপে নিয়মিত হইবে? ইহা স্থির না করিতে পারিলে লয়ের নিয়ম স্থির হইতে পারে না। য়ুরোপীয় সাংকেতিক স্বর-লিপিতে "ব্রেভ্" "সেমিব্রেভ্" প্রভৃতি চিহ্নের দ্বারা মাত্রার ওজন কতকটা জানা যায় এবং মাত্রামাণ যন্ত্রের সাহায্যে মাত্রার পরিমাণ ঠিক্ জানা যাইতে পারে। কিন্তু মাত্রামাণ যন্ত্রের দ্বারা মাত্রার

পরিমাণ সকল-সময়ে নির্ণয় করিবার সুবিধা হয় না—তাছাড়া, যন্ত্রটি সংগ্রহ করাও সকলের সাধ্যায়ত্ত না হইতে পারে। এই জন্য ইহার একটি সহজ নিয়ম স্থির করা আবশ্যক। সেই সহজ নিয়মটি নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। এই নিয়মে মাত্রার আপেক্ষিক পরিমাণ কতকটা স্থির হইতে পারে। একটু এদিক্ ওদিক্ হইলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না।

১০। এক, দুই, তিন, ইত্যাদি সংখ্যাগুলি পরপর খুব তাড়াতাড়ি স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিলে এক সেকেণ্ডের মধ্যে ৬ সংখ্যা পর্য্যন্ত অধিকাংশ লোকে উচ্চারণ করিতে পারে। তাহার অধিক পারে না। ইহা আমরা পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করিয়াছি। এই গতিতে ৬ সংখ্যা অন্তর করতালি দিলে ঈষৎ বিলম্ব গতি হইতেছে বলিয়া উপলব্ধি হয়। ৫ সংখ্যা অন্তর করতালি দিলে মধ্যগতি অর্থাৎ সহজ লয় হইতেছে বলিয়া উপলব্ধি হয়। এইরূপ গণনা অনুসারে লয়ের যে আদর্শ-ক্রম স্থির হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

গতিক্রম।	দ্রুত উচ্চারণের সংখ্যা।	মাত্রামাণ-যন্ত্রের অঙ্ক।	মানাঙ্ক-সঙ্কেত।
১। বিলম্ব।	= ৮ ……	… ৫০ …	… ।৮
২। ঈষৎ-বিলম্ব।	= ৬ (১সেকেণ্ড)	… ৬০ …	… ।৬
৩। মধ্যলয়।	= ৫ ……	… ৮০ …	… ।৫
৪। ঈষৎদ্রুত।	= ৪ ……	… ১০০ …	… ।৪
৫। ঈষৎ-দ্রুততর।	= ৩ ……	… ১৩২ …	… ।৩
৬। দ্রুত।	= ২ ……	… ১৬০ …	… ।২
৭। অতিদ্রুত।	= ১ ……	… ২০০ …	… ।১

মাত্রাঙ্ক, মানাঙ্ক, তালাঙ্ক প্রভৃতির চিহ্ন।

১১। পদ-মধ্যগত মাত্রার সংখ্যা-ভেদে তাল-ভেদ হয়; এবং তাল-বিশেষের মাত্রা-সমষ্টি সমান হইলেও, গানের কথার লঘু-গুরু-ভেদে ও পদ-মধ্যবর্ত্তী সুরের প্রস্বন-(ঝোঁক্) ভেদে তাল-বিশেষের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। এই সকল তালের মধ্যে কতকগুলি চতুর্মাত্রিক যথা—কাওয়ালি, ঠুংরি, আড়াঠেকা ইত্যাদি। কতকগুলি ত্রিমাত্রিক যথা—একতালা, খেম্‌টা, আড়-খেম্‌টা ইত্যাদি। আর কতকগুলি বিষম-পদী যথা—ঝাঁপতাল, যৎ, পোস্তা ইত্যাদি। কাওয়ালির ছন্দ ও লয়ভেদে ঠুংরি, আড়াঠেকা প্রভৃতি উৎপন্ন এবং একতালার ছন্দ ও লয়ভেদে খেম্‌টা, আড়খেম্‌টা প্রভৃতি তাল উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল তালের সাঙ্কেতিক প্রতিরূপ থাকিলে অনেক সময় সুবিধা হয়। নাট্য-গীতিতে ঘন ঘন তাল ও লয়ের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ইহা সহজে ও সংক্ষেপে জ্ঞাপন করিবার জন্য সাঙ্কেতিক চিহ্নের আবশ্যক। তাই, আমরা প্রতি গানের আরম্ভে তালের সাঙ্কেতিক চিহ্ন এই প্রকারে ব্যবহার করিব যথা; প্রথমতঃ, কোন গানের প্রতি পদে যতটি করিয়া মাত্রা আছে তাহার অঙ্ক অর্থাৎ মাত্রাঙ্ক একটা বড় । কারের বামপার্শ্বের উপর দিকে ছোট অক্ষরে লেখা যাইবে যথা ৪।; তাহার পর, প্রতি মাত্রার স্থায়িত্ব নির্ণয় করিয়া তাহার অঙ্ক অর্থাৎ মানাঙ্ক, আকার-টির দক্ষিণ পার্শ্বে এইরূপ ভাবে লিখিত হইবে যথা ।২; এই মাত্রাঙ্ক ও মানাঙ্ক উভয়ে মিলিয়াই তালাঙ্ক গঠিত। যথা, ৪।২; প্রতি গানের স্বর-

লিপির আরম্ভেই তালাঙ্ক লিখিত থাকিবে। এই যে তালাঙ্কটি ৪|২ ইহা কাওয়ালি-ছন্দের অনুরূপ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মাত্রার লঘুগুরুতা ও প্রস্বনভেদে তাল-বিশেষের প্রকার-ভেদ হইয়া থাকে, তাহা জ্ঞাপনার্থ চিহ্নের প্রয়োজন। ঠুংরির সহিত কাওয়ালির প্রভেদ এই যে, ঠুংরির প্রতি পদের মধ্যে নিয়মিত অন্তরে গুরু মাত্রা আসায় কাওয়ালি অপেক্ষা প্রস্বনাধিক্য হইয়া থাকে; তাই প্রস্বনের চিহ্নস্বরূপ এই ৪|২ তালাঙ্কের আকারের উপর একটি রেফ্-চিহ্ন বসিবে; তাহা হইলে এইরূপ হয় ৪|র্২; ইহাই ঠুংরি-ছন্দের প্রতিরূপ। আবার আড়া-ঠেকার সহিত কাওয়ালির প্রভেদ এই যে, কাওয়ালির ন্যায় আড়া-ঠেকার পদ চতুর্মাত্রায় বিভক্ত হইলেও আড়া-ঠেকাতে গানের কথাগুলি টানিয়া টানিয়া গাহিতে হয়—সুতরাং স্বাভাবিক প্রস্বনের স্থান অতিক্রান্ত হওয়ায় অপ্রস্বনিত ধ্বনির উপর তালি দিতে হয়—এই টান অর্থাৎ আড়ের চিহ্ন-স্বরূপ একটি কসি তালাঙ্কের া-কারের উপর বসাইলে আড়া-ঠেকা ছন্দের প্রতিরূপ প্রকাশ করা হয়। যথা ৪|২। তাল-বিশেষের সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশ করিতে হইলে উপরে যাহা বলা হইল তাহা ছাড়া আরও কিছু প্রয়োজন। তাহা কি—নিম্নে বলা যাইতেছে।

১২। সচরাচর চারিটি তালি-বিভাগে তাল-বিশেষের একটি ফের—কি না, পূর্ণ-আবৃত্তি হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক তালের ফেরে তিনটি করিয়া তালি ও একটি ফাঁক্ থাকে। (সুবিধার জন্য কখন কখন তালি ও ফাঁকের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে।) এই তিন কালের মধ্যে একটির উপর একটু বিশেষ ঝোঁক্ দিয়া তালি দেওয়া হয়—ইহাকে সমের ঘর বলে। ইহা বিশ্রামেরও স্থান। এবং

তালি-স্থান সত্বেও যেখানে তালি না দেওয়া হয়, সেইটি ফাঁকের ঘর। তালের একটি ফের কি গতিকে নিষ্পন্ন হয় তাহা স্পষ্টরূপে দেখাইবার জন্যই সম ও ফাঁকের সৃষ্টি। বরাবর সমান তালি দিয়া গেলে তালের ফের শেষ হইল কি না সহজে উপলব্ধি হয় না। তাই, তিন তালির এক তালিকে সম বলিয়া ধরিয়া তাহারই উপর একটু বেশি ঝোঁক দিয়া গায়ককে সতর্ক করা হয়। তাল-বিশেষের রীতিমত নিয়মে গান গাহিতে হইলে যে তালিতে গানের উত্থান হয় সেইখানে আবার ফিরিয়া আসিতেই হইবে। এই জন্য তালবিশেষের পূর্ণ রূপ দেখাইতে হইলে তাহার তাল ফাঁকের বন্দোবস্তটিও লেখা আবশ্যক। এই জন্য কাওয়ালি তালের পূর্ণ রূপের সঙ্কেত প্রকাশ করিতে হইলে তালি ও ফাঁকের অঙ্কগুলি তালাঙ্কের নিম্নে দেওয়া চাই। যথা :— ৩।২
।০।১।২´।৩।

এই তালাঙ্কে তালির অঙ্ক যেরূপ অনুক্রমে থাকিবে গানের পদেও সেইরূপ অনুক্রম আছে বলিয়া জানিবে।

ফাঁকের চিহ্ন = ০। তালবিশেষে যে তালিটি সম তাহার অঙ্কের উপর একটি রেফ্ চিহ্ন বসিবে। যথা ২´।

(ক) যে সকল গান তাল বিশেষের কেবল ছন্দ অনুসারেই গাওয়া হয়, যাহাতে তালের পূর্ণ ফের রক্ষা করা হয় না, সেই সকল গানের তালাঙ্কে তালি ফাঁকের অঙ্ক দেওয়া হইবে না। গানবিশেষের রসানুরোধে কখন কখন তালের ফের পূর্ণ করা হয় না। অর্থাৎ গানের কলির শেষাশেষি চারি পদের কম থাকিয়া যায়। এক্ষণে আমাদের দেশে নাট্যসঙ্গীতের চর্চা আরম্ভ হইয়াছে। সম ফাঁকের বাঁধাবাধি নিয়ম রাখিলে অনেক

সময়ে রসের ব্যতিক্রম ঘটে কিম্বা রসের পূর্ণ বিকাশ হয় না। "সমে"র সময়ে সকলে একত্রে ঘাড় নাড়িয়া যে সুখ পাওয়া যায় সেই সুখ হইতে এইরূপ প্রণালী অবলম্বনে বঞ্চিত হইতে হয় বটে, কিন্তু ঐরূপ সুখ যে রসাত্মক সুখ অপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহা কে না স্বীকার করিবেন? উচ্চতর সুখের খাতিরে নিকৃষ্ট সুখকে অনায়াসেই বিসর্জ্জন করা যাইতে পারে। এখন গানের রসের প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা একটি উন্নতির লক্ষণ। গীতি-নাট্যের যত চর্চ্চা ও উন্নতি হইবে, সেই সঙ্গে আমাদের সাধারণ সঙ্গীতেরও উন্নতি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নাট্য-গীতিতে সুরের সহিত ভাবের ঐক্য রাখিবার জন্য অনেক মিশ্র রাগ ব্যবহার করিতে হয়—এবং রসানুরোধে ঘন ঘন তাল ও লয়ের পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়। এই হেতু এক্ষণে তাল মান লয় সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার জন্য তালাঙ্কের সঙ্কেত ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাল-রূপের সঙ্কেত-তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

১৩।

তালের সঙ্কেত।

নাম			সঙ্কেত।
(১) কাওয়ালি।	(চতুর্ম্মাত্রিক)	=	৪।২ ২́।৩।০।১।
(২) ঢিমা তেতালা।	(ঐ)	=	৪।৫ ।২́।৩।০।১।
(৩) ঠুংরী।	(ঐ)	=	৪।́২ ।১́।২।

(৪) ছেপকা।	(ঐ)	=	৪।১ ।১।২।
(৫) কাহারবা।	(ঐ)	=	৪।১ ।১।২।
(৬) আড়াঠেকা।	(ঐ)	=	৪।২ ।১।২।৩।০।
(৭) মধ্যমান।	(ঐ)	=	৪।৫ ।১।২।৩।০।
(৮) খেমটা।	(ত্রিমাত্রিক)	=	৩।১ ।২।৩।০।১।
(৯) আড়খেমটা।	(ঐ)	=	৩।২ ।০।১।২।৩
(১০) একতালা।	(ঐ)	=	৩।২ ।২।৩।০।১।
(১১) চৌতাল।	(ঐ)	=	২।৬ ।১।০।২।০।৩।৪।
(১২) ঝাঁপতাল।	(বিষমপদী)	=	২—৩।৩ ।২।৩।০।১।
(১৩) সুরফাঁকতাল।	(ঐ)	=	৪—২—৪।৫ ।১।০।২।৩।০।
(১৪) যৎ।	(ঐ)	=	৬—৪।২ ।২।৩।০।১।
(১৫) ধামার।	(ঐ)	=	৫—৫—৪।৫ ।১।২।৩।
(১৬) পোস্তা।	(ঐ)	=	৩—৪।১ ১—২
(১৭) তেওট।	(ঐ)	=	৪—৩।২ ।১।২।৩।০।

১৮৮ পৃঃ পড় দেখ

(১৮) রূপক। (ঐ) — ২—২—৩|২
|১´।২।০।

(১৯) আড়াচৌতাল। (ঐ) — ২—৪—৪—৪|২
|১´।২।৩।৪।

(২০) তেওরা। (ঐ) — ২—২—৩|২
২—২—৩
|১।২।৩´।১।২।০।

(২১) পঞ্চম-সওয়ারী। (ঐ) — ৩—৩—৪—৪—৪—৪—৪—৪|২
|১।২।৩´।০।৪।০।৫।০।

মায়ার খেলা।

গীতিনাট্য।

প্রথম দৃশ্যে মায়াকুমারীগণের আবির্ভাব। মায়াকুমারীগণ কুহকশক্তিপ্রভাবে মানবহৃদয়ে নানাবিধ মায়া সৃজন করে। হাসি, কান্না, মিলন, বিরহ, বাসনা, লজ্জা, প্রেমের মোহ এ সমস্ত মায়াকুমারীদের ঘটনা। একদিন নব বসন্তের রাত্রে তাহারা স্থির করিল প্রমোদপুরের যুবক যুবতীদের নবীন হৃদয়ে নবীন প্রেম রচনা করিয়া তাহারা মায়ার খেলা খেলিবে।

প্রথম দৃশ্য।

কানন।

মায়াকুমারীগণ।

(মোরা) জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি।
(মোরা) স্বপন রচনা করি
অলস নয়ন ভরি।
গোপনে হৃদয়ে পশি কুহক-আসন পাতি।

হুলস্থূল বাধাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সে সময়ে আরব সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল তাহাই যথাসম্ভব সংযত করিতে তিনি মনোনিবেশ করিলেন। পূর্ব্বে বহুবিবাহ, দাসী-সংসর্গ ও যথেচ্ছা স্ত্রীপরিত্যাগের কোন বাধা ছিল না তিনি তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া স্ত্রীলোককে অপেক্ষাকৃত মান্য-পদবাতে আরোপন করিলেন। তিনি বার বার বলিয়াছেন স্ত্রী-বর্জ্জন ঈশ্বরের চক্ষে নিতান্ত অপ্রিয় কার্য্য। কিন্তু এ প্রথা সমূলে উৎপাটিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এই জন্য তিনি স্ত্রীবর্জ্জন একেবারে নিষেধ না করিয়া অনেকগুলি গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিলেন।

লেখক বলেন স্ত্রীলোকের অধিকার সম্বন্ধে খৃষ্টীয় আইন অপেক্ষা মুসলমান আইনে অনেক উদারতা প্রকাশ পায়। হিন্দু শাস্ত্রে যেমন বিশেষ বিশেষ কারণে স্বামীত্যাগের বিধি আছে কিন্তু হিন্দু সমাজে তাহার কোন চিহ্ন নাই, সেইরূপ, লেখক বলেন মুসলমান শাস্ত্রেও অত্যাচার, ভরণপোষণের অক্ষ-মতা প্রভৃতি কারণে স্ত্রীর স্বামীত্যাগের অধিকার আছে।

আমরা যেরূপ লালাবতী ও খণার দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা উল্লেখ করিয়া থাকি, লেখক সেইরূপ প্রাচীন কালের মুসলমান বিদুষীদের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া তৎকালীন আরব রমণীদের উন্নত অবস্থা প্রমাণ করিয়াছেন।

যাহা হউক্ মান্যবর আমীর আলি মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে, কোন কোন বিষয়ে মুসলমানদের প্রাচীন সামাজিক আদর্শ উচ্চতর ছিল এবং মহম্মদ যে সকল সংস্কার-কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহাকেই তিনি চূড়ান্ত স্থির করেন নাই। মধ্যস্থ

হইয়া তখনকার প্রবল সমাজের সহিত উপস্থিতমত রফা করিয়াছিলেন। কতকগুলি পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া সমাজকে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তবু সমাজ সেইখানেই থামিয়া রহিল। কিন্তু সে দোষ মুসলমান ধর্ম্মের নহে, সে কেবল জ্ঞান বিদ্যা সভ্যতার অভাব।

আমির আলি মহাশয়ের এই রচনা পাঠ করিয়া মনের মধ্যে একটা বিষাদের উদয় হয়। এককালে আদর্শ উচ্চতর ছিল ক্রমশঃ তাহা বিকৃত হইয়া আসিয়াছে এবং এককালে কোন মহাপুরুষ তৎসময়ের উপযোগী যে সকল বিধান প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, বুদ্ধিচালনাপূর্ব্বক সচেতনভাবে সমাজ তাহার অধিক আর এক পা অগ্রসর হয় নাই, একথা বর্ত্তমান মুসলমানেরাও বলিতেছেন এবং বর্ত্তমান হিন্দুরাও বলিতেছেন। গৌরব করিবার বেলাও এই কথা বলি বিলাপ করিবার বেলাও এই কথা বলি। যেন আমাদের এসিয়ার মজ্জার মধ্যে সেই প্রাণক্রিয়ার শক্তি নাই যাহার দ্বারা সমাজ বাড়িয়া উঠে, যাহার অবিশ্রাম গতিতে সমাজ পুরাতন ত্যাগ ও নূতন গ্রহণ করিয়া প্রতিনিয়তই আপনাকে সংস্কৃত করিয়া অগ্রসর হইতে পারে।

য়ুরোপে এসিয়ায় প্রধান প্রভেদ এই যে, য়ুরোপে মনুষ্যের একটা গৌরব আছে এসিয়াতে তাহা নাই। এই হেতু এসিয়ার বড় লোককে মহৎ মনুষ্য বলে না একেবারে দেবতা বলিয়া বসে কিন্তু য়ুরোপের কর্ম্মপ্রধান দেশে প্রতিদিনই মনুষ্য নানা আকারে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে, সেই জন্য তাহারা আপনাকে নগণ্য, জীবনকে স্বপ্ন এবং জগৎকে মায়া মনে করিতে পারে না। প্রাচ্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাবে য়ুরোপীয়দের মনে মধ্যে মধ্যে

চীন এবং জাপানের সর্ব্বোচ্চ কন্সুলার কোর্টের প্রধান জজ্ ছিলেন। তিনি নিজের জীবনের একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি মকদ্দমার যে রায় লিখিতেন সন্ধ্যার সময় খবরের কাগজের সংবাদদাতারা আসিয়া সেই রায় চাহিয়া লইয়া যাইত এবং পরদিনের সংবাদপত্রে প্রকাশ করিত। একদিন এইরূপ রায় লিখিয়া তাঁহার খানসামার কাছে রাখিয়া দিয়াছিলেন; কথা ছিল যখন সংবাদদাতা আসিবে ভৃত্য এই রায় তাহার হস্তে দিবে। জজসাহেব রাত্রে নিদ্রিত আছেন এমন সময় শয়নগৃহের দ্বারে আঘাত শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। বুঝিলেন কেহ গৃহে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষা করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি প্রবেশ করিবার আদেশ করিলে সেই খবরের কাগজের সংবাদদাতা গম্ভীরভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার রায় প্রার্থনা করিল। শয়নগৃহে তাহার এরূপ অনধিকার প্রবেশে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া হর্ণ্বি তাহাকে খানসামার নিকট হইতে রায় চাহিয়া লইতে আদেশ করিলেন, কিন্তু তথাপি সে পুনঃ পুনঃ পূর্ব্বমত প্রার্থনা করিতে লাগিল। কতকবা তাহার অনুনয়ে বিচলিত হইয়া কতক বা নিজপত্নী লেডি হর্ণ্বির জাগরণ আশঙ্কায় তিনি আর কিছু না করিয়া সংক্ষেপে তাঁহার লিখিত রায়ের মর্ম্ম মুখে মুখে বলিয়া গেলেন, সে তাহা লিখিয়া লইল এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেল। তখন রাত্রি দেড়টা। অনতিবিলম্বে লেডি হর্ণ্বি জাগ্রত হইলে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিলেন। পরদিন জজসাহেব আদালতে গেলে সংবাদ পাইলেন যে, সেই সংবাদদাতা পূর্ব্বরাত্রে একটা হইতে দেড়টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং

সে রাত্রে সে গৃহত্যাগ করে নাই। ইন্‌কোয়েষ্ট পরীক্ষায় হৃদ্‌রোগই তাহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া স্থির হইয়াছে।

এই গল্পটি যখন নাইণ্টীন্থ্‌ সেঞ্চুরি পত্রিকায় প্রকাশিত হইল তখন সাধারণের মনে অত্যন্ত বিস্ময় উদ্রেক করিল। বিশেষতঃ হর্ণবি সাহেব একটি বড় আদালতের বড় জজ্‌—প্রমাণের সত্যমিথ্যা সূক্ষ্মভাবে অবধারণ করাই তাঁহার কাজ। এবং তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তিনি পুরুষানুক্রমে আইনব্যবসায়ী, কল্পনা-শক্তিপরিশূন্য, এবং অলৌকিক ঘটনার প্রতি বিশ্বাসবিহীন।

এই ঘটনা কাগজে প্রকাশ হইবার চারিমাস পরে "নর্থ চাইনা হেরাল্ডে"র সম্পাদক ব্যাল্‌ফোর্‌ সাহেব নাইণ্টীন্থ্‌ সেঞ্চুরিতে নিম্নলিখিতমত প্রতিবাদ করেন।

১। হর্ণ্‌বি সাহেব বলেন বর্ণিত ঘটনাকালে লেডি হর্ণ্‌বি তাঁহার সহিত একত্রে ছিলেন। কিন্তু সে সময়ে লেডি হর্ণ্‌বি নামক কোন ব্যক্তিই ছিলেন না। কারণ হর্ণ্‌বি সাহেবেব প্রথম স্ত্রী উক্ত ঘটনার দুইবৎসর পূর্ব্বে গত হন এবং ঘটনার চারিমাস পরে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীকে বিবাহ করেন।

২। হর্ণ্‌বি সাহেব ইন্‌কোয়েষ্টের দ্বারা মৃতদেহ পরীক্ষার উল্লেখ করেন, কিন্তু স্বয়ং পরীক্ষক "করোনার" সাহেবের নিকট সন্ধান লইয়া জানিলাম, উক্ত মৃতদেহ সম্বন্ধে ইন্‌কোয়েষ্ট বসে নাই।

৩। হর্ণ্‌বি সাহেব ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি তাঁহার রায় প্রকাশের দিন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু আদালতের গেজেটে সে দিনে কোন রায় প্রকাশিত হয় নাই।

৪। হর্ণ্‌বি বলেন, সংবাদদাতা রাত্রি একটার সময় মরে।

এ কথা অসত্য। প্রাতঃকালে ৮:৯ ঘটিকার সময় তাহার প্রাণত্যাগ হয়।

ব্যাল্‌ফোর সাহেবের এই প্রতিবাদের বিরুদ্ধে সার্ হর্ণ্‌বি কিছু বলিতে পারিলেন না, সব কথা একপ্রকার মানিয়া লইতে হইল।

ইহার পর অলৌকিক ঘটনার প্রামাণ্য সাক্ষ্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

মানবশরীর। যাঁহারা সাধনায় প্রকাশিত "প্রাণ ও প্রাণী" প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা পূর্ব্বেই আভাস পাইয়াছেন যে, প্রাণীশরীর অণুপরিমাণ জীবকোষের সমষ্টি। এ কথা ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন আমাদের শরীরের যে যে অংশে জীবনের প্রবাহ আছে সমস্তই প্রটোপ্ল্যাস্ম্‌ নামক পঙ্কবৎ পদার্থে নির্ম্মিত। কেবল মানবশরীর নহে উদ্ভিদ্‌ প্রভৃতি যে কোন জীবিত পদার্থ আছে প্রটোপ্ল্যাস্ম্‌ ব্যতীত আর কোন পদার্থেই জীবনীশক্তি নাই।

মানবশরীর অণুবীক্ষণযোগে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এই প্রটোপ্ল্যাস্ম্‌ অতি ক্ষুদ্র কোষ আকারে বদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছে। কোথাও কোথাও তন্তু আকার ধারণ করিয়া আমাদের মাংসপেশী ও স্নায়ু রচনা করিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কোষগুলিই আমাদের শরীরের জীবনপূর্ণ কর্ম্মশীল উপাদান।

কণামাত্র প্রটোপ্ল্যাস্ম্‌ নামক প্রাণপদার্থ সূক্ষ্ম আবরণে বদ্ধ হইয়া এক একটি কোষ নির্ম্মাণ করে। প্রত্যেক প্রাণকোষের

কেন্দ্রস্থলে একটি করিয়া ঘনীভূত বিন্দু আছে। এই কোষগুলি এত ক্ষুদ্র যে তাহার ধারণা করা অসম্ভব।

এই কোষগুলিই আমাদের শরীরের কর্ম্মকর্তা, আমাদের প্রাণরাজ্যের প্রজা। ইহারাই আমাদের অস্থি নির্ম্মাণ করিতেছে, শরীরের আবর্জ্জনা বাহির করিয়া দিতেছে, মাংসপেশীরূপে পরিণত হইতেছে। স্নায়ুকোষগুলি শরীরের রাজস্থানীয়। তাহারাই শরীরের রাজ্যরক্ষা আইনজারি প্রভৃতি বড় বড় কাজে নিযুক্ত।

ইহাদের মধ্যে কার্য্যের ভাগ আছে। পাকযন্ত্রের পাচক রস নিঃসারণ হইতে অস্থি নির্ম্মাণ পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দলের উপর বিলি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একদল অন্যদলের কার্য্যে তিলমাত্র হস্তক্ষেপ করে না। তাহাদের অধিকাংশ কার্য্যই প্রায় স্বাধীনভাবে নির্ব্বাহিত হয়। যদিও তাহারা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকে কর্ত্তৃপক্ষীয় বলিয়া স্বীকার করে।

আমাদের শরীরের কাজ যে কত অসংখ্য এবং কোষের দল সেই সমস্ত কাজ কত শৃঙ্খলাপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিতেছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কেহ বা জিহ্বাতলে লালা যোগাইতেছে, কেহ বা বাষ্প সৃজন করিয়া চক্ষুতারকাকে সরস করিয়া রাখিতেছে, কেহ বা পাকস্থলীতে রস নির্ম্মাণ করিতেছে—আরো কতক সহস্র কাজ আছে। যকৃৎ যে সকল জীব-কোষে নির্ম্মিত তাহারা কেবল যকৃতেরই সহস্র কাজ করিয়া থাকে, আর কিছুই করে না, প্রত্যেক প্রত্যঙ্গবর্ত্তী কোষের এইরূপ কার্য্যনিয়ম। মস্তিষ্ক যে সকল কোষে নির্ম্মিত তাহারা শরীরের সর্ব্বোচ্চ মণ্ডপে বসিয়া অবিশ্রাম রাজকার্য্যে নিযুক্ত।

ছিল জানিনা এবং চন্দ্রনাথ বাবুও নবশিক্ষিতদের নিকটে তাহা গোপন করিয়াই গেছেন কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় প্রমাণ করিয়াছেন প্রাচীন ভারতের আহার্য্যের মধ্যে মাংসের চলন না ছিল এমন নহে।

এক সময়ে ব্রাহ্মণেরা আমিষ ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্মণের দ্বারা কোন সমাজ রচিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষে কেবল বিংশতি কোটি অধ্যাপক পুরোহিত এবং তপস্বীর প্রাদুর্ভাব হইলে অতি সত্বরই সেই সুপবিত্র জনসংখ্যার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। প্রাচীন ভারতবর্ষে ধ্যানশীল ব্রাহ্মণও ছিল এবং কর্ম্মশীল ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রও ছিল, মগজও ছিল মাংসপেশীও ছিল, সুতরাং স্বাভাবিক আবশ্যক অনুসারে আমিষও ছিল, নিরামিষও ছিল, আচারের সংযমও ছিল আচারের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতাও ছিল। যখন সমাজে ক্ষত্রিয়তেজ ছিল তখনই ব্রাহ্মণের সাত্বিকতা উজ্জ্বলভাবে শোভা পাইত। শক্তি থাকিলে যেমন ক্ষমা শোভা পায়, সেইরূপ। অবশেষে সমাজ যখন আপনার যৌবন তেজ হারাইয়া আগাগোড়া সকলে মিলিয়া সাত্বিক সাজিতে বসিল, কর্ম্মনিষ্ঠ সকল বর্ণ ব্রাহ্মণের সহিত লিপ্ত হইয়া লুপ্ত হইয়া গেল, এই বৃহৎ ভূভাগে কেবল ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের পদানুবর্ত্তী একটা ছায়ামাত্র অবশিষ্ট রহিল তখনি প্রাচীন ভারতবর্ষের বিনাশ হইল। তখন নিস্তেজতাই আধ্যাত্মিকতার অনুকরণ করিয়া অতি সহজে যন্ত্রাচারী এবং কর্ম্মক্ষেত্রের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া উঠিল। ভীরুর ধৈর্য্য আপনাকে মহত্তের ধৈর্য্য বলিয়া পরিচয় দিল, নিশ্চেষ্টতা বৈরাগ্যের ভেক ধারণ করিল এবং দুর্ভাগা অক্ষম ভারতবর্ষ ব্রহ্মণ্যহীন ব্রাহ্মণের গরুটি

হইয়া তাঁহারি ঘানিগাছের চতুর্দ্দিকে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিয়া পবিত্র চরণতলের তৈল যোগাইতে লাগিল। এমন সংযম, এমন বদ্ধ নিয়ম, এমন নিরামিষ সাত্ত্বিকতার দৃষ্টান্ত কোথায় পাওয়া যাইবে! আজকাল চোখের ঠুলি খুলিয়া অনেকে ঘানি প্রদক্ষিণের পবিত্র নিগূঢ়তত্ত্ব ভুলিয়া যাইতেছে। কি আক্ষেপের বিষয়!

এক হিসাবে শঙ্করাচার্য্যের আধুনিক ভারতবর্ষকেই প্রাচীন ভারতবর্ষ বলা যাইতে পারে, কারণ, ভারতবর্ষ তখন এমনি জরা-গ্রস্ত হইয়াছে যে, তাহার জীবনের লক্ষণ আর বড় নাই। সেই মৃতপ্রায় সমাজকে শুভ্র আধ্যাত্মিক বিশেষণে সজ্জিত করিয়া তাহাকেই আমাদের আদর্শস্থল বলিয়া প্রচার করিতেছি, তাহার কারণ, আমাদের সহিত তাহার তেমন অনৈক্য নাই। কিন্তু মহাভারতের মহাভারতবর্ষকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে প্রচণ্ড বীর্য্য বিপুল উদ্যমের আবশ্যক তাহা কেবলমাত্র নিরা-মিষ ও সাত্ত্বিক নহে, অর্থাৎ কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের আবাদ করিলে সে ভারতবর্ষ উৎপন্ন হইবে না।

আহারের সহিত আত্মার যোগ আর কোন দেশ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিল কিনা জানিনা কিন্তু প্রাচীন যুরোপের যাজক-সম্প্রদায়ের মধ্যেও আহার ব্যবহার এবং জীবনযাত্রা কঠিন নিয়-মের দ্বারা সংযত ছিল। কিন্তু সেই উপবাসকৃশ যাজকসম্প্রদায়ই কি প্রাচীন যুরোপ! তখনকার যুরোপীয় ক্ষত্রিয়মণ্ডলীও কি ছিল না! এইরূপ বিপরীত শক্তির ঐক্যই কি সমাজের প্রকৃত জীবন নহে!

কোন বিশেষ আহারে আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পায় বলিতে কি বুঝায়?—মনুষ্যের মধ্যে যে একটি কর্তৃশক্তি আছে, যে শক্তি

স্থায়ী সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষণিক সুখ বিসর্জ্জন করে, ভবিষ্যৎকে উপলব্ধি করিয়া বর্ত্তমানকে চালিত করে, সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ আমাদের যে সকল প্রবৃত্তি আছে প্রভুর ন্যায় তাহাদিগকে যথাপথে নিয়োগ করে, তাহাকেই যদি আধ্যাত্মিক শক্তি বলে তবে স্বল্পাহারে বা বিশেষ আহারে সেই শক্তি বৃদ্ধি হয় কি করিয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাক্।

খাদ্যরসের সহিত আত্মার যোগ কোথায়, এবং আহারের অন্তর্গত কোন্ কোন্ উপাদান বিশেষরূপে আধ্যাত্মিক, বিজ্ঞানে তাহা এ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। যদি তৎসম্বন্ধে কোন রহস্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের গোচর হইয়া থাকে, তবে অক্ষম গুরু পুরোহিতের প্রতি ভারার্পণ না করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু নিজে তাহা প্রকাশ করিলে আজিকার এই নব্য পাশবাচারের দিনে বিশেষ উপকারে আসিত।

একথা সত্য বটে স্বল্পাহার এবং অনাহার প্রবৃত্তিনাশের একটি উপায়। সকল প্রকার নিবৃত্তির এমন সরল পথ আর নাই। কিন্তু প্রবৃত্তিকে বিনাশ করার নামই যে আধ্যাত্মিক শক্তির বৃদ্ধিসাধন তাহা নহে।

মনে কর প্রভুর নিয়োগক্রমে লোকাকীর্ণ রাজপথে আমাকে চার ঘোড়ার গাড়ি হাঁকাইয়া চলিতে হয়। কাজটা খুব শক্ত হইতে পারে কিন্তু ঘোড়াগুলার দানাবন্ধ করিয়া তাহাদিগকে আধমরা করিয়া রাখিলে কেবল ঘোড়ার চলৎশক্তি কমিবে কিন্তু তাহাতে যে আমার সারথ্যশক্তি বাড়িবে এমন কেহ বলিতে পারে না। ঘোড়াকে যদি তোমার শত্রুই স্থির করিয়া থাক তবে রথযাত্রাটা একেবারে বন্ধই রাখিতে হয়। প্রবৃত্তিকে যদি

রিপু জ্ঞান করিয়া থাক তবে শক্রহীন হইতে গেলে আত্মহত্যা করা আবশ্যক, কিন্তু তদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি বাড়ে কি না তাহার প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য।

গীতায় "শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মকে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠপথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন" তাহার কারণ কি? তাহার কারণ এই যে, কর্ম্মেই মনুষ্যের কর্ত্তৃশক্তি বা আধ্যাত্মিকতার বলবৃদ্ধি হয়। কর্ম্মেই মনুষ্যের সমুদয় প্রবৃত্তি পরিচালনা করিতে হয় এবং সংযত করিতেও হয়। কর্ম্ম যতই বিচিত্র, বৃহৎ এবং প্রবল, আত্মনিয়োগ এবং আত্মসংযমের চর্চ্চা ততই অধিক। এঞ্জিনের পক্ষে বাষ্প যেমন, কর্ম্মানুষ্ঠানের পক্ষে প্রবৃত্তি সেইরূপ। এঞ্জিনে যেমন একদিকে ক্রমাগত কয়লার খোরাক দিয়া আগ্নেয় শক্তি উত্তেজিত করিয়া তোলা হইতেছে আর একদিকে তেমনি দুর্ভেদ্য লৌহবল তাহাকে গ্রহণ ও ধারণ করিয়া স্বকার্য্যে নিয়োগ করিতেছে, মনুষ্যের জীবনযাত্রাও সেইরূপ। সমস্ত আগুন নিবাইয়া দিয়া সাত্বিক ঠাণ্ডা জলের মধ্যে শীতকালের সরীসৃপের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকাকেই যদি মুক্তির উপায় বল তবে সে এক স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সে উপদেশ নহে। প্রবৃত্তির সাহায্যে কর্ম্মের সাধন এবং কর্ম্মের দ্বারা প্রবৃত্তির দমনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অর্থাৎ মনোজ শক্তিকে নানা শক্তিতে রূপান্তরিত ও বিভক্ত করিয়া চালনা করার দ্বারাই কর্ম্মসাধন এবং আত্মকর্ত্তৃত্ব উভয়েরই চর্চ্চা হয়—খোরাক বন্ধ করিয়া প্রবৃত্তির শ্বাসরোধ করা আধ্যাত্মিক আলস্যের একটা কৌশল মাত্র।

তবে এমন কথা উঠিতে পারে যে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে জীবমাত্রেরই আহারের প্রতি একটা আকর্ষণ আছে; যদি মধ্যে

মধ্যে এক এক দিন আহার রহিত করিয়া অথবা প্রত্যহ আহার হ্রাস করিয়া সেই আকর্ষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায় তবে তদ্দ্বারা আত্মশক্তির চালনা হইয়া আধ্যাত্মিক বললাভ হয়। এ সম্বন্ধে কথা এই যে, মাঝিগিরিই যাহার নিয়ত ব্যবসায়, সখের দাঁড় টানিয়া শরীর চালনা তাহার পক্ষে নিতান্তই বাহুল্য। সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক কাজে প্রতিদিনই এত সংযম চর্চ্চার আবশ্যক এবং অবসর আছে যে সখের সংযম বাহুল্য মাত্র। এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাঁহারা জপ তপ উপবাস ব্রতচারণে নানাপ্রকার সংযম পালন করেন কিন্তু সাংসারিক বৈষয়িক বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র সংযম নাই। সখের সংযমের প্রধান আশঙ্কাই তাই। লোকে মনে করে যখন সংযম-চর্চ্চার স্বতন্ত্র ক্ষেত্র কঠিনরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তখন কর্ম্মক্ষেত্রে ঢিলা দিলেও চলে। অনেক সময় ইহার ফল হয়, খেলায় সংযম এবং কাজে স্বেচ্ছাচারিতা, মুখে জপ এবং অন্তরে কুচক্রান্ত, ব্রাহ্মণকে দান এবং ব্যবসায়ে প্রতারণা, গঙ্গাস্নানের নিষ্ঠা এবং চরিত্রের অপবিত্রতা।

যাহা হউক্, কর্ম্মানুষ্ঠানকেই যদি মনুষ্যের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ বল, এবং কেবল ঘরসংসার করাকেই একমাত্র কর্ম্ম না বল, যদি ঘরের বাহিরেও সুবৃহৎ সংসার থাকে এবং সংসারের বৃহৎ কার্য্যও যদি আমাদের মহৎ কর্ত্তব্য হয় তবে শরীরকে নিকৃষ্ট ও অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিলে চলিবে না; তবে শারীরিক বল ও শারীরিক উদ্যমকে আধ্যাত্মিকতার অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

তাহা হইলে বিচার্য্য এই যে, শরীরের বলসাধনের পক্ষে

সামিষ এবং নিরামিষ আহারের কাহার কিরূপ ফল সে বিষয়ে আমার কিছু বলা শোভা পায় না এবং ডাক্তারের মধ্যেও নানা মত। কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবু নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন "নিরামিষ আহারে দেহ মন উভয়েরই যেরূপ পুষ্টি হয় আমিষযুক্ত আহারে সেরূপ হয় না।"

আমরা এক শতাব্দীর ঊর্দ্ধকাল একটি প্রবল আমিষাশী জাতির দেহ মনের সাতিশয় পুষ্টি অস্থিমজ্জায় অনুভব করিয়া আসিতেছি, মত প্রচারের উৎসাহে চন্দ্রনাথ বাবু সহসা তাহাদিগকে কি করিয়া ভুলিয়া গেলেন বুঝিতে পারি না। তাহারাই কি আমাদিগকে ভোলে, না আমরাই তাহাদিগকে ভুলিতে পারি? তাহাদের দেহের পুষ্টি মুষ্টির অগ্রভাগে আমাদের নাসার সম্মুখে সর্ব্বদাই উদ্যত হইয়া আছে, এবং তাহাদের মনের পুষ্টি যদি অস্বীকার করি তবে তাহাতে আমাদেরই বোধশক্তির অক্ষমতা প্রকাশ পায়।

প্রমাণস্থলে লেখক-মহাশয় হবিষ্যাশী অধ্যাপক পণ্ডিতের সহিত আমিষাশী নব্য বাঙ্গালীর তুলনা করিয়াছেন। এরূপ তুলনা নানা কারণে অসঙ্গত।

প্রথমতঃ মুখের এক কথাতেই তুলনা হয় না। অনির্দ্দিষ্ট আনুমানিক তুলনার উপর নির্ভর করিয়া সর্ব্বসাধারণের প্রতি অকাট্য মত জারি করা যাইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, যদি বা স্বীকার করা যায় যে, অধ্যাপক পণ্ডিতেরা মাংসাশী যুবকের অপেক্ষা বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী ছিলেন তথাপি আহারের পার্থক্যই যে সেই প্রভেদের কারণ তাহার কোন প্রমাণ নাই। সকলেই জানেন অধ্যাপক পণ্ডিতের জীবন নিতান্তই

নিরুদ্বেগ এবং আধুনিক যুবকদিগের পক্ষে জীবনযাত্রানির্ব্বাহ বিষম উৎকণ্ঠার কারণ হইয়া পড়িয়াছে এবং উদ্বেগ যেরূপ আয়ু-ক্ষয়কর এরূপ আর কিছুই নহে।

নিরামিষাশী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় যতই বলিষ্ঠ ও নম্রপ্রকৃতি হৌন্ না কেন তাঁহাকে "সাত্ত্বিক আহারের উৎকৃষ্টতার" প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করা লেখক-মহাশয়ের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। আমিও এমন কোন লোককে জানি যিনি দুই বেলা মাংস ভোজন করেন অথচ তাঁহার মত মাটির মানুষ দেখা যায় না। আরও এমন ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত অনেক আছে কিন্তু সে গুলিকে প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করিয়া ফল কি? চন্দ্রনাথ বাবুর বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত এরূপ ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত প্রমাণ-স্বরূপে প্রয়োগ করিলে বুঝায় যে, তাঁহার মতে অন্য পক্ষে এক-জনও বলিষ্ঠ এবং নির্ম্মল প্রকৃতির লোক নাই।

আধুনিক শিক্ষিত যুবকদের প্রতি চন্দ্রনাথ বাবুর অভিযোগ এই যে, "তাঁহারা অসংযতেন্দ্রিয়, তাঁহাদের সংযম শিক্ষা একেবারেই হয় না। এই জন্য তাঁহারা প্রায়ই সম্ভোগপ্রিয়, ভোগাসক্ত হইয়া থাকেন। শুধু আহারে নয়, ইন্দ্রিয়াধীন সকল কার্য্যেই তাঁহারা কিছু লুব্ধ, কিছু মুগ্ধ, কিছু মোহাচ্ছন্ন।" অসংযতেন্দ্রিয় এবং সংযমশিক্ষাহীন, সম্ভোগপ্রিয় এবং ভোগাসক্ত, মুগ্ধ এবং মোহাচ্ছন্ন কথাগুলার প্রায় একই অর্থ। উপস্থিতক্ষেত্রে চন্দ্রনাথ বাবুর বিশেষ বক্তব্য এই যে, নব্যদের লোভটা কিছু বেশি প্রবল।

প্রাচীন ব্রাহ্মণবটুদের ঐ প্রবৃত্তিটা যে মোটেই ছিল না একথা চন্দ্রনাথ বাবু বলিলেও আমরা স্বীকার করিতে পারিব না। লেখক মহাশয় লুব্ধ পশুর সহিত নব্য পশু-খাদকের কোন প্রভেদ

দেখিতে পান না। কিন্তু এ কথা জগদ্বিখ্যাত যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বশ করিবার প্রধান উপায় আহার এবং দক্ষিণা। অধ্যাপক মহাশয় ঔদরিকতার দৃষ্টান্তস্থল। যিনি একদিন লুচি দধির গন্ধে উন্মনা হইয়া জাতিচ্যুত ধনীগৃহে উর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইয়াছিলেন এবং আহারান্তে বাহিরে আসিয়া কৃতকার্য্য অম্লানমুখে অস্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহারই পৌত্র আজ "চপ্‌কট্‌লেটের সৌরভে বাবুর্চ্চি বাহাদুরের থাপ্‌রেলখচিত মুর্গিমণ্ডপাভিমুখে ছোটেন" এবং অনেকে তাহা বাহিরে আসিয়া মিথ্যাচরণপূর্ব্বক গোপনও করেন না। উভয়ের মধ্যে কেবল সময়ের ব্যবধান কিন্তু সংযম ও সাত্ত্বিকতার বড় ইতরবিশেষ দেখি না। তাহা ছাড়া নব্য ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন পিতৃপুরুষেরা যে ক্রোধবর্জ্জিত ছিলেন তাঁহাদের তর্ক ও বিচারপ্রণালী দ্বারা তাহাও প্রমাণ হয় না।

যাহা হউক্ প্রাচীন বঙ্গসমাজে ষড় রিপু যে নিতান্ত নির্জ্জীবভাবে ছিল এবং আধুনিক সমাজে আমিষের গন্ধ পাইবামাত্র তাহারা সব ক'টা উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে এটা অনেকটা লেখকমহাশয়ের কল্পনা মাত্র। তাঁহার জানা উচিত আমরা প্রাচীন কালের যুবকদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না; যাঁহাদিগকে দেখি তাঁহারা যৌবনলীলা বহুপূর্ব্বে সমাধা করিয়া ভোগাসক্তির বিরুদ্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই জন্য আমাদের সহজেই ধারণা হয় তবে বুঝি সেকালে কেবলমাত্র হরিনাম এবং আত্মারই আমদানী ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে যে সকল পীতবর্ণ জীর্ণ বৈষয়িক এবং রসনিমগ্ন পরিপক্ক ভোগী বৃদ্ধ দেখা যায় তাহাতে বুঝা যায় সত্যযুগ আমাদের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ছিল না।

সামিষ এবং নিরামিষ আহারের তুলনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাহি, "আহার" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া একটা ঘরগড়া দৈববাণী রচনা করা আজকালকার দিনে শোভা পায় না। এখনকার কালে যদি কোন দৈবদুর্য্যোগে কোন লোকের মনে সহসা একটা অভ্রান্ত সত্যের আবির্ভাব হইয়া পড়ে অথচ সঙ্গে সঙ্গে কোন প্রমাণ দেখা না দেয় তবে তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য সেটাকে মনে মনে পরিপাক করা। গুরুর ভঙ্গীতে কথা বলা একটা নূতন উপদ্রব বঙ্গ-সাহিত্যে সম্প্রতি দেখা দিতেছে। এরূপ ভাবে সত্য কথা বলিলেও সত্যের অপমান করা হয়, কারণ সত্য কোন লেখকের নামে বিকাইতে চাহে না, আপনার যুক্তিদ্বারা সে আপনাকে প্রমাণ করে, লেখক উপলক্ষ মাত্র।

অবশ্য, রুচিভেদে অভিজ্ঞতাভেদে আমাদের কোন জিনিষ ভাল লাগে কোন জিনিষ মন্দ লাগে সকল সময়ে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি না। তাহার যেটুকু কারণ তাহা আমাদের সমস্ত জীবনের সহিত জড়িত, সেটাকে টানিয়া বাহির করা ভারি দুরূহ। মনের বিশেষ গতি অনুসারে অসম্পূর্ণ প্রমাণের উপরেও আমরা অনেক মত গঠিত করিয়া থাকি; এইরূপ ভূরি ভূরি অপ্রমাণিত বিশ্বাস লইয়া আমরা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাই। সেইরূপ মত ও বিশ্বাস যদি ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা হয় তবে তাহা বলিবার একটা বিশেষ ধরণ আছে। একেবারে অভ্রান্ত অভ্রভেদী গুরুগৌরব ধারণ করিয়া বিশ্বসাধারণের মস্তকের উপর নিজের মতকে বেদবাক্যস্বরূপে বর্ষণ করিতে আরম্ভ করা কখনো হাস্যকর, কখনো উৎপাৎজনক।

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। অগ্রহায়ণ। "হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন ও সংস্কার" নামক প্রবন্ধে লেখক প্রথমে বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজে হিন্দুধর্ম্মের নূতন আন্দোলনের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পর দেখাইয়াছেন আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় পুরাতন হিন্দু প্রথা সম্পূর্ণভাবে পুনঃপ্রচলিত হওয়া অসম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন "ভিন্ন দেশজাত দ্রব্যমাত্রই হিন্দুদের ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু বিলাতী আলু, কোপি, কাবুলি মেওয়া প্রভৃতিও এখন বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছে।" "সোডা লিমনেড্ বরফ প্রভৃতি প্রকাশ্যরূপে হিন্দুসমাজে প্রচলিত। এ সমস্ত যে স্পষ্ট যবন ও ম্লেচ্ছদের হাতের জল।" তিনি বলেন শাস্ত্রে পলাণ্ডুভক্ষণ নিষেধ কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ হইতে ইতর জাতি পর্য্যন্ত সকলেই পলাণ্ডু ভক্ষণ করিয়া থাকে। "যবনকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, কিন্তু বঙ্গদেশ ব্যতীত, ভারতবর্ষের অপর অংশের হিন্দুগণ মুসলমানদের সহিত একত্রে বসিয়া তাম্বুল ভক্ষণ করেন।" "যজ্ঞউপবীত হইবার পর আমাদিগকে অন্যূন বারো বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করতঃ শাস্ত্র আলোচনা এবং গুরুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। পরে গুরুর অনুমতি লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এ পদ্ধতি অনুসারে কে কার্য্য করিয়া থাকে?" "ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা করিতে হয় কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা চাকরি করেন তাঁহারা কি প্রকারে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা সমাধা করিতে পারেন?" লেখক বলেন, যাঁহারা অনাচারী হিন্দুদিগকে

শাসন করিবার জন্য সমুৎসুক তাঁহাদিগকেই হিঁদুয়ানি লঙ্ঘন করিতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখাইয়াছেন, বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে নানা প্রকার শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে; ইহাতে করিয়া শাস্ত্রীয় বাক্য বেদবাক্যসকল স্ত্রী, শূদ্র, বলিতে কি, যবন ও ম্লেচ্ছদের গোচর হইতেছে। অধিক কি, বৈদিক সন্ধ্যাও তাঁহাদের কর্ত্তৃক পরিচালিত পত্রিকায় প্রকাশিত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে। অতঃপর লেখক বহুতর শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন প্রাচীনকালেই বা ব্রাহ্মণের কিরূপ লক্ষণ ছিল এবং বর্ত্তমানকালে তাহার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই প্রবন্ধের মধ্যে অনেক শিক্ষা ও চিন্তার বিষয় আছে। কেবল একটা কথা আমাদের নূতন ঠেকিল। বঙ্কিম বাবু যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও শশধর তর্কচূড়ামণির ধুয়া ধরিয়া হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়াছেন এ কথা মুহূর্ত্তকালের জন্যও প্রণিধানযোগ্য নহে। "ঋষি চিত্র" একটি কবিতা। লেখক শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও। নাম শুনিয়া কবিকে মহারাষ্ট্রীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু বঙ্গভাষায় এরূপ কবিত্ব প্রকাশ আর কোন বিদেশীর দ্বারায় সাধিত হয় নাই। কবির রচনার মধ্যে প্রাচীন ভারতের একটি শিশির-স্নাত পবিত্র নবীন উষালোক অতি নির্ম্মল উজ্জ্বল এবং মহৎভাবে দীপ্তি পাইয়াছে। এই কবিতার মধ্যে আমরা একটি নূতন রসাস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে বাঙ্গলার অধিকাংশ লেখক যাহা লেখেন তাহার মধ্যে প্রাচীনত্বের প্রকৃত আস্বাদ পাওয়া যায় না; কিন্তু ঋষিচিত্র কবিতার মধ্যে একটি প্রাচীন গম্ভীর ধ্রুপদের সুর বাজিতেছে। নব্যভারতে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের "হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন

ইতিবৃত্ত” খণ্ডশঃ বাহির হইতেছে। রমেশ বাবু যে এতটা শ্রম স্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, কারণ, আমাদের দেশের বুদ্ধিমানগণ প্রাচীন হিন্দুসমাজ ঘরে বসিয়া গড়িয়া থাকেন। সে সমাজে কি ছিল কি না ছিল, কোন্‌টা হিন্দু কোন্‌টা অহিন্দু সেটা যেন বিধাতাপুরুষ সূতিকাগৃহে তাঁহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার অন্য কোন ইতিহাস নাই। ঐতিহাসিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া রমেশ বাবু এই যে প্রাচীন সমাজ-চিত্র প্রকাশ করিতেছেন ইহার সহিত আমাদের বাঙ্গলার আজন্ম-পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক-লিখনের ঐক্য হইবে এরূপ আশা করা যায় না। নিজের সখ অনুসারে তাঁহারা প্রত্যেকেই দুটি চারিটি মনের মত শ্লোক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, ইতিহাস বিজ্ঞানকে তাহার কাছে ঘেঁসিতে দেন না। মনে কর তাহার কোন একটি শ্লোকে ঋষি বলিতেছেন রাত্রি, আমরা দেখিতেছি দিন। বঙ্গপণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন “আচ্ছা চোখ বুজিয়া দেখ দিন কি রাত্রি।” অমনি বিংশতি সহস্র চেলা চোখ বুজিবেন এবং মস্তক আন্দোলন করিয়া বলিবেন “অহো কি আশ্চর্য্য! ঋষিবাক্যের কি মহিমা! গুরুদেবের কি তত্ত্বজ্ঞান! দিবা-লোকের লেশমাত্র দেখিতেছি না।” যে হতভাগ্য চোখ খুলিয়া থাকিবে, যদি তাহার চোখ বন্ধ করিতে অক্ষম হন ত ধোপা নাপিত বন্ধ করিবেন, এবং দুই একজন মহাপ্রাজ্ঞ সৃষ্টিছাড়া তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া তাহার চোখে ধুলা দিতে ছাড়িবেন না। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালীর এই স্বরচিত ভারত-বর্ষ, সত্য হৌক্‌ মিথ্যা হৌক্‌ খুব যে উচ্চশ্রেণীর ভারতবর্ষ তাহা নহে। বাঙ্গলা দেশের একখানি গ্রামকে অনেকখানি

"আধ্যাত্মিক" গঙ্গাজলের সহিত মিশাল করিয়া একটি বৃহৎ ভারতবর্ষ রচনা করা হয়; সেখানেও কয়েক জন নিস্তেজ নির্ব্বীর্য্য মানুষ অদৃষ্টের করধৃত নাসারজ্জু অনুসরণ করিয়া সাতিশয় কৃশ ও পবিত্রভাবে ধীরে ধীরে চলিতেছে; সমাজ অর্থে জাতি লইয়া দলাদলি, ধর্ম্ম অর্থে সর্ব্ববিষয়েই স্বাধীন বুদ্ধিকে বলিদান, কর্ম্ম অর্থে কেবল ব্রতপালন এবং ব্রাহ্মণভোজন, বিদ্যা অর্থে পুরাণ মুখস্থ, এবং বুদ্ধি অর্থে সংহিতার শ্লোক লইয়া আবশ্যক অনুসারে ব্যাকরণের ইন্দ্রজাল দ্বারা আজ "না"-কে হাঁ করা কাল "হাঁ"-কে না করার ক্ষমতা। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে বঙ্গসমাজ প্রাচীন হিন্দুসমাজের ন্যায় উন্নত ও সজীব নহে, অতএব বাঙ্গালীর কল্পনার দ্বারা প্রাচীন ভারতের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ অসম্ভব—প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রীতিমত ইতিহাসের সাহায্য ব্যতীত আর গতি নাই। একজন চাষা বলিয়াছিল, আমি যদি রাণী রাসমণি হইতাম তবে দক্ষিণে একটা চিনির হাঁড়ি রাখিতাম, বামে একটা চিনির হাঁড়ি রাখিতাম, একবার ডা'ন দিক হইতে একমুষ্টি লইয়া খাইতাম একবার বাম দিক হইতে একমুষ্টি লইয়া মুখে পূরিতাম। বলা বাহুল্য চিনির প্রাচুর্য্যে রাণী রাসমণির এতাধিক সন্তোষ ছিল না। রমেশ বাবুও প্রমাণ পাইয়াছেন প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মণ্য ও সাত্ত্বিকতারই সর্ব্বগ্রাসী প্রাদুর্ভাব ছিল না; মৃত্যুর যেরূপ একটা ভয়ানক নিশ্চল ভাব আছে তখনকার সমাজনিয়মের মধ্যে সেরূপ একটা অবিচল শ্বাসরোধী চাপ ছিল না, তখন বর্ণভেদ প্রথার মধ্যেও সজীব স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু চিনিকেই যে লোক সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহাকে রাণী

রাসমণির আহারের বৈচিত্র্য কে বুঝাইতে পারিবে?—দুর্ভাগ্যক্রমে একটি মত বহুকাল হইতে প্রচারিত হইয়াছে যে, হিন্দুসমাজের পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেই কথা লইয়া আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি যে আমাদের সমাজ এমনি সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল যে সহস্র বৎসরে তাহার এক তিল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে নাই। জগতের কোথাও কিছুই থামিয়া নাই, হয় সংস্কার নয় বিকারের দিকে যাইতেছে; যখন গঠন বন্ধ হয় তখনি ভাঙ্গন আরম্ভ হয় জীবনের এই নিয়ম। জগতের মধ্যে কেবল হিন্দুসমাজ থামিয়া আছে। হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠতার পক্ষে সেই একটি প্রধান যুক্তি, এ সমাজ সাধারণ জগতের নিয়মে চলে না, এই ঋষিরচিত সমাজ বিশ্বামিত্র-রচিত জগতের ন্যায় সৃষ্টিছাড়া। কিন্তু ইহাঁরা এক মুখে দুই কথা বলিয়া থাকেন। একবার বলেন হিন্দুসমাজ নির্ব্বিকার নিশ্চল, আবার সময়ান্তরে পতিত ভারতের জন্য বর্ত্তমান অনাচারের জন্য কণ্ঠ ছাড়িয়া বিলাপ করিতে থাকেন। কিন্তু পতিত ভারত বলিতে কি প্রাচীন ভারতবর্ষের বিকার বুঝায় না? সেই হিন্দুধর্ম্ম সেই হিন্দুসমাজ সবই যদি ঠিক থাকে তবে আমরা নূতনতর জীব কোথা হইতে আসিলাম?

"য়ুরোপীয় মহাদেশ" লেখাটি সন্তোষজনক নহে। কতকগুলা নোট্ এবং ইংরাজি, বাঙ্গলা, ফরাসী (ভুল বানানসমেত) একত্র মিশাইয়া সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং অসংলগ্ন হইয়াছে। বাঙ্গলা লেখার মধ্যে অনেকখানি করিয়া ইংরাজী এই পত্রের অন্যান্য প্রবন্ধেও দেখা যায় এবং সকল সময়ে তাহার অত্যাবশ্যকতা বুঝা যায় না। "বঙ্গবাসীর মৃত্যু" প্রবন্ধে লেখক বড় বেশি হাঁসফাঁস করিয়াছেন; লেখক যত সংযত ভাবে লিখি-

তেন লেখার বল তত বৃদ্ধি পাইত। হৃদয়ের উত্তাপ অতিমাত্রায় রচনার মধ্যে প্রয়োগ করিলে অনেক সময়ে তাহা বাষ্পের মত লঘু হইয়া যায়।

সাহিত্য। অগ্রহায়ণ। বর্ত্তমান সংখ্যক সাহিত্যে "আহার" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহার বিস্তারিত সমালোচনা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে" চন্দ্রশেখর বাবু ডারুয়িনের মতের কিয়দংশ সংক্ষেপে সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। "মুক্তি" একটি ছোট গল্প। কতকটা রূপকের মত। কিন্তু আমরা ইহার উপদেশ সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। মুক্তি যে সংসারের বাহিরে হিমালয়ের শিখরের উপরে প্রাপ্তব্য তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। মুক্তি অর্থে আত্মার স্বাধীনতা, কিন্তু স্বাধীনতা অর্থে শূন্যতা নহে। অধিকার যত বিস্তৃত হয় আত্মার ক্ষেত্র ততই ব্যাপ্ত হয়। সেই অধিকার বিস্তারের উপায় প্রেম। প্রেমের বিষয়কে বিনাশ করিয়া মুক্তি নহে, প্রেমের বিষয়কে ব্যাপ্ত করিয়াই মুক্তি। বৈষয়িক স্বার্থপরতায় আমরা সমস্ত সুখ সম্পদ কেবল নিজের জন্য সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করি—কিন্তু সুখকে অনেকের মধ্যে বিভাগ করিয়া না দিলে সুখের প্রসারতা হয় না—এই জন্য কৃপণ প্রেমের বৃহত্তর সুখ হইতে বঞ্চিত হয়। আত্মসুখে বিশ্বসুখকে বাদ দিলে আত্মসুখ অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। তেমনি আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় আমরা আপনার আত্মাটি কক্ষে লইয়া অনন্ত বিশ্বকে লঙ্ঘন করিয়া একাকী মুক্তিশিখরের উপরে চড়িয়া বসিতে চাহি। কিন্তু প্রেমের মুক্তি সেরূপ নহে—যে বিশ্বকে ঈশ্বর ত্যাগ করেন নাই, সে বিশ্বকে সেও ত্যাগ করে না। যে দিন নিখিলকে আপনার ও

আপনাকে নিখিলের করিতে পারিবে সেই দিনই তাহার মুক্তি। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে অসংখ্য সোপান আছে তাহার কোনটিকে অবহেলা করিবার নহে। অধিকারের স্বাধীনতা এবং অধিকার-হীনতার স্বাধীনতায় আকাশপাতাল প্রভেদ।—চীন পরিব্রাজক হিউএন্থ সঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় "প্রাচীন ভারতবর্ষ" নামে খৃঃসপ্তম শতাব্দীর ভারতবর্ষের একটি চিত্র প্রকাশ করিতেছেন। নাম লইয়া তারিখ লইয়া কেবল তর্কবিতর্কের আবর্ত্ত রচনা না করিয়া প্রাচীন কালের এক একটি চিত্র অঙ্কিত করিলে পাঠকদিগের বাস্তবিক উপকার হয়। গুপ্ত মহাশয় যদি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের সামাজিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার প্রণালী তৎসাময়িক সাহিত্য ও অন্যান্য প্রমাণ হইতে উদ্ধার করিয়া চিত্রবৎ পাঠকদের সম্মুখে ধরিতে পারেন তবে সাহিত্যের একটি মহৎ অভাব দূর হয়।

প্রশ্ন

১। কোন ইংরাজী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি ধান গম যব প্রভৃতি শস্যের শীষ্ পরিপক্ক হইলে অন্য কোনদিকে না হেলিয়া উত্তরদিকে হেলিয়া থাকে। পল্লিগ্রামবাসী পাঠক যদি ইহার সত্য নির্ণয় করিয়া লিখিয়া পাঠান ত বাধিত হই।

২। দুই ব্যক্তির মধ্যে মনান্তর থাকিলে বাঙ্গালা ভাষায় আদা কাঁচকলার সহিত তাহাদের তুলনা কেন করা হয়? আদা ও কাঁচকলার সহিত কোনরূপ বিরোধ আছে বলিয়া জানা নাই।

জিজ্ঞাসু।

নূতন ডল্‌সেট্টনা (হারমো[illegible] মূল্য ৬৫৲ হইতে ৭৫৲।

প্যারিস প্রদর্শনীতে সর্ব্বোচ্চ স্বর্ণমেডেলধারী বিখ্যাত ফরাসীদেশীয় হা[illegible]নিয়ম নির্ম্মাতা রডল্‌ফিল্‌স্‌ এণ্ড ডিবেন কর্ত্তৃক সলিড্‌ এবনাইজ্‌ড্‌ কাঠে [illegible]। হাপর ভিতরে থাকাতে ঠাণ্ডা লাগে না পোকায় কাটে না। তিন গ্রাম, পাঁচ

ভারতবর্ষে একমাত্র বিক্রেতা ডোয়ারকিন এণ্ড সন্ লালবাজার পুলিশ আদালতের পূর্ব্ব, কলিকাতা

টপ্ দুই সেট্ রীড আছে। চাবিগুলি গজদন্তনির্ম্মিত ও চওড়া। স্বর প্রবল সুমিষ্ট

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

রাজা ও রাণী	(নাটক)	এক টাকা।
বিসর্জন	(নাটক)	এক টাকা।
রাজর্ষি	(উপন্যাস)	পাঁচ সিকা।
মানসী	(কবিতা)	দুই টাকা।
য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী	(ভূমিকা)	আট আনা।

উক্ত গ্রন্থকারের নিম্নলিখিত গ্রন্থ কলেজ ষ্ট্রীট্ পিপ্‌ল্‌স্ লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

কড়ি ও কোমল	(কবিতা)	এক টাকা।
সমালোচনা		এক টাকা।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

আর্য্যামি এবং সাহেবিয়ানা	দুই আনা।
সোনার কাটি ও রূপার কাটি	দুই আনা।
সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা	দুই আনা।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

সরোজিনী নাটক	(পঞ্চম সংস্করণ)	এক টাকা।

(মোরা) মদির-তরঙ্গ তুলি বসন্ত সমীরে।
ছুরাশা জাগায় প্রাণে প্রাণে
আধ তানে ভাঙ্গা গানে
ভ্রমর গুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি।
মোরা মায়াজাল গাঁথি।
নরনারী হিয়া মোরা, বাঁধি মায়াপাশে।
কত ভুল করে তারা, কত কাঁদে হাসে।
মায়া করে' ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে,
আনি মান অভিমান।
বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথী!
মোরা মায়াজাল গাঁথি।
চল, সখি, চল!
কুহক-স্বপন খেলা খেলাবে চল!
নবীন হৃদয়ে রচি নব প্রেম-ছল,
প্রমোদে কাটাব নব বসন্তের রাতি!
মোরা মায়াজাল গাঁথি।

পিলু—একতালা।

॰।॰

॥ রা সা-রসা। ন্‌া ন্‌া -সা। রা রা-ঙ্গা। রা রমা ঙ্গা।
॥ মো রা —। জ লে —। স্থ লে —। ক ত ই।

রা সা-া। পা পা-া। মা-রা মা। ঙ্গা-রা সা॥
ছ লে —। মা য়া —। জা — ল। গাঁ — থি॥

। রা সন্‌া। দ্‌া ন্‌া-া। সা ন্‌সা-রা। সা ন্‌া-সন্‌া।
। মো রা। স্ব প —। ন, র —। চ না, —।

দ্‌া প্‌া-া। প্‌দ্‌া-স্‌া প্‌া। ন্‌া ন্‌া ন্‌া। সা ন্‌সা-রা। সন্‌া সা-া।
ক রি —। — — অ। ল স, ন। য় ন, —। ত রি —।

। -া-া- স্যা। র্রা স্যা ন্া। স্যা ন্সা-র্জ্ঞা। র্রা র্জ্ঞা-া। ' ' র্রা।
। — —গো। প নে, হৃ। দ য়ে, — । প শি, —। কু।

। জ্ঞা মা পা। মপা ম/০জ্ঞা-া। রা সা-পা। পা পা-া।
। হ ক, আ। স ন, — । পা তি, — । মা য়া —।

। মা-রা মা। জ্ঞা-রা সা ॥ ' সা সা। সা সা-া। সা সা-া।
। জা — ল। গাঁ — থি ॥ মো রা। ম দি —। র, ত —।

। রা - মা মা। পা পা-া। পা পধা-ঞা। ধা পা-ধপা।
। র — ঙ্গ। তু লি —। ব স —। স্ত, স —।

। ম/০পা-া মা। জ্ঞমজ্ঞা-রা-সন্া। সা সরা-জ্ঞা। রা জ্ঞা-া।
। মী— রে। — — — । দু রা — । শা, জা-।

। রা -মা জ্ঞা। রা সা-রসা। ন্া -া -া। সা -া -া। পা পা-া।
। গা — য়ে। প্রা ণে —। প্রা — —। ণে — —। আ ধো-।

। মা পা -া। মা ম/০জ্ঞা -া। রা সা -া। ' ' গা।
। তা নে —। ভা ঙ্গা —। গা নে —। ভ্র।

। গা গা গা। গা মা -া। গা মা-গপা। মা মজ্ঞা-রা।
। ম র, গু। ঞ্জ রা —। কু ল, —। ব কু —।

। সা-রমা মা। জ্ঞা-রা সা। ' পা পা। মা মা-জ্ঞা।
। লে — র। পাঁ — তি। মো রা। মা য়া —।

। রা-জ্ঞা মা। জ্ঞা-রা সা ॥ প্া ন্া -া। ন্া ন্া-া।
। জা — ল। গাঁ — থি ॥ ন র —। না রী —।

। সা ন্সা-রা। সন্া সা-া। -া -া সা। র্রা সা ন্া।
। হি মা —। মো রা —। — — বাঁ। ধি, মা য়া।

। সরা -ঙ্গা- া। রা -া -া। ঙ্গা ঙ্গা -া। রঙ্গা-া রা।
। পা — —। শে,— —। ক ত —। ভু — ল।

। স/০রা সা -া। ন্‌া সা -া। পা পা -া। মা -া পা।
। ক রে —। তা রা —। ক ত —। কাঁ — দে।

। মপমা-ঙ্গা-রা। সা -া -া॥ সা সা -া। সা সা -া।
। হা — —। সে — —॥ মা য়া —। ক রে —।

। রমা মা -া। পা পা -া। পা পধা-ঞা। ধা পা-ধপা।
। ছা য়া —। ফে লি —। মি ল —। নে র —।

। মা-পা মা- । -ঙ্গা রা সন্‌া। সা-রা ঙ্গা। রমা ঙ্গা-রা।
। মা — ঝে। — আ নি। মা — ন। অ ভি —।

। সা -া গা। গা গা গা। গা মা-গা। মা-গমা-পা।
। মা ন, বি। র হী, স্ব। প নে —। পা — য়

। মা মঙ্গা-রা। সা-রমা মা। ঙ্গা-রা সা॥ ন্‌া সা -া।
। মি ল —। নে — র। সা —থি॥ চ ল —।

। গা মা -া। পা -দা -া। পা -া -া। দা দা-পা। মা মা -া।
। স খি —। চ — —। ল — —। কু হু —। ক, স্ব —।

। পা মা -গা। গা মা -গপা। মা মঙ্গা-রা। সা-রমা ঙ্গরা।
। প ন —। খে লা —। খে লা —। বে — চ।

। সা -া -া। ন্‌া সা -া। গা মা -া। পা পা -া।
। ল — —। ন বী —। ন, হৃ —। দ য়ে —।

। -া পা ধা। ঞা সা-রসা। ঞা ঞা-ধা। পা-ধা পধপা।
। — র চি। ন ব —। প্রে ম —। ফু — ল।

মা -গা -া। গা গা -া। গা গা -া। মা মা -া।
— — —। প্র মো —। দে, কা —। টা ব, —।

-া মা পা। মা ঙ্গা-ঙ্গা। সা-রমা মা। ঙ্গা-ঙ্গা সা-।
— ন ব। ব স —। ন্তে — র। রা —তি।

-পা পা-পা। মা মা -ঙ্গা। ঙ্গা -ঙ্গা মা। ঙ্গা- ঙ্গা সা॥॥
— মোরা। মা য়া —। জা — ল। গাঁ — থি॥॥

আমার সহযাত্রী।

(য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী।)

২৬ আগষ্ট। শনিবার থেকে আর আজ এই মঙ্গলবার পর্য্যন্ত কেটে গেল। জগতে ঘটনা বড় কম হয়নি—সূর্য্য চারবার উঠেচে এবং তিনবার অস্ত গেছে; বৃহৎ পৃথিবীর অসংখ্য জীব দন্তধাবন থেকে দেশ উদ্ধার পর্য্যন্ত বিচিত্র কর্ত্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনটে দিন মহা ব্যস্তভাবে অতিবাহিত করেচে—জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা প্রভৃতি জীবরাজ্যের বড় বড় ব্যাপার সবেগে চল্‌ছিল—কেবল আমি শয্যাগত জীবন্মৃত হ'য়ে পড়ে ছিলুম। আধুনিক কবিরা কখনও মুহূর্ত্তকে অনন্ত কখনও অনন্তকে মুহূর্ত্ত আখ্যা দিয়ে প্রচলিত ভাষাকে নানাপ্রকার বিপরীত ব্যায়াম বিপাকে প্রবৃত্ত করান্। আমি আমার এই চারটে দিনকে বড় রকমের একটা মুহূর্ত্ত বল্‌ব, না এর প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে একটা যুগ বল্‌ব স্থির কর্‌তে পারচিনে।

যাই হোক্ কষ্টের সীমা নেই। মানুষের মত এত বড় একটা উন্নত জীব যে সহসা এতটা উৎকট দুঃখ ভোগ করে তার একটা মহৎ নৈতিক কিম্বা আধ্যাত্মিক কারণ থাকাই উচিত ছিল ; কিন্তু জলের উপরে কেবল খানিকটা ঢেউ ওঠার দরুণ জীবাত্মার এতাধিক পীড়া নিতান্ত অন্যায় অসঙ্গত এবং অগৌরবজনক বলে' বোধ হয়। কিন্তু জাগতিক নিয়মের প্রতি দোষারোপ করে' কোন সুখ নেই, কারণ, সে নিন্দাবাদে কারো গায়ে কিছু ব্যথা বাজে না। এবং জগৎ রচনার তিলমাত্র সংশোধন হয় না।

যন্ত্রণাশয্যায় অচেতনপ্রায় ভাবে পড়ে' আছি। কখন কখন ডেকের উপর থেকে পিয়ানোর সঙ্গীত মৃদু মৃদু কর্ণে এসে প্রবেশ করে, তখন স্মরণ হয়, আমার এই সঙ্কীর্ণ শয়ন-কারাগারের বাইরে সংসারের নিত্য আনন্দস্রোত সমভাবে প্রবাহিত হচ্চে। বহুদূরে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমায় আমার সেই সঙ্গীতধ্বনিত স্নেহমধুর গৃহ মনে পড়ে। সুখস্বাস্থ্যসৌন্দর্য্যময় জীবজগৎকে অতিদূরবর্ত্তী ছায়ারাজ্যের মত বোধ হয়। মধ্যের এই সুদীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করে' কখন্ সেখানকার জীবন-উৎসবের মধ্যে ফিরে যেতে পারব, এই কথাই কেবল ভাবি। মঙ্গলবার প্রাতে যখন শরীরের মধ্যে প্রাণটা ছাড়া আর ভৌতিক পদার্থ কিছুই অবশিষ্ট ছিল না তখন আমার বন্ধু অনেক আশ্বাস দিয়ে আমাকে জাহাজের "ডেক্" অর্থাৎ ছাদের উপর নিয়ে গেলেন। সেখানে লম্বা বেতের চৌকিটির উপর পা ছাড়িয়ে বসে' পুনর্ব্বার এই মর্ত্ত্য পৃথিবীর স্পর্শ এবং নবজীবনের আস্বাদ লাভ করা গেল।

জাহাজের যাত্রীদের বর্ণনা করতে চাইনে। অতি নিকট হ'তে কোন মসীলিপ্ত লেখনীর সূচ্যগ্রভাগ যে তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ

লক্ষ্য স্থাপন করতে পারে এ কথা তারা স্বপ্নেও না মনে করে' বেশ বিশ্বস্তচিত্তে ডেকের উপর বিচরণ করচে, টুংটাং শব্দে পিয়ানো বাজাচ্চে, বাজি রেখে হার-জিৎ খেল্‌চে, ধূম্রশালায় বসে' তাস পিটচ্চে; তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তিন বাঙ্গালী তিন লম্বা চৌকিতে জাহাজের একটি প্রান্ত সম্পূর্ণ অধিকার করে' অবশিষ্ট জনসংখ্যার প্রতি অত্যন্ত ঔদাস্যদৃষ্টিপাত করে' থাকি।

আমার বন্ধুর দোষগুণ সমালোচনা করতেও আমি চাই না। ত্রেতাযুগে রাজার পক্ষে প্রজারঞ্জন যেমন ছিল, কলিযুগে লেখকের পক্ষে পাঠকের মনোরঞ্জন সেই রকমের একটা পরম কর্ত্তব্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তখনকার প্রজারঞ্জনকার্য্যে রামভদ্র স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছিলেন, এখনকার পাঠকরঞ্জনকার্য্যে লেখকদের অনেক সময়ে আত্মীয়বিচ্ছেদ ঘটে' থাকে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত আত্মীয়েরাও পাঠকশ্রেণীভুক্ত। অধিকাংশ সময়েই নন সে কথা সত্য, কিন্তু তাঁরা নিজে যখন বর্ণনার বিষয় হন তখন আত্মীয়রচিত প্রবন্ধও পাঠ করে' থাকেন।

কিন্তু যে বন্ধুর বর্ণনা করবামাত্র বিচ্ছেদ ঘট্‌বার সম্ভাবনা আছে শাস্ত্রমতে তাঁকে সৎসঙ্গ বলা যায় না। অতএব আমার বন্ধু সম্বন্ধে আমি সেরকম আশঙ্কা করিনে। কিন্তু পাঠকের মনোরঞ্জনকেই যদি প্রধান উদ্দেশ্য করা যায়, তবে নিছক্ প্রশংসায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা নেই। নিদেন বানিয়ে ছুটো নিন্দে করতে এবং শানিয়ে ছুটো কথা বল্‌তে হয়। কিন্তু সে ক্ষমতা আমার যদি থাকে আমার বন্ধুর থাকৃতেও আটক নেই। অতএব মৌনাবলম্বনই ভাল।

জাহাজে আমরা দীর্ঘ দিন দুজনে মুখোমুখি চৌকি টেনে বসে' পরস্পরের স্বভাব চরিত্র জীবনবৃত্তান্ত এবং সৃষ্টির যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল সত্তা সম্বন্ধে যার যা-কিছু বক্তব্য ছিল সমস্ত নিঃশেষ করে' ফেলেছি। আমার বন্ধু চুরোটের ধোঁয়া এবং বিবিধ উড্ডীয়মান কল্পনা একত্র মিশিয়ে সমস্তদিন অপূর্ব্ব ধূম্রলোক সৃজন করেচেন। সেগুলোকে যদি মস্ত একটা ফুলো রবারের থলির মধ্যে বেঁধে রাখ্‌বার কোন সুযোগ থাক্‌ত তাহলে সমস্ত মেদিনীকে বেলুনে চড়িয়ে একেবারে ছায়াপথের দিকে বেড়িয়ে নিয়ে আসা যেতে পারত। সাধারণতঃ কাল্পনিকেরা যখন কল্পনাক্ষেত্রের হাওয়া খেতে চায় তখন্ তারা পৃথিবী ছেড়ে হুস্ করে' উড়ে' এক আজ্‌গবি পুরীতে গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু আমার বন্ধুর পদ্ধতি অন্যরকম। তিনি তাঁর প্রবল ধূম্রশক্তির উপরে ফুল্ ফোর্স প্রয়োগ করে' পৃথিবীর সমস্ত মৃত্তিকাপিণ্ড একে-বারে সঙ্গে করে' উড়িয়ে নিয়ে যান্। গুরু লঘু কিছুই ছাড়েন না। যখন এত উর্দ্ধে ওঠা গেছে যে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক হাওয়ায় আর নিশ্বাস চলে না, সেখানে তিনি হঠাৎ তাঁর থলির মধ্যে থেকে বৈজ্ঞানিক হাওয়া বের করে' দিয়ে আশ্চর্য্য করে' দেন। যখন জগতের ডগার উপর চড়ে' আধ্যাত্মিক ভাবে একেবারে বিন্দুবৎ হ'য়ে মিশিয়ে গেছি, তখন তিনি কোথা থেকে তার গোড়াকার মৃত্তিকা তুলে এনে আগা ও গোড়ার সামঞ্জস্য প্রমাণে প্রবৃত্ত হন। অন্যান্য কল্পনাবিহারীগণকে মাঝে মাঝে মেঘ থেকে হঠাৎ মাটির উপরে ধুপ্ করে' নেমে পড়তে হয় কিন্তু তাঁর সেই গুরুতর পতনের আবশ্যক হয় না। তিনি একই সময়ে স্বর্গমর্ত্ত্য গদ্যপদ্যময় প্যারাডক্স্-লোকে ইন্দ্রত্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

এক কথায়, একদিকে তাঁর যেমন কাব্যাকাশে উধাও হ'য়ে ওড়বার উদ্যম, অন্যদিকে তেমনি তন্ন তন্ন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এই অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিটা অধিকাংশ সময়েই তাঁর চুরোটের পশ্চাতে ব্যাপৃত থাকে। তাঁর তামাকের থলি, সিগারেটের কাগজ এবং দেশালাইয়ের বাক্স মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হারাচ্চে, অসম্ভব স্থানে তার সন্ধান হচ্চে এবং সম্ভব স্থান থেকে তাকে পাওয়া যাচ্চে। পুরাণে পড়া যায় ইন্দ্রের একটি প্রধান কাজ হচ্চে, যিনি যজ্ঞ করেন বিঘ্ন ঘটিয়ে তাঁর যজ্ঞনাশ করা, যিনি তপস্যা করেন অপ্সরী পাঠিয়ে তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করা। আমার বোধ হয় সেই পরশ্রীকাতর ইন্দ্র আমার বন্ধুর বুদ্ধিবৃত্তিকে সর্ব্বদাই বিক্ষিপ্ত করে' রাখ্‌বার অভিপ্রায়ে তাঁর কোন এক সুচতুরা কিন্নরীকে তামাকের থলিরূপে আমার বন্ধুর পকেটের মধ্যে প্রেরণ করেচেন। ছলনাপ্রিয় ললনার মত তাঁর সিগারেট মুহুর্মুহু কেবলি লুকোচ্চে এবং ধরা দিচ্চে এবং তাঁর চিত্তকে অহর্নিশি উদ্‌ভ্রান্ত করে' তুল্‌চে। আমি তাঁকে বারম্বার সতর্ক করে' দিয়েছি যে, যদি তাঁর মুক্তির কোন ব্যাঘাত থাকে সে তাঁর চুরোট। মহর্ষি ভরত মৃত্যুকালেও হরিণশিশুর প্রতি চিত্ত নিবেশ করেছিলেন বলে' পরজন্মে হরিণশাবক হ'য়ে জন্মগ্রহণ করলেন। আমার সর্ব্বদাই আশঙ্কা হয় আমার বন্ধু জন্মান্তরে ব্রহ্মদেশীয় কোন্ এক কৃষকের কুটীরের সম্মুখে মস্ত একটা তামাকের ক্ষেত হ'য়ে উদ্ভূত হবেন। বিনা প্রমাণে তিনি শাস্ত্রের এ সকল কথা বিশ্বাস করেন না, বরঞ্চ তর্ক করে' আমারও সরল বিশ্বাস নষ্ট করতে চান এবং আমাকে পর্য্যন্ত চুরুট ধরাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নি।
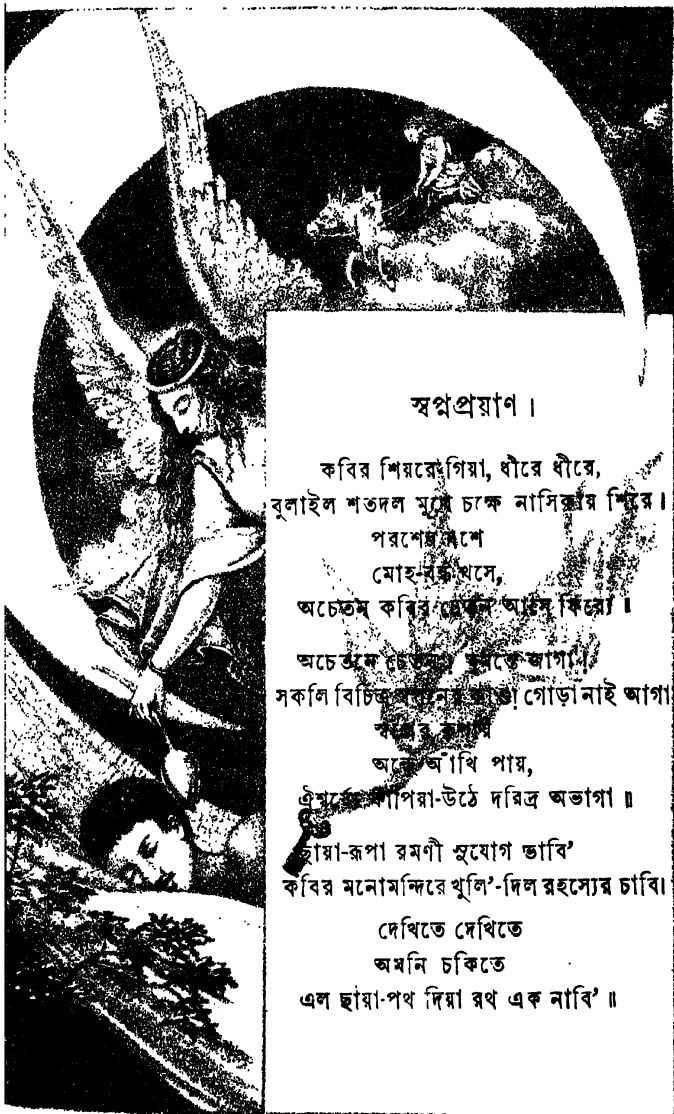
স্বপ্নপ্রয়াণ।

কবির শিয়রে গিয়া, ধীরে ধীরে,
বুলাইল শতদল মুখে চক্ষে নাসিকায় শিরে।
পরশের বশে
মোহ-বন্ধ খসে,
অচেতন কবির চেতন আসে ফিরে।

অচেতনে চেতনার [illegible] জাগা।
সকলি বিচিত্র স্বপনের ভাঙা গোড়া নাই আগা।
স্বপনের কায়
অন্ধে আঁখি পায়,
ঐশ্বর্য্যে কাঁপিয়া-উঠে দরিদ্র অভাগা॥

ছায়া-রূপা রমণী সুযোগ ভাবি'
কবির মনোমন্দিরে খুলি'-দিল রহস্যের চাবি।
দেখিতে দেখিতে
অমনি চকিতে
এল ছায়া-পথ দিয়া রথ এক নাবি'॥

মরে। এবং সুজার একটি বিশ্বাসী কর্ম্মচারী রহমৎআলি জুলিখাকে লইয়া সাঁতার দিয়া পালায় এবং সুজা যুদ্ধ করিতে করিতে মরেন।

আমিনা খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়া দৈবক্রমে অনতিবিলম্বে এক ধীবরের জালে উদ্ধৃত হয় এবং তাহারি গৃহে পালিত হইয়া বড় হইয়া উঠে।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইয়াছে, এবং যুবরাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদিন সকালে বৃদ্ধ ধীবর আসিয়া আমিনাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল "তিন্নি!" ধীবর আরাকান ভাষায় আমিনার নূতন নামকরণ করিয়াছিল। "তিন্নি, আজ সকালে তোর হৈল কি! কাজকর্ম্মে যে একেবারে হাত লাগাস্ নাই! আমার নতুন জালে আঠা দেওয়া হয় নাই, আমার নৌকো"—

আমিনা ধীবরের কাছে আসিয়া আদর করিয়া কহিল "বুঢ়া, আজ আমার দিদি আসিয়াছেন, তাই আজ ছুটি!"

"তোর আবার দিদি কে রে তিন্নি!"

জুলিখা কোথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল "আমি।" বৃদ্ধ অবাক্ হইয়া গেল। তার পর জুলিখার অনেক কাছে আসিয়া ভাল করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। খপ্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুই কাজ কাম্ কিছু জানিস্?" আমিনা কহিল "বুঢ়া, দিদির হইয়া আমি কাজ করিয়া দিব। দিদি কাজ করিতে পারিবে না।" বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল

"তুই থাকিবি কোথায়?" জুলিখা বলিল "আমিনার কাছে।" বৃদ্ধ ভাবিল এওত বিষম বিপদ! জিজ্ঞাসা করিল "খাইবি কি?" জুলিখা বলিল "তাহার উপায় আছে" বলিয়া অবজ্ঞাভরে ধীবরের সম্মুখে একটা স্বর্ণমুদ্রা ফেলিয়া দিল। আমিনা সেটা কুড়াইয়া ধীবরের হাতে তুলিয়া দিয়া চুপিচুপি কহিল "বুড়া, আর কোন কথা কহিস না, তুই কাজে যা। বেলা হইয়াছে।"

জুলিখা ছদ্মবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আমিনার সন্ধান পাইয়া কি করিয়া ধীবরের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সে সমস্ত কথা বলিতে গেলে দ্বিতীয় আর একটি কাহিনী হইয়া পড়ে। তাহার রক্ষাকর্ত্তা রহমৎ শেখ ছদ্মনামে আরাকান রাজসভায় কাজ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ছোট নদীটি বহিয়া যাইতেছিল এবং প্রথম গ্রীষ্মের শীতল প্রভাতবায়ুতে কৈলু গাছের রক্তবর্ণ পুষ্পমঞ্জরী হইতে ফুল ঝরিয়া পড়িতেছিল। গাছের তলায় বসিয়া জুলিখা আমিনাকে কহিল "ঈশ্বর যে আমাদের দুই ভগ্নীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন সে কেবল পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য। নহিলে, আর ত কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না।"

আমিনা নদীর পরপারে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী সর্ব্বাপেক্ষা ছায়াময় বনশ্রেণীর দিকে দৃষ্টি মেলিয়া ধীরে ধীরে কহিল "দিদি, আর ওসব কথা বলিস্‌নে ভাই। আমার এই পৃথিবীটা একরকম বেশ লাগিতেছে। মরিতে চায় ত পুরুষগুলো কাটাকাটি করিয়া মরুক্‌গে, আমার এখানে কোন দুঃখ নাই।"

জুলিখা বলিল "ছি ছি আমিনা, তুই কি সাহজাদার ঘরের মেয়ে! কোথায় দিল্লির সিংহাসন, আর কোথায় আরাকানের ধীবরের কুটীর!"

আমিনা হাসিয়া কহিল "দিদি, দিল্লির সিংহাসনের চেয়ে আমার বুঢ়ার এই কুটীর এবং এই কৈলু গাছের ছায়া যদি কোন বালিকার বেশি ভাল লাগে তাহাতে দিল্লির সিংহাসন একবিন্দু অশ্রুপাত করিবে না।"

জুলিখা কতকটা আনমনে কতকটা আমিনাকে কহিল "তা তোকে দোষ দেওয়া যায় না, তুই তখন নিতান্ত ছোট ছিলি। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ্ পিতা তোকে সব চেয়ে বেশি ভাল বাসিতেন বলিয়া তোকেই স্বহস্তে জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সেই পিতৃদত্ত মৃত্যুর চেয়ে এই জীবনকে বেশি প্রিয় জ্ঞান করিস্ না। তবে যদি প্রতিশোধ তুলিতে পারিস্ তবেই জীবনের অর্থ থাকে।"

আমিনা চুপ করিয়া দূরে চাহিয়া রহিল। কিন্তু বেশ বুঝা গেল সকল কথা সত্ত্বেও বাহিরের এই বাতাস এবং গাছের ছায়া, এবং আপনার নবযৌবন এবং কি একটা সুখস্মৃতি তাহাকে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "দিদি, তুমি একটু অপেক্ষা কর ভাই। আমার ঘরের কাজ বাকি আছে। আমি না রাঁধিয়া দিলে বুঢ়া খাইতে পাইবে না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জুলিখা আমিনার অবস্থা চিন্তা করিয়া ভারি বিমর্ষ হইয়া

চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় হঠাৎ ধুপ্ করিয়া একটা লম্ফের শব্দ হইল, এবং পশ্চাৎ হইতে কে একজন জুলিখার চোখ টিপিয়া ধরিল। জুলিখা ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল "কেও!" স্বর শুনিয়া যুবক চোখ ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, জুলিখার মুখের দিকে চাহিয়া অম্লানবদনে কহিল "তুমি ত তিন্নি নও।" যেন জুলিখা বরাবর আপনাকে তিন্নি বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কেবল যুবকের অসামান্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির কাছে সমস্ত চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। জুলিখা বসন সম্বরণ করিয়া দৃপ্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুইচক্ষে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি!" যুবক কহিল "তুমি আমাকে চেন না। তিন্নি জানে। তিন্নি কোথায়!" তিন্নি গোলযোগ শুনিয়া বাহির হইয়া আসিল। জুলিখার রোষ এবং যুবকের হতবুদ্ধি বিস্মিতমুখ দেখিয়া আমিনা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। কহিল "দিদি ওর কথা তুমি কিছু মনে করিয়ো না। ওকি মানুষ! ও একটা বনের মৃগ। যদি কিছু বেয়াদবী করিয়া থাকে, আমি উহাকে শাসন করিয়া দিব। দালিয়া, তুমি কি করিয়াছিলে!" যুবক তৎক্ষণাৎ কহিল "চোখ টিপিয়া ধরিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম তিন্নি। কিন্তু ও ত তিন্নি নয়।" তিন্নি সহসা দুঃসহ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া উঠিয়া কহিল "ফের! ছোট মুখে বড় কথা! কবে তুমি তিন্নির চোখ টিপিয়াছ? তোমার ত সাহস কম নয়!" যুবক কহিল "চোখ টিপিতে ত খুব বেশি সাহসের আবশ্যক করে না। বিশেষতঃ পূর্ব্বের অভ্যাস থাকিলে। কিন্তু সত্য বলিতেছি তিন্নি, আজ একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম।" বলিয়া গোপনে জুলি-

থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমিনার মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। আমিনা কহিল "না, তুমি অতি বর্ব্বর! সাহাজাদীর সম্মুখে দাঁড়াইবার যোগ্য নও। তোমাকে সহবৎ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। দেখ, এম্‌নি করিয়া সেলাম কর।" বলিয়া আমিনা তাহার যৌবনমঞ্জরিত তনুলতা অতি মধুর ভঙ্গীতে নত করিয়া জুলিখাকে সেলাম করিল। যুবক বহুকষ্টে তাহার নিতান্ত অসম্পূর্ণ অনুকরণ করিল। বলিল "এমন করিয়া তিন পা পিছু হঠিয়া আইস।" যুবক পিছু হঠিয়া আসিল। "আবার সেলাম কর।" আবার সেলাম করিল। এমনি করিয়া পিছু হঠাইয়া সেলাম করাইয়া আমিনা যুবককে কুটীরের দ্বারের কাছে লইয়া গেল। কহিল "ঘরে প্রবেশ কর।" যুবক ঘরে প্রবেশ করিল। আমিনা বাহির হইতে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল "একটু ঘরের কাজ কর। আগুনটা জাগাইয়া রাখ।" বলিয়া দিদির পাশে আসিয়া বসিল। কহিল "দিদি, রাগ করিস্‌নে ভাই, এখানকার মানুষগুলা এই রকমের। হাড় জ্বালাতন হইয়া গেছে।" কিন্তু আমিনার মুখে কিম্বা ব্যবহারে তাহার লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় না। বরং অনেক বিষয়ে এখানকার মানুষের প্রতি তাহার কিছু অন্যায় পক্ষপাত দেখা যায়। জুলিখা যথাসাধ্য রাগ প্রকাশ করিয়া কহিল "বাস্তবিক, আমিনা তোর ব্যবহারে আমি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি। একজন বাহিরের যুবক আসিয়া তোকে স্পর্শ করিতে পারে এত বড় তাহার সাহস!" আমিনা দিদির সহিত যোগ দিয়া কহিল "দেখ্‌দেখি বোন্‌! যদি কোন বাদশাহ কিম্বা নবাবের ছেলে এমন ব্যবহার করিত তবে তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া

দিতাম।” জুলিখার ভিতরের হাসি আর বাধা মানিল না—হাসিয়া উঠিয়া কহিল “সত্য করিয়া বল্ দেখি আমিনা তুই যে বলিতেছিলি পৃথিবীটা তোর বড় ভাল লাগিতেছে, সে কি ঐ বর্ব্বর যুবকটার জন্য?” আমিনা কহিল “তা সত্য কথা বলি দিদি, ও আমার অনেক উপকার করে। ফুলটা ফলটা পাড়িয়া দেয়, শীকার করিয়া আনে, একটা কিছু কাজ করিতে ডাকিলে ছুটিয়া আসে। অনেকবার মনে করি, উহাকে শাসন করিব। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। যদি খুব চোখ রাঙাইয়া বলি, দালিয়া, তোমার প্রতি আমি ভারি অসন্তুষ্ট হইয়াছি—দালিয়া মুখের দিকে চাহিয়া পরম কৌতুকে নিঃশব্দে হাসিতে থাকে। এদের দেশে পরিহাস বোধ করি এইরকম; দু'ঘা মারিলে ভারি খুসি হইয়া উঠে তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ঐ দেখ না, ঘরে পূরিয়া রাখিয়াছি বড় আনন্দে আছে, দ্বার খুলিলেই দেখিতে পাইব, মুখ চক্ষু লাল করিয়া মনের সুখে আগুনে ফুঁ দিতেছে। ইহাকে লইয়া কি করি বল ত বোন! আমি ত আর পারিয়া উঠি না।”

জুলিখা কহিল “আমি চেষ্টা দেখিতে পারি।”

আমিনা হাসিয়া মিনতি করিয়া বলিল “তোর দুটি পায়ে পড়ি বোন্! ওকে আর তুই কিছু বলিস্ না।” এমন করিয়া বলিল যেন ঐ যুবকটি আমিনার একটি বড় সাধের পোষা হরিণ, এখনো তাহার বন্য স্বভাব দূর হয় নাই—পাছে অন্য কোন মানুষ দেখিলে ভয় পাইয়া নিরুদ্দেশ হয় এমন আশঙ্কা আছে।

এমন সময় ধীবর আসিয়া কহিল “আজ দালিয়া আসে নাই তিন্নি?” “আসিয়াছে।” “কোথায় গেল?” “সে বড় উপ-

দ্রব করিতেছিল তাই তাহাকে ঐ ঘরে পুরিয়া রাখিয়াছি।” বৃদ্ধ কিছু চিন্তান্বিত হইয়া কহিল “যদি বিরক্ত করে সহিয়া থাকিস্। অল্প বয়সে অমন সকলেই দুরন্ত হইয়া থাকে। বেশি শাসন করিস্ না। দালিয়া কাল এক থলু দিয়া আমার কাছে তিনটি মাছ লইয়াছিল।” (থলু অর্থে স্বর্ণ মুদ্রা।) আমিনা কহিল “ভাবনা নাই বুঢা, আজ আমি তাহার কাছে দুই থলু আদায় করিয়া দিব, একটিও মাছ দিতে হইবে না।” বৃদ্ধ তাহার পালিত কন্যার এত অল্প বয়সে এমন চাতুরী এবং বিষয়বুদ্ধি দেখিয়া পরম প্রীত হইয়া তাহার মাথায় সস্নেহ হাত বুলাইয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আশ্চর্য্য এই, দালিয়ার আসা যাওয়া সম্বন্ধে জুলিখার ক্রমে আর আপত্তি রহিল না। ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে আশ্চর্য্য নাই। কারণ, নদীর যেমন এক দিকে স্রোত এবং আর এক দিকে কূল রমণীর সেইরূপ হৃদয়াবেগ এবং লোকলজ্জা। কিন্তু সভ্যসমাজের বাহিরে আরাকানের প্রান্তে এখানে লোক কোথায়! এখানে কেবল ঋতুপর্য্যায়ে তরু মুঞ্জরিত হইতেছে, এবং সম্মুখের নীলা নদী বর্ষায় স্ফীত, শরতে স্বচ্ছ এবং গ্রীষ্মে ক্ষীণ হইতেছে, পাখীর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে সমালোচনার লেশমাত্র নাই, এবং দক্ষিণ বায়ু মাঝে মাঝে পরপারের গ্রাম হইতে মানবচক্রের গুঞ্জনধ্বনি বহিয়া আনে কিন্তু কানাকানি আনে না। পতিত অট্টালিকার উপরে ক্রমে যেমন অরণ্য জন্মে, এখানে কিছুদিন থাকিলে সেইরূপ প্রকৃতির গোপন আক্রমণে

লৌকিকতার মানবনির্ম্মিত দৃঢ় ভিত্তি ক্রমে অলক্ষিতভাবে ভাঙ্গিয়া যায় এবং চতুর্দ্দিকে প্রাকৃতিক জগতের সহিত সমস্ত একাকার হইয়া আসে। দুটি সমযোগ্য নরনারীর মিলনদৃশ্য দেখিতে রমণীর যেমন সুন্দর লাগে এমন আর কিছু নয়। এত রহস্য, এত সুখ, এত অতলস্পর্শ কৌতূহলের বিষয় তাহার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব এই বর্ব্বর কুটীরের মধ্যে নির্জ্জন দারিদ্র্যের ছায়ায় যখন জুলিখার কুলগর্ব্ব এবং লোকমর্য্যাদার ভাব আপনিই শিথিল হইয়া আসিল তখন পুষ্পিত কৈলুতরুচ্ছায়ে আমিনা এবং দালিয়ার মিলনের এই এক মনোহর খেলা দেখিতে তাহার বড় আনন্দ হইত। বোধ করি তাহারও তরুণ হৃদয়ের একটা অপরিতৃপ্ত আকাঙ্খা জাগিয়া উঠিত এবং তাহাকে সুখে দুঃখে চঞ্চল করিয়া তুলিত। অবশেষে এমন হইল কোন দিন যুবকের আসিতে বিলম্ব হইলে আমিনা যেমন উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত, জুলিখাও তেমনি আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিত এবং উভয়ে একত্র হইলে, চিত্রকর নিজের সদ্য-সমাপ্ত ছবি ঈষৎ দূর হইতে যেমন করিয়া দেখে, তেমনি করিয়া সস্নেহে সহাস্যে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত। কোন কোন দিন মৌখিক ঝগড়াও করিত, ছল করিয়া ভৎ‍র্সনা করিত, আমিনাকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া যুবকের মিলনাবেগ প্রতিহত করিত।

সম্রাট এবং আরণ্যের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। উভয়ে স্বাধীন, উভয়েই স্বরাজ্যের একাধিপতি, উভয়কেই কাহারো নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় না। উভয়ের মধ্যেই প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক বৃহত্ত্ব এবং সরলতা আছে। যাহারা মাঝারি, যাহারা

দিনরাত্রি লোকশাস্ত্রের অক্ষর মিলাইয়া জীবন যাপন করে তাহারাই কিছু স্বতন্ত্র গোচের হয়। তাহারাই বড়র কাছে দাস, ছোটর কাছে প্রভু, এবং অস্থানে নিতান্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়ায়। বর্ব্বর দালিয়া প্রকৃতি-সাম্রাজ্ঞীর উচ্ছৃঙ্খল ছেলে, শাহজাদীর কাছে কোন সঙ্কোচ ছিল না, এবং শাহজাদীরাও তাহাকে সমকক্ষ লোক বলিয়া চিনিতে পারিত। সহাস্য, সরল, কৌতুকপ্রিয়, সকল অবস্থাতেই নির্ভীক, অসঙ্কুচিত, তাহার চরিত্রে দারিদ্র্যের কোন লক্ষণই ছিল না।

কিন্তু এই সকল খেলার মধ্যে এক একবার জুলিখার হৃদয়টা হায় হায় করিয়া উঠিত, ভাবিত সম্রাট্‌পুত্রীর জীবনের এই কি পরিণাম! একদিন প্রাতে দালিয়া আসিবামাত্র জুলিখা তাহার হাত চাপিয়া কহিল "দালিয়া, এখানকার রাজাকে দেখাইয়া দিতে পার?" "পারি। কেন বল দেখি?" "আমার একটা ছোরা আছে তাহার বুকের মধ্যে বসাইতে চাহি!" প্রথমে দালিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গেল তাহার পরে জুলিখার হিংসা-প্রখর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল; যেন এত বড় মজার কথা সে ইতিপূর্ব্বে কখনও শোনে নাই—যদি পরিহাস বল ত এই বটে, রাজপুত্রীর উপযুক্ত। কোন কথা নাই বার্ত্তা নাই প্রথম আলাপেই একখানি ছোরার আধখানা একটা জীবন্ত রাজার বক্ষের মধ্যে চালনা করিয়া দিলে এইরূপ শিষ্টাচারে রাজাটা হঠাৎ কিরূপ অবাক্ হইয়া যায় সেই চিত্র ক্রমাগত তাহার মনে উদিত হইতে লাগিল, এবং তাহার নিঃশব্দ কৌতুক হাসি থাকিয়া থাকিয়া উচ্চহাস্যে পরিণত হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তাহার পরদিনেই রহমৎশেখ জুলিখাকে গোপনে পত্র লিখিল যে, আরাকানের নূতন রাজা ধীবরের কুটীরে দুই ভগ্নীর সন্ধান পাইয়াছেন, এবং গোপনে আমিনাকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। তাহাকে বিবাহার্থে অবিলম্বে প্রাসাদে আনিবার আয়োজন করিতেছেন। প্রতিহিংসার এমন সুন্দর অবসর আর পাওয়া যাইবে না। তখন জুলিখা দৃঢ়ভাবে আমিনার হাত ধরিয়া কহিল "ঈশ্বরের ইচ্ছা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। আমিনা, এইবার তোর জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিবার সময় আসিয়াছে, এখন আর খেলা ভাল দেখায় না।" দালিয়া উপস্থিত ছিল, আমিনা তাহার মুখের দিকে চাহিল, দেখিল সে সকৌতুকে হাসিতেছে। আমিনা তাহার হাসি দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া কহিল "জান দালিয়া, আমি রাজবধূ হইতে যাইতেছি।" দালিয়া হাসিয়া বলিল "সে ত বেশিক্ষণের জন্য নয়।" আমিনা পীড়িত বিস্মিত চিত্তে মনে মনে ভাবিল—বাস্তবিকই এ বনের মৃগ, এর সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করা আমারই পাগ্‌লামী। আমিনা দালিয়াকে আর একটু সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য কহিল "রাজাকে মারিয়া আর কি আমি ফিরিব!" দালিয়া কথাটা সঙ্গত জ্ঞান করিয়া কহিল "ফেরা কঠিন বটে।" আমিনার সমস্ত অন্তরাত্মা একেবারে ম্লান হইয়া গেল। জুলিখার দিকে ফিরিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "দিদি, আমি প্রস্তুত আছি।" এবং দালিয়ার দিকে ফিরিয়া বিদ্ধ অন্তরে পরিহাসের ভাণ করিয়া কহিল "রাণী হইয়াই আমি প্রথমে তোমাকে রাজার বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়া অপরাধে শাস্তি দিব তার পরে আর যাহা করিতে হয় করিব।" শুনিয়া দালিয়া বিশেষ কৌতুক বোধ করিল, যেন প্রস্তাবটা কার্য্যে পরিণত হইলে তাহার মধ্যে অনেকটা আমোদের বিষয় আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অশ্বারোহী পদাতিক নিশান হস্তী বাদ্য এবং আলোকে ধীবরের ঘর দুয়ার ভাঙ্গিয়া পড়িবার যো হইল। রাজপ্রাসাদ হইতে স্বর্ণমণ্ডিত দুই শিবিকা আসিয়াছে। আমিনা জুলিখার হাত হইতে ছুরিখানি লইল। তাহার হস্তিদন্তনির্ম্মিত কারুকার্য্য অনেক ক্ষণ ধরিয়া দেখিল। তাহার পর বসন উদ্‌ঘাটন করিয়া নিজের বক্ষের উপর একবার ধার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। জীবনমুকুলের বৃন্তের কাছে ছুরিটি একবার স্পর্শ করিল, আবার সেটি খাপের মধ্যে পূরিয়া বসনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। একান্ত ইচ্ছা ছিল এই মরণ-যাত্রার পূর্ব্বে একবার দালিয়ার সহিত দেখা হয়, কিন্তু কাল হইতে সে নিরুদ্দেশ। দালিয়া সেই যে হাসিতেছিল তাহার ভিতরে কি অভিমানের জ্বালা প্রচ্ছন্ন ছিল? শিবিকায় উঠিবার পূর্ব্বে আমিনা তাহার বাল্যকালের আশ্রয়টি অশ্রুজলের ভিতর হইতে একবার দেখিল, তাহার সেই ঘরের গাছ, তাহার সেই ঘরের নদী। ধীবরের হাত ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কম্পিতস্বরে কহিল "বুঢ়া তবে চলিলাম। তিন্নি গেলে তোর ঘরকন্না কে দেখিবে!" বুঢ়া একেবারে বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল। আমিনা কহিল "বুঢ়া, যদি দালিয়া আর এখানে আসে, তাহাকে এই আংটি দিয়ো। বলিয়ো, তিন্নি যাই-

বার সময় দিয়া গেছে।” এই বলিয়াই দ্রুত শিবিকায় উঠিয়া পড়িল। মহা সমারোহে শিবিকা চলিয়া গেল। আমিনার কুটীর, নদীতীর, কৈলুতরুতল অন্ধকার নিস্তব্ধ জনশূন্য হইয়া গেল।

যথাকালে শিবিকাদ্বয় তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। দুই ভগ্নী শিবিকা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। আমিনার মুখে হাসি নাই, চোখেও অশ্রুচিহ্ন নাই। জুলিখার মুখ বিবর্ণ। কর্ত্তব্য যতক্ষণ দূরে ছিল ততক্ষণ তাহার উৎসাহের তীব্রতা ছিল—এখন সে কম্পিত হৃদয়ে ব্যাকুল স্নেহে আমিনাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল, মনে মনে কহিল নব প্রেমের বৃন্ত হইতে ছিন্ন করিয়া এই ফুটন্ত ফুলটিকে কোন্ রক্তস্রোতে ভাসাইতে যাইতেছি। কিন্তু তখন আর ভাবিবার সময় নাই। পরিচারিকাদের দ্বারা নীত হইয়া শত সহস্র প্রদীপের অনিমেষ তীব্রদৃষ্টির মধ্য দিয়া দুই ভগ্নী স্বপ্নাহতের মত চলিতে লাগিল, অবশেষে, বাসরঘরের দ্বারের কাছে মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া আমিনা জুলিখাকে কহিল “দিদি!” জুলিখা আমিনাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া চুম্বন করিল।

উভয়ে ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। রাজবেশ পরিয়া ঘরের মাঝখানে মছলন্দ শয্যার উপর রাজা বসিয়া আছেন। আমিনা সসঙ্কোচে দ্বারের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া রহিল। জুলিখা অগ্রসর হইয়া রাজার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল রাজা নিঃশব্দে সকৌতুকে হাসিতেছেন। জুলিখা বলিয়া উঠিল “দালিয়া!” আমিনা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। দালিয়া উঠিয়া তাহাকে আহত পাখীটির মত কোলে করিয়া তুলিয়া শয্যায় লইয়া গেল।

আমিনা সচেতন হইয়া বুকের মধ্যে হইতে ছুরিটি বাহির করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিল, দিদি দালিয়ার মুখের দিকে চাহিল, দালিয়া চুপ করিয়া হাস্যমুখে উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল, ছুরিও তাহার খাপের মধ্য হইতে একটুখানি মুখ বাহির করিয়া এই রঙ্গ দেখিয়া ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

কর্ম্মের উমেদার।

প্রকাণ্ড পিয়ানো অথবা বৃহদাকার অর্গান্ যন্ত্র সঙ্গে না থাকিলে য়ুরোপীয় সঙ্গীত সম্পূর্ণ হয় না—য়ুরোপীয় সংসার-যাত্রাও তেমনি স্তূপাকার সামগ্রীর উপর নির্ভর করে। শোওয়া, বসা, চলাফেরা, অশন, বসন, ভূষণ সকল দিকেই তাহাদের এত সহস্র সরঞ্জামের সৃষ্টি হইয়াছে যে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে গেলে অবাক্ হইতে হয়। একটা শামুকের পিঠে কতটুকুই বা খোলা, কিন্তু মানুষের আস্‌বাবের খোলষ্ প্রতিদিন পর্ব্বতাকার হইয়া উঠিতেছে।

মানুষও সেই পরিমাণে সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেছে কি না সেই একটা জিজ্ঞাস্য আছে। একটা রোগ আছে তাহাতে মানুষের খাদ্যের অধিকাংশই চর্ব্বিতে পরিণত করে। অস্থি, মাংসপেশী, স্নায়ু অনুরূপ মাত্রায় খাদ্য পায় না কেবল শরীরের পরিধি বিপুল হইয়া উঠিতে থাকে। সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তে এরূপ অতিরিক্ত আংশিক উদ্যমকে কেহ কল্যাণজনক মনে করিতে পারে না। ডাক্তাররা বলেন এরূপ বিপরীত বসাগ্রস্ত হইলে

হৃৎপিণ্ডের বিকার (Fatty degeneration of heart) ঘটিতে পারে এবং মস্তিষ্কের পক্ষেও এরূপ অবস্থা অনুকূল নহে।

য়ুরোপীয় সভ্যতাও কি সেইরূপ বেশি মাত্রায় বহরে বাড়িয়া উঠিতেছে, এবং জিনিষ পত্রের প্রকাণ্ড চাপে তাহার হৃদয় এবং বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাকৃত অকর্ম্মণ্য হইবার উপক্রম হইয়াছে, অথবা তাহা দৈত্যের মত সর্ব্বাংশেই বিপুলতা লাভ করিতেছে এবং অন্যের পক্ষে যাহা অত্যধিক তাহার পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক পরিমাণ, ইহার মীমাংসা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে, এবং সে চেষ্টাও বিদেশীর পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র।

কিন্তু সভ্যতার অসংখ্য আস্‌বাব যোগাইয়া ওঠা দিন দিন অসামান্য চেষ্টাসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। কল বাড়িতেছে এবং মানুষও কলের মত খাটিতেছে। যত শস্তায় যত বেশি জিনিষ উৎপন্ন করা যাইতে পারে সকলের এই প্রাণপণ চেষ্টা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহাই একান্ত চেষ্টা হইলে মানুষকে ক্রমে আর মানুষ জ্ঞান হয় না, কলেরই একটা অংশ মনে হয়, এবং তাহার নিকট হইতে যতদূর সম্ভব জিনিষ আদায় করিয়া লইতে প্রবৃত্তি হয়। তাহার সুখ দুঃখ শ্রান্তি বিশ্রামের প্রতি অধিক মনোযোগ করিলে অচল হইয়া উঠে।

য়ুরোপে এইরূপ অবস্থা উত্তরোত্তর গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। লোহার কলের সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাংসের মানুষকে সমান খাটিতে হইতেছে। কেবল বণিক্ সম্প্রদায় লাভ করিতেছেন এবং ধনী সম্প্রদায় আরামে আছেন।

কিন্তু য়ুরোপের মানুষকে যন্ত্রের তলায় পিষিয়া ফেলা সহজ ব্যাপার নহে। কোন প্রবল শক্তি কিছুদিন আমাদের মাথার

উপর চাপ দিলেই আমরা ধূলির মত গুঁড়াইয়া সকলে মিলিয়া একাকার হইয়া যাই ; তা' সে ব্রহ্মণ্য শক্তিই হৌক্ আর রাজন্য শক্তিই হৌক্, শাস্ত্রই হৌক্ আর শস্ত্রই হৌক্। য়ুরোপীয় প্রকৃতি কিছু দিন এরূপ উপদ্রব সহ্য করিয়া অবশেষে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। যেখানে যে কারণেই হৌক্ যখনি তাহার মনুষ্যত্বের উপর বন্ধন আঁট হইয়া আসে তখনি সে অধীর হইয়া উঠিয়া তাহা ছিন্ন করিবার চেষ্টা করে—সে ধর্ম্মের বন্ধনই হৌক্ আর কর্ম্মের বন্ধনই হৌক্।

য়ুরোপের মনুষ্যত্ব এইরূপ জীবন্ত এবং প্রবল থাকাতেই সহজে কোন বিকারের আশঙ্কা হয় না। কোনরূপ বাড়াবাড়ি ঘটিলেই আপনিই তাহার সংশোধনের চেষ্টা জাগিয়া উঠে। রাজা প্রজার স্বাধীনতায় একান্ত হস্তক্ষেপ করিলে যথাসময়ে রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটিয়া উঠে—শাস্ত্র ও পুরোহিত ধর্ম্মের ছদ্মবেশে মানবের স্বাধীন বুদ্ধিকে শৃঙ্খলিত করিবার চেষ্টা করিলে ধর্ম্মবিপ্লব উপ-স্থিত হয়। এইরূপে, মানুষ যেখানে স্বাধীন এবং স্বাধীনতাপ্রিয় সেখানে সত্বরই হৌক্ বিলম্বেই হৌক্ সংশোধনের পথ মুক্ত আছে। সেখানে রোগ আরম্ভ হইলে একেবারে মৃত্যুতে গিয়া শেষ হয় না। যাহারা আপনার ধর্ম্মবুদ্ধি এবং সংসারবুদ্ধি, দেহ এবং মনের প্রত্যেক স্বাধীনতাই বহুদিন হইতে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া জড়বৎ বসিয়া আছে, গ্রন্থবৎ আচার পালন করি-তেছে, তাহাদের মধ্যে কোন একটা নূতন বিপৎপাত হইলে স্বাধীন প্রতিকারচেষ্টা প্রবল হইয়া উঠে না, উত্তরোত্তর তাহার চরম ফল ফলিতে থাকে—জ্বর আরম্ভ হইলে বিকারে গিয়া দাঁড়ায়।

অতএব আমাদের দেশে যদি অতিরিক্ত যন্ত্রচালনার প্রাদুর্ভাব হইত তবে তাহার পরিণামফল কি হইত বলা শক্ত নহে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে খুব বেশি পরিবর্ত্তন হইত না। কারণ আমাদের মানসিক রাজ্যে আমরা যন্ত্রের রাজত্বই বহন করিয়া আসিতেছি। কি খাইব, কি করিয়া খাইব, কোথায় বসিব, কাহাকে ছুঁইব জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে, এবং দানধ্যান তপজপ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে আমরা এমনি বাঁধা নিয়মে চলিয়া আসিয়াছি যে, মন হইতে স্বাধীনতার অঙ্কুর পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে—স্বাধীন ভাবে চিন্তাও করিতে পারি না স্বাধীনভাবে কার্য্যও করিতে পারি না। আকস্মিক ঘটনাকে দৈব ঘটনা বলিয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া তাকাইয়া থাকি। প্রবল শক্তিমাত্রকেই অনিবার্য্য দৈবশক্তি জ্ঞান করিয়া বিনা বিরোধে তাহার পদতলে আত্মসমর্পণ করি। য়ুরোপে গুটিপোকার মড়ক হইলে, দ্রাক্ষা কীটগ্রস্ত হইলে তাহারও প্রতিবিধানের চেষ্টা হয়, আমাদের দেশে ওলাউঠা এবং বসন্তকে আমরা পূজা করিয়া মরি।

স্বাধীন বুদ্ধির চোখ বাঁধিয়া তুলা দিয়া তাহার নাসা কর্ণ রোধ করিয়া আমরাও সম্প্রতি এইরূপ পরম আধ্যাত্মিক অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। অন্তরে যখন এইরূপ পরিপূর্ণ অধীনতা বাহিরে তখন স্বাধীনতা কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারে না।

অতএব যদি মজুরের আবশ্যক হয় ত আমাদের মত কলের মজুর আর নাই।

য়ুরোপের মজুররা প্রতিদিন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে। আমাদের কাছে যে কথা নূতন ঠেকিবে তাহারা সেই কথা উত্থা-

পিত করিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, মজুর হই আর যাই হই আমরা মানুষ। আমরা যন্ত্র নই। আমরা দরিদ্র বলিয়াই যে প্রভুরা আমাদের সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন তাহা হইতে পারে না, আমরা ইহার প্রতিকার করিব। আমাদের বেতন বৃদ্ধি কর, আমাদের পরিশ্রম হ্রাস কর, আমাদের প্রতি মানুষের ন্যায় আচরণ কর।

যন্ত্ররাজের বিরুদ্ধে যন্ত্রীগণ এইরূপে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা প্রচার করিতেছে।

য়ুরোপে রাজা এবং ধর্ম্মের যথেচ্ছ প্রভুত্ব শিথিল হইয়া ধনের প্রভুত্ব বলীয়ান হইয়া উঠিতেছিল। সারসরাজা ধরিয়া খায়, কাষ্ঠরাজা চাপিয়া মারে। য়ুরোপ পূর্ব্বেই সারসরাজার চঞ্চু বাঁধিয়া দিয়াছে এবারে জড়রাজার সহিত লাঠালাঠি বাধাইবার উপক্রম করিয়াছে।

ধনের অধীনতার একটা সীমা ছিল সেই পর্য্যন্ত মানুষ সহ্য করিয়াছিল। শিল্পীর একটা স্বাধীনতা আছে। শিল্পনৈপুণ্য তাহার নিজস্ব। তাহার মধ্যে নিজের প্রতিভা খেলাইতে পারে এমন স্থান আছে। শক্তি অনুসারে সে আপন কাজে গৌরব অর্জ্জন করিতে সক্ষম। নিজের হাতের কাজ নিজে সম্পূর্ণ করিয়া সে একটি স্বাধীন সন্তোষ লাভ করিতে পারে।

কিন্তু যন্ত্র সকল মানুষকেই ন্যূনাধিক সমান করিয়া দেয়। তাহাতে স্বাধীন নৈপুণ্য খাটাইবার স্থান নাই। জড়ের মত কেবল কাজ করিয়া যাইতে হয়।

এইরূপে সমাজে ধনী সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নির্দ্ধন একান্ত পরাধীন হইয়া পড়ে। এমন কি, সে যে কাজ করে যে কাজের

মধ্যেও তাহার স্বাধীনতা নাই। পেটের দায়ে সে পৃথিবীর লোকসংখ্যার অন্তর্গত না হইয়া যন্ত্রসংখ্যার মধ্যে ভুক্ত হয়। পূর্ব্বে যাহারা শিল্পী ছিল এখন তাহারা মজুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে যাহারা ওস্তাদ কারীকরের অধীনে কাজ করিত এখন তাহারা বৃহৎ যন্ত্রের অধীনে কাজ করে।

ইহাতেই নির্দ্ধনের আন্তরিক অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে—তাহার কাজের সুখ নাই। সে আপনার মনুষ্যত্ব খাটাইতে পারে না।

বিলাসী রোম এক সময়ে অসভ্য বিদেশীকে আপনাদের সেনা-রূপে নিযুক্ত করিয়াছিল। য়ুরোপের শূদ্রদল যদি বিদ্রোহী হইয়া কখনও কর্ম্মে জবাব দেয়, পূর্ব্ব হইতে জানাইয়া রাখা ভাল আমরা উমেদার আছি।

আমরা কলের কাজ করিবার জন্য একেবারে কলে তৈয়ারি হইয়াছি। মনু পরাশর ভৃগু নারদ সকলে মিলিয়া আমাদের আত্মকর্ত্তৃত্ব চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, পশুর মত নিজের স্বাভাবিক চক্ষুতে ঠুলি পরিয়া পরের রাশ মানিয়া কি করিয়া চলিতে হয় বহুকাল হইতে তাহা তাঁহারা শিখাইয়াছেন, এখন আমাদি-গকে যন্ত্রে জুতিয়া দিলেই হইল। শরীর কাহিল বটে, যন্ত্রের তাড়নায় প্রাণান্ত হইতে পারে কিন্তু কখনো বিদ্রোহী হইব না। কখনো এমন স্বপ্নেও মনে করিব না, যে, স্বাধীন চেষ্টার দ্বারা আমাদের এ অবস্থার কোন প্রতিকার হইতে পারে।

কর্ম্মে আমাদের অনুরাগ নাই। বৈরাগ্যমন্ত্র কানে দিয়া সেটুকু জীবন-লক্ষণও আমাদের রাখা হয় নাই। কিন্তু তাহাতে কলের কাজের কোন ব্যাঘাত হইবে না বরং সুবিধা হইবে।

কেন না কর্ম্মে যাহাদের প্রকৃত অনুরাগ আছে তাহারা সহিষ্ণুতা সহকারে কলের কাজ করিতে পারে না। কারণ, যাহারা কর্তৃত্ব অনুভব করিয়া সুখ পায় তাহারাই কর্ম্মের অনুরাগী। উদ্দেশ্য সাধনের উপলক্ষে বাধা অতিক্রম করিয়া একটা কার্য্য সমাধা-পূর্ব্বক তাহারা আপনারই স্বাধীনতা উপলব্ধি করে, সেই তাহাদের আনন্দ। কিন্তু সেরূপ কর্ম্মানুরাগী লোক কলের কাজ করিয়া সুখী হয় না—কারণ কলের কাজে কেবল কাজের দুঃখ আছে অথচ কাজের সুখটুকু নাই। তাহাতে স্বাধীনতা নাই। কোন কর্ম্মপ্রিয় লোক ঘানির গোরু কিম্বা স্যাক্‌রা গাড়ির ঘোড়া হইতে চাহে না। কিন্তু যাহার কর্ম্মে অনুরাগ দূর হইয়া গেছে তাহাকে এরূপ কাজে লাগাইলে ললাটের লিখন স্মরণ করিয়া বিনা উপদ্রবে সে কাজ করিয়া যায়।

মাঝে ইংরাজি শিক্ষায় আমাদের মনে ঈষৎ চাঞ্চল্য আনয়ন করিয়াছিল। বহুদিবসের পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গের মনে মুক্ত আকাশ এবং স্বাধীন নীড়ের কথা উদয় হইয়াছিল কিন্তু আমাদের জ্ঞানী লোকেরা সম্প্রতি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন এরূপ চাঞ্চল্য পবিত্র হিন্দুদিগকে শোভা পায় না। তাঁহারা উপদেশ দেন অদৃষ্টবাদ অতি পবিত্র, কারণ তাহাতে স্বাধীন চেষ্টাকে যথাসম্ভব দূর করিয়া দেয়। সর্ব্ব বিষয়ে শাস্ত্রানুশাসন অতি পবিত্র, কারণ, তাহাতে স্বাধীন বুদ্ধিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখে। আমাদের যাহা আছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র, কারণ, এ কথা স্মরণ রাখিলে স্বাধীন বুদ্ধি এবং স্বাধীন চেষ্টাকে একেবারেই জবাব দেওয়া যাইতে পারে। বোধ হয় এই সকল জ্ঞানগর্ভ কথা সাধারণের খুব হৃদয়গ্রাহী হইবে, বহুকাল হইতে হৃদয় এই ভাবেই প্রস্তুত হইয়া আছে।

যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে যন্ত্র যতই সম্পূর্ণ হইবে তাহা চালনা করিতে মানুষের বুদ্ধির আবশ্যক ততই হ্রাস হইয়া আসিবে, এবং স্বাধীনবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের পক্ষে সে কাজ ততই অসহ্য হইয়া উঠিবে—আশা আছে, ভারতবর্ষীয়দের বিশেষ উপ-যোগিতা তখনি য়ুরোপ বুঝিতে পারিবে। যাহারা মান্ধাতার আমলের লাঙ্গলে চাষ করিতেছে, যাহারা মনুর আমলের ঘানিতে তেল বাহির করিতেছে, যাহারা, যেখানে পড়ে সেইখানে পড়িয়া থাকাকেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ গৌরবের বিষয় বলিয়া গর্ব্ব করে আবশ্যক হইলে তাহারাই সহিষ্ণুভাবে নতশিরে সমস্ত য়ুরোপের কল টানিতে পারিবে। যদি বরাবর পবিত্র আর্য্য-শিক্ষাই জয়ী হয় তবে আমাদের প্রপৌত্রদিগের চাকরির জন্য বোধ হয় আমাদের পৌত্রদিগকে অধিক ভাবিতে হইবে না।

মায়ার খেলা।

(স্বরলিপি।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নব যৌবন বিকাশে গ্রন্থের নায়ক অমর সহসা হৃদয়ের মধ্যে এক অপূর্ব্ব আকাঙ্খা অনুভব করিতেছে। সে উদাসভাবে জগতে আপন মানসী মূর্ত্তির অনুরূপ প্রতিমা খুঁজিতে বাহির হইতেছে। এদিকে, শান্তা আপন প্রাণ-মন অমরকেই সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু চিরদিন নিতান্ত নিকটে থাকাতে শান্তার প্রতি অমরের প্রেম জন্মিতে অবসর পায় নাই। অমর শান্তার হৃদয়ের ভাব না বুঝিয়া চলিয়া গেল। মায়াকুমারীগণ পরিহাসচ্ছলে গাহিল—

কাছে আছে দেখিতে না পাও
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।

গৃহ।

গমনোন্মুখ অমর। শান্তার প্রবেশ।

ইমন কল্যাণ—একতালা।

শান্তা। পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে,
ওগো যাও, কোথা যাও!
সুখে ঢলঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে
তুমি চাও কারে চাও!
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়,
কোথা পড়ে আছে ধরণী!
মায়ার তরণী বহিয়া যেন গো
মায়াপুরী পানে ধাও!
কোন্ মায়াপুরী পানে ধাও!

মিশ্র বাহার—কাওয়ালি।

অমর। জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত!
নবীন বাসনা ভরে
হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হল জীবন্ত!
সুখ-ভরা এ ধরায়
মন বাহিরেতে চায়,

কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে!
তাহারে খুঁজিব দিক্-দিগন্ত!

মায়াকুমারীগণের প্রবেশ।

কাফি—খেম্‌টা।

সকলে। কাছে আছে দেখিতে না পাও!
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও!

মিশ্র বাহার—কাওয়ালি।

অমর (শান্তার প্রতি)। যেমন দখিণে বায়ু ছুটেছে!
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে!
তেমনি আমিও সখি যাব,
না জানি কোথায় দেখা পাব!
কার সুধাস্বর মাঝে
জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে!
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত!
তাহারে খুঁজিব দিক্ দিগন্ত!

(প্রস্থান)।

কাফি—খেম্‌টা।

মায়াকুমারীগণ। কাছে আছে দেখিতে না পাও।
(নেপথ্যে চাহিয়া) তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও?
মনের মত কারে খুঁজে মর,

সে কি আছে ভুবনে!
সে যে রয়েছে মনে!
ও গো মনের মত সেই ত হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও!
তোমার আপনার যে জন
দেখিলে না তারে।
তুমি যাবে কার দ্বারে?
যারে চাবে তারে পাবে না,
যে মন তোমার আছে যাবে তাও!

ইমন কল্যাণ—একতালা।

৩।৩
|

। র্সা র্সা না। ধা পা পা। হ্মা পা হ্মপা। গা গা গমা।
। প থ হা। রা, তু মি। প থি ক। যে ন গো।

। রা গা রা। গা -মা মা। গা -া রা-। {-া সা সা।
। সু খে র। কা — ন। নে, — —। {— ও গো।

। সা -ধ্া -া-। -া সা রা। পা -গা -া-। -া ধা পা।
। যা — ও। — কো থা। যা — ও। — ও গো।

। গা -রা -া-। -া সা পা। গা -া -া॥। সা ধ্া সা।
। যা ও —। — কো থা। যা — ও। সু খে, চ।

। সা সা রা। গা গা গা। পা পা রা। রা গা পা।
। ল, চ ল। বি ব শ। বি ভ ল। পা গ ল।

। ধা-নধা না। র্সা -া -া। -া ধা পা। গা রা -া।
। ন — য়। নে, — —। — তু মি। চা ও —।

। -া সা রা। পা গা -া। -া ধা পা। গা রা -া।
। —কা রে। চা ও —। — তু মি। চা ও —।

। -া সা পা। গা -া -া। পা পা র্সা। র্সা র্সা র্সনা।
। — কা রে। চা — ও। কো থা, গে। ছে, ত ব।

। ধা না ধা। পা পা রা। রা রা গরা। গা মা মা।
। উ দা স। হৃ দ য়। কো থা, প। ড়ে, আ ছে।

। গা -া রা। সা -া -া। র্সা র্গা র্রা। র্সা না র্সা।
। ধ — র। ণী, — —। মা য়া র। ভ র ণী।

। না র্রা র্সা। না ধা পা। ক্ষা না ধা। পা ক্ষা পা।
। বা হি য়া। যে ন গো। মা য়া, পু। রী, পা নে।

। গা রা -া। -া পা ক্ষা। পা না ধা। পা ক্ষা পা।
। ধা ও —। —কো ন। মা য়া, পু। রী, পা নে।

। গা -রা -া} ॥ ॥
। ধা — ও} ॥ ॥

মিশ্র বাহার কাওয়ালি।

৪ + ২

॥ সা -া সা ন্রা। রা রা রা গা। মা পক্ষা -পা মগা।
॥ আ জ কি, প্র। থ ম, এ ল। ব স — ন্ত।

। রা পক্ষা পা -া ॥ ধা -া ধা ধর্সা। র্সঞা ঞা ধা পা।
। জী ব নে — ॥ আজ কি, প্র। থ ম, এ ল।

। পা সা -া ন্সা। রা পক্ষা পা -া ॥ মগা গা গা গা।
। ব স — ন্ত। (জী ব নে —)॥ ন বী ন, বা।

। গমা গমপা পা পা। মা পা মা গমা। রগা রমা মা মা।
। স না, ভ রে। হৃ দ য়, কে। ম ন, ক রে।

। গমা পনা না না। নর্সা নধা পধা পক্ষা। ক্ষা পক্ষা -পা মগা।
। ন বী ন, জী। ব নে, হ ল। জী ব — স্ত।

। রা পক্ষা পা -া ॥ সা মা গা গক্ষা। ক্ষা পক্ষা পা -া।
। (জী ব নে —)॥ সু খ ভ রা। এ ধ রা য়।

। ক্ষা পা ধা ধা। ধপা ধা র্সঞা -া। ধা পা ক্ষধা পা।
। ম ন, বা হি। রি তে, চা য়। কা হা রে, ব।

। মগা রসা রা গা। ক্ষা পক্ষা পা -ক্ষধা। পা মা গা রা।
। সা তে, চা য়। হৃ দ য়ে —। কা হা রে, ব।

। রগা সা রা গা। ক্ষা পক্ষা পা -া। সা ন্া সা ন্া।
। সা তে, চা য়। হৃ দ য়ে —। তা হা রে, খুঁ।

। সা রা গা মা। পা ধপা -ধা ঞধা। পা ধক্ষা পা -া ॥
। জি ব, দি ক। দি গ — ন্ত। (জী ব নে —)॥

। সা সা সা সা। সা সা সা সা। সা ন্রা রা -া।
। যে ম ন, দ। খি ণে, বা যু। ছু টে ছে —।

। র্রা র্রা র্রা রা । র্রা -া ন্া সা। র্রা সগা গা -া।
। কে জা নে, কো। থা য়, ফু ল। ফু টে ছে —।

। গা গা গা গা। গা গা গা মা। ক্মা -পা পা -া।
। তে ম নি, আ। মি ও, স খি। যা — ব —।

। ক্মা পা ধপা ধা। র্সঞ্রা -া ধা পা। ক্মপা-ক্মপা মা -গা।
। না জা নি, কো। থা য় দে খা। পা — ব —।

। সা মা গা গমা। ক্মা পক্মা পা পা। পক্মা পা ধা পা।
। কা র সু ধা। স্ব র মা ঝে। জ গ তে র।

। সা -া মা -গা। গা -সা মা -গা। গা মা পা ধা।
। গী — ত —। বা — জে —। প্র ভা ত, জা।

। ঞ্ধা -পধা পা -ধপা। -মা -পা মা গা। রগা রমা মা -া।
। গি — ছে —। — — কা র। ন য় নে —।

। মা মা মা মা। গা গা রা সা। সা ন্সা -রা রা।
। কা হা র, প্রা। ণে র, প্রে ম। অ ন — ন্ত।

। ন্া সা রা গা। মা পা গা মা। পা ধপা -ধা ঞ্ধা॥
। তা হা রে, খুঁ। জি ব, দি গ। দি গ — ন্ত॥

। পা ধক্মা পা -া ॥ ॥
। (জী ব নে —) ॥ ॥

কাফি—খেমটা।

॥ সা সা -া। রা রা -জ্ঞা। রা রা -গা। মা ম্মা -া।
॥ কা ছে —। আ ছে —। দে খি —। তে, না —।

হ'তে থাকে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য নববধূর মত নানা নূতন ভাবে ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করে, পুলকিত দেহ তার আদরের স্পর্শ প্রত্যেক রোমকূপের দ্বারা যেন শোষণ করে' পান করতে থাকে।

সকল প্রকার সন্ধিস্থলের মধ্যেই একটা বিশেষ সৌন্দর্য্য আছে। দিনের মধ্যে যেমন উষা এবং সন্ধ্যা। বাল্য ও যৌবনের বয়ঃসন্ধিকাল কবি বিদ্যাপতি সমধিক আগ্রহের সহিত বর্ণনা করেচেন। প্রবাদ আছে সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। এবং অনেকে বলে' থাকেন ধনের চেয়ে স্বচ্ছলতার মধ্যে বেশি আনন্দ আছে। সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যের চেয়ে রোগ ও স্বাস্থ্যের মধ্যবর্ত্তী-কালে একটু বিশেষ সুখ আছে।

আজ কেদারায় পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে' বসে' এর একটা তত্ত্ব-নির্ণয় করেচি। ধনই বল, সুখই বল স্বাস্থ্যই বল, তারা আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত। প্রতিদিনের সংসার যাতে চলে তার চেয়ে বেশি যার নেই তাকে আমরা ধনী বলি নে। সন্তোষ এবং সুখের মধ্যেও প্রভেদ এই যে, একটি হচ্চে যথেষ্ট, আর একটি হচ্চে তারো বেশি। এবং দেহধারণের পক্ষে যতটা আবশ্যক স্বাস্থ্য তার চেয়ে অনেক অধিক।

এই অতিরিক্ত সঞ্চয় হাতে থাকাতে আমরা কতকগুলি সুখ থেকে বঞ্চিত হই। প্রাত্যহিক অভাব প্রত্যহ মোচনের সুখ ধনী জানে না। তার চেয়ে ঢের বেশি অভাব মোচন না হলে ধনীর মনে তৃপ্তির উদয় হয় না। সুখের উত্তেজনায় যার রক্ত ফুটে উঠেছে, জগতের শত সহস্র সহজ আনন্দে তার চেতনা উদ্রেক করতে পারে না। তেম্‌নি স্বাস্থ্যের বেগে যার শরীর চঞ্চল হয়ে উঠেছে, শান্ত নিরুদ্বিগ্ন ভাবে কেবলমাত্র জীবনধার-

গের মধ্যে যে সুখটুকু আছে সে তাকে এক লম্ফে লঙ্ঘন করে' চলে' যায়।

ধনই হোক্, সুখই হোক্, স্বাস্থ্যই হোক্, যতটুকু আমাদের প্রাত্যহিক আবশ্যকে লাগে ততটুকু নিয়মিত কাজে ব্যাপৃত থাকে। তার অতিরিক্ত যেটুকু সেইটুকুই আমাদের অস্থির করে' তোলে। সে কিছুতে বেকার বসে' থাক্‌তে চায় না। ধন ধনীকে কেবল প্রশ্ন করে, খাওয়া পরা ত হল, এখন কি করব বল? সুখ বলে, প্রাত্যহিক জীবনটা ত একরকম নিঃশব্দে কাটচে, এখন তার উপরে একটা কিছু সমারোহ না করলে টিঁক্‌তে পারিনে। স্বাস্থ্য বলে, আর কিছু যদি কর্‌বার না থাকে ত নিদেন হূহূঃশব্দে ছুটো ডন্ ফেলে আসা যাক্।

সেই জন্যেই আমরা ভারতবাসীরা বলে' থাকি সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, অনুরাগের চেয়ে বৈরাগ্যে ঢের কম ল্যাঠা। ভিতর থেকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে খাটিয়ে মারবার কেউ থাকে না। সুখ দুর্ব্বলের জন্যে নয়, সুখ বলসাধ্য, সুখ দুঃখসাধ্য। অক্সিজেন প্রতি-মুহূর্ত্তে যেমন আমাদের দগ্ধ করে' জীবন দেয়, মানসিক জীবনে সুখ সেইরকম আমাদের দাহ করতে থাকে। যৌবনে এই দাহ যেরকম প্রবল বার্দ্ধক্যে সেরকম নয়, এই জন্যে বৃদ্ধ জাতি এবং বৃদ্ধ লোকেরাই বলে' থাকেন, সন্তোষই যথার্থ সুখ অর্থাৎ তাপহ্রাসই যথার্থ জীবন।

য়ুরোপ মনুষ্যের নব নব অভাব সৃষ্টি করে' সেইটাকে মোচন করাকেই সুখ বলে, আমরা মনুষ্যের ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি চিরসঙ্গী আজন্ম অভাবগুলিকেও খোরাক বন্ধ ও অন্যান্য কৌশল দ্বারা হ্রাস করে' বসে' থাকাকেই সন্তোষ বলি।

আমি সেই প্রাচীন ভারতসন্তান। পায়ের উপর একখানি কম্বল চাপিয়ে লম্বা চৌকির উপর হেলান্ দিয়ে ভারতমাতার আর একটি দুর্ব্বল সন্তানকে সাম্‌নে বসিয়ে প্রত্যুষ থেকে মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্ন থেকে অপরাহ্ন, অপরাহ্ন থেকে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত কখন স্বগত তত্ত্বালোচনা, কখন জনান্তিকে গল্প, কখন নিস্তব্ধ ভাবে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকাকেই পরম সুখের অবস্থা মনে করচি। শরীরে যতটুকু তেজ আছে তাতে কেবল এইটুকু মাত্রই সম্পন্ন হতে পারে। আর, ঐ ইংরাজের ছেলেগুলো আমাদের সম্মুখ দিয়ে অবিশ্রাম পায়চারী করে' করে' মোলো! তাদের অপরিমিত স্বাস্থ্য কিছুতেই তাদের বসে' থাকৃতে দিচ্চে না; পিছনে পিছনে তাড়া করে' নিয়ে বেড়াচ্চে। এই সময়ে আমরা আমাদের নিবৃত্তিসিংহাসনের উপরে রাজবৎ আসীন হয়ে ভারতবাসীর নির্গুণাত্মক আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা অনুভব করচি। এবং মনে হচ্চে ইংরাজের ছেলেরাও আমাদের এই অটল ঔদাসীন্য এই নিশ্চেষ্ট অনাসক্তি দেখে নিজেদের হীনতা স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারচে, তাই আরো ছট্‌ফট্ করে' বেড়াচ্চে।

কিন্তু বাহ্য আকৃতি থেকে আমাদের দুটিকে দিবসের পেচকের মত যতটা আধ্যাত্মিক দেখায়, আমাদের আলোচনাতে সকল সময়ে ততটা সাত্ত্বিক সৌরভ থাকে না। সকলের জানা উচিত যদিচ আমরা ভারতসন্তান কিন্তু তবু আমাদের বয়স এখনও ত্রিশ পেরোয় নি। এখনো আমাদের সন্ন্যাসাশ্রমের সময় আছে। এই বয়সেই ম্যালেরিয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে বৈরাগ্য হাড়ের মধ্যে প্রবেশ করে' কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়—কিন্তু মনের মধ্যে এখনো কিঞ্চিৎ উত্তাপ আছে; এই জন্যে আমরা দুই

যুবক গতকল্য রাত্রি দুটো পর্য্যন্ত কেবল ষড়চক্র ভেদ, চিত্তবৃত্তি নিরোধ, ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা না করে' সৌন্দর্য্য, প্রেম এবং নারীজাতির পরম কমনীয়তা সম্বন্ধে পরস্পরের মতামত ব্যক্ত করছিলুম, এবং মনে করছিলুম আমাদের বয়সী যুবকদের পক্ষে এর চেয়ে সূক্ষ্মতর আধ্যাত্মিক বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্তই জ্যাঠামি এবং সেটা কেবল আজকাল বাঙ্গলা দেশেই প্রচলিত হয়েচে। বলা বাহুল্য, আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে দুজনেই ইংরাজি শিক্ষা লাভ করেছি, অতএব আমাদের এপ্রকার মনের ভাবকে যদি কেউ দূষণীয় জ্ঞান করেন তবে সেটা বিদেশী শিক্ষার দোষ বলে' জান্‌বেন। তাঁরা যে প্রকার শিক্ষা দিতে চান তাতে মনুষ্যসমাজ বাল্য যৌবন সম্পূর্ণ ডিঙ্গিয়ে একেবারে বার্দ্ধক্যের সুশীতল কূপের মধ্যে সমাহিত হয়ে বসে। জীবন-সমুদ্রের অসীম চাঞ্চল্য তার মধ্যে স্থান পায় না।

২৯ আগষ্ট। আজ রাত্রে এডেনে পৌঁছব। সেখানে কাল প্রাতে জাহাজ বদল করতে হবে। সমুদ্রের মধ্যে দুটি একটি করে' পাহাড় পর্ব্বতের রেখা দেখা যাচ্চে।

জ্যোৎস্না রাত্রি। এডেন বন্দরে এসে জাহাজ থাম্‌ল। আহারের পর রহস্যালাপে প্রবৃত্ত হবার জন্যে আমরা দুই বন্ধু ছাতের একপ্রান্তে চৌকি দুটি সংলগ্ন করে' আরামে বসে' আছি। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এবং জ্যোৎস্নাবিমুগ্ধ পর্ব্বতবেষ্টিত তটচিত্র আমাদের আলস্য-বিজড়িত অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে স্বপ্ন-মরীচিকার মত লাগ্‌চে।

এমন সময় শোনা গেল এখনি নূতন জাহাজে চড়তে হবে। সে জাহাজ আজ রাত্রেই ছাড়বে। তাড়াতাড়ি ক্যাবিনের মধ্যে

প্রবেশপূর্ব্বক স্তূপাকার বিক্ষিপ্ত জিনিষপত্র যেমন তেমন করে' চর্ম্মপেটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তার উপরে তিন চার জনে দাঁড়িয়ে নির্দ্দয় ভাবে নৃত্য করে' বহুকষ্টে চাবি বন্ধ করা গেল। ভৃত্যদের যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়ে ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের বাক্স তোরঙ্গ বিছানাপত্র বহন করে' নৌকারোহণপূর্ব্বক নূতন জাহাজ "ম্যাসীলিয়া" অভিমুখে চল্লুম।

অনতিদূরে মাস্তুলকণ্টকিত ম্যাসীলিয়া তার দীপালোকিত ক্যাবিনগুলির সুদীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ বাতায়ন উদ্ঘাটিত করে' দিয়ে পৃথিবীর আদিম কালের অতি প্রকাণ্ডকায় একটা সহস্রচক্ষু জলজন্তুর মত স্থির সমুদ্রে জোৎস্নালোকে নিস্তব্ধ ভাবে ভাস্‌চে। সহসা সেখানে থেকে ব্যাণ্ড বেজে উঠ্‌ল। সঙ্গীতের ধ্বনিতে এবং নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নানিশীথে মনে হ'তে লাগ্‌ল, অর্দ্ধরাত্রে এই আরবের উপকূলে আরব্য উপন্যাসের মত কি একটা মায়ার কাণ্ড ঘট্‌বে।

ম্যাসীলিয়া অষ্ট্রেলিয়া থেকে যাত্রী নিয়ে আস্‌চে। কুতূহলী নরনারীগণ ডেকের বারান্দা ধরে' সকৌতুকে নবযাত্রীসমাগম দেখচে। কিন্তু সে রাত্রে নূতনত্ব সম্বন্ধে আমাদেরই তিনজনের সব চেয়ে জিত। বহুকষ্টে জিনিষপত্র উদ্ধার করে' ডেকের উপর যখন উঠ্‌লুম মুহূর্ত্তের মধ্যে এক-জাহাজ দৃষ্টি আমাদের উপর বর্ষিত হ'ল। যদি তার কোন চিহ্ন দেবার ক্ষমতা থাকত তাহলে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ কটা কালো ও নীল ছাপে ভরে' যেত। জাহাজটি প্রকাণ্ড। তার সঙ্গীতশালা এবং ভোজনগৃহের ভিত্তি শ্বেত প্রস্তরে মণ্ডিত। বিদ্যুতের আলো এবং ব্যাণ্ডের বাদ্যে উৎসবময়।

অনেক রাত্রে জাহাজ ছেড়ে দিলে।

সাময়িক সারসংগ্রহ।

স্ত্রী-মজুর।

কারখানার মজুরদের লইয়া য়ুরোপে আজকাল ক্রমিক আন্দোলন চলিতেছে। কলকারখানা য়ুরোপের একটা প্রকাণ্ড অংশ অধিকার করিয়াছে এবং তাহার অধিকার উত্তরোত্তর বিস্তৃত হইতেছে। পৃথিবীর ভার বাড়িয়া উঠিলে ভূভারহরণের জন্য অবতারের আবশ্যক হয়। কলকারখানা য়ুরোপীয় সমাজের মধ্যে একদিকে প্রকাণ্ড চাপ দিয়া তাহার ভার সামঞ্জস্যের যদি ব্যাঘাত করে তবে স্বাভাবিক নিয়মে একটা বিপ্লব উপস্থিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে। ব্যাপারটা কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে আমাদের পক্ষে বলা বড়ই শক্ত, কিন্তু এই কথাটা লইয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নাড়াচাড়া চলিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কলের প্রাদুর্ভাব হইয়া অবধি মজুরী সম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষের প্রভেদ অনেকটা লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে বিশেষ কারুকার্য্যে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক ছিল; এবং গৃহকার্য্যের ভার স্বভাবতই স্ত্রীলোকদের উপর থাকাতে পুরুষদেরই বিশেষ শিক্ষা ও অভ্যাসের অবসর ছিল। তাহা ছাড়া, পূর্ব্বে অধিকাংশ কাজ কতক পরিমাণে বাহুবলের উপর নির্ভর করিত, সে জন্য পুরুষ কারিগরেরই প্রাধান্য ছিল। কেবল চর্‌কা কাটা প্রভৃতি অল্পায়াসসাধ্য কাজ স্ত্রীলোকের মধ্যে ছিল। এখন কলের প্রসাদে অনেক কাজেই নৈপুণ্য এবং বলের আবশ্যক কমিয়া গিয়াছে, অথচ কাজের আবশ্যক অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এই জন্য

স্ত্রীলোক এবং বালকেও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সহিত দলে দলে মজুরী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। কিন্তু কেবল কলের কাজ দেখিলেই চলিবে না, সমাজের উপরেও ইহার ফলাফল আছে।

সমাজের হিতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কারখানার মজুরদের সম্বন্ধে য়ুরোপে দুটা একটা করিয়া আইনের সৃষ্টি হইতেছে। কলের আকর্ষণ কথঞ্চিৎ পরিমাণে থর্ব্ব করাই তাহার উদ্দেশ্য।

সেপ্টেম্বর মাসের "নিউ রিভিউ" পত্রিকায় খ্যাতনামা ফরাসী লেখক জুল্ সিমঁ ফ্রান্সের স্ত্রীমজুরদের সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

তিনি বলেন, ফ্রান্সে প্রথম যখন বালক মজুরদিগের বয়সের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য আইন হয় তখন একটা কথা উঠে, যে, ইহাতে করিয়া সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্বাভাবিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। তা ছাড়া কারখানাওয়ালারা ভয় দেখায় যে, শিশুসহায় হইতে বঞ্চিত হইলে কারখানার ব্যয়ভার এত বাড়িয়া উঠিবে যে, কারখানা বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু আইন পাস হইল এবং কারখানা এখনো সমান তেজে চলিতেছে। কলিকালের সকল ভবিষ্যৎ-বাণীরই প্রায় এই দশা দেখা যায়। বালক মজুরদের পক্ষে প্রথমে আট বৎসর, পরে নয় বৎসর, পরে বারো বৎসর এবং অবশেষে তেরো বৎসরের অন্যূন বয়স নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

স্ত্রী-মজুরদের খাটুনি সম্বন্ধে যখন কতকগুলি বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয় তখন চারিদিক হইতে তুমুল আপত্তি উত্থাপিত হয়। সকলেই বলিতে লাগিল ইহাতে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা হরণ করা হইতেছে। যদি কোন বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক

বারো ঘণ্টা খাটিতে স্বীকার করে আইনের জোরে তাহাকে দশ ঘণ্টা খাটিতে বাধ্য করা অন্যায়। অনেকে বলেন, স্ত্রী-মজুরদের সম্বন্ধে বিশেষ আইন পাস্ করিলে স্ত্রীজাতির প্রতি কতকটা অসম্মান প্রকাশ হয়। তাহাতে বলা হয় যেন তাহারা পুরুষের সমকক্ষ নহে।

লেখক বলিতেছেন, যখন গর্ভধারণ করিতে হয় তখন বাস্তবিকই পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের বৈষম্য আছে। কারখানার ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায়, যে, স্ত্রীমজুরদিগকে প্রায়ই দুরারোগ্য রোগ বহন করিতে হয়। গর্ভাবস্থায় কাজ করা এবং প্রসবের দুই তিন দিন পরেই বারো ঘণ্টা দাঁড়াইয়া খাটুনি এই সকল রোগের প্রধানতম কারণ।

কেবল আজীবন রোগ বহন এবং রুগ্ন সন্তান প্রসব করাই যে স্ত্রীলোকের অনিয়ন্ত্রিত খাটুনির একমাত্র কুফল, তাহা নহে। গৃহকার্য্যে অনবসর সমাজের পক্ষে বড় সামান্য অকল্যাণের কারণ নহে। পূর্ণ মাতৃস্নেহ হইতে শিশুদিগকে বঞ্চিত করিলে তাহা হইতে যে কত অমঙ্গলের উৎপত্তি হইতে পারে তাহা কে বলিতে পারে!

লেখক বলিতেছেন, বাষ্পীয় কল স্ত্রীপুরুষ উভয়কে নিজের কাজে টানিয়া লইয়া স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতেছে। স্ত্রী-মজুর এখন স্ত্রী নহে মাতা নহে কেবলমাত্র মজুর।

ইহা হইতে যতদূর অনিষ্ট আশঙ্কা করা যায়, তাহা এখনো সম্পূর্ণ পরিণত হইবার সময় পায় নাই। কেবল দেখা যাইতেছে পুরুষদের মধ্যে মদ্যপান এবং পাশবতা ক্রমশঃ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিতেছে এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে নারীসুলভ হৃদয়বৃত্তি শুষ্ক হইয়া

মানসিক অসুখ এবং সন্তানপালনে অবহেলা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

দেখা যাইতেছে য়ুরোপে আজকাল প্রধান সমস্যা এই—জিনিষপত্র, না মনুষ্যত্ব, কাহার দাম বেশী?

প্রাচীন পুঁথি-উদ্ধার।

য়ুরোপের মধ্যযুগে যখন এক সময় বিদ্যার আদর সহসা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল তখন প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমান্ গ্রন্থের অন্বেষণ পড়িয়া যায়। বহু চেষ্টায় ধর্ম্মমন্দিরস্থিত পুস্তকালয় হইতে অনেক প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধার হয়। সেই অন্বেষণকার্য্য এখনো চলিতেছে। কাজটা কিরূপ অসামান্য যত্নসাধ্য তাহা নভেম্বর মাসীয় "লেজার্ আওয়ার" পত্রের প্রবন্ধবিশেষ হইতে কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

প্রাচীন পুস্তকালয় অনুসন্ধান করিয়া যতদূর বাহির হইতে পারে তাহা বোধ করি একপ্রকার সমাধা হইয়াছে। কাজটা নিতান্ত সহজ নহে। কেবল বসিয়া বসিয়া পুঁথি বাছা বিস্তর ধৈর্য্যসাধ্য, তাহা ছাড়া আর একটা বড় কঠিন কাজ আছে। পুরাকালে লিপিকরগণ অনেক সময়ে একটা পুঁথির অক্ষর মুছিয়া ফেলিয়া তাহার উপর আর একটা গ্রন্থ লিখিতেন। বহুকষ্টে সেই মোছা অক্ষর পড়িয়া পড়িয়া অনেক দুর্লভ গ্রন্থ উদ্ধার করা হইয়াছে। এইরূপ এক একখানি পুঁথি লইয়া এক এক পণ্ডিত বিস্তর চেষ্টায় গুটিকতক লুপ্তপ্রায় দাঁড়ি কমি বিন্দু খুঁজিয়া বাহির করিলেন, আবার আর এক পণ্ডিত দ্বিগুণতর ধৈর্য্যসহ-

কারে তাহাতে আরো গুটিকতক যোগ করিয়া দিলেন। এইরূপে পতিনিষ্ঠ সাবিত্রীর ন্যায় তাঁহারা অনেক সত্যবান্ গ্রন্থকে যমের দ্বার হইতে ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছেন।

নেপল্‌সের নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্র খনন করিয়া হর্কুলেনিয়ম্ নামক একটি প্রাচীন নগর ভূগর্ভ মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে সেখানে একটি বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে সেকালের এক পুস্তকালয় বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে সহস্র সহস্র পুঁথি একেবারে কয়লা হইয়া গিয়াছে। ইহার কতকগুলি পুঁথি অসামান্য যত্নে অতি ধীরে ধীরে খোলা হইয়াছিল, কিন্তু কোন বিশেষ ভাল বহি এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই।

উত্তর ঈজিপ্টের মরুমৃত্তিকা এত শুষ্ক যে তাহার মধ্যে কোন জিনিষ সহজে নষ্ট হয় না। কাগজ সূতা বস্ত্র পাতা প্রভৃতি দ্রব্যও তিন সহস্র বৎসর পরেও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে—যেন তাহা সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে। সেখানে প্রাচীন নগরীর ভগ্নাবশেষের মধ্য হইতে অনেক গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। ইলিয়াড্ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ মৃতদেহের সহিত একত্রে পাওয়া গিয়াছে।

সকলেই জানেন প্রাচীন ঈজিপ্টিয়গণ বিশেষ উপায়ে মৃতদেহ রক্ষা করিতেন। অনেক সময় তাঁহারা কাগজ দিয়া এই মৃত দেহের আবরণ প্রস্তুত করিতেন। তাহার মধ্যে অধিকাংশ ছেঁড়া কাগজ। মাঝে মাঝে আস্ত কাগজও পাওয়া যায়। অনেক সাহিত্যখণ্ড, দানপত্র, হিসাব, খৎ, চিঠি এই উপায়ে হস্তগত হইয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়, কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা ভরসা, কত বৈষয়িক বিবাদ বিস-

বাদ, দরদাম, মাম্‌লা মকদ্দমা আজ বিস্মৃত মৃতদেহ আচ্ছন্ন করিয়া পড়িয়া আছে।

আমাদের দেশেও কি অনেক প্রাচীন পুঁথি নানা গোপন স্থানে পুনরাবিষ্কারের প্রতীক্ষা করিয়া নাই? কিন্তু কাহার সে দিকে দৃষ্টি আছে? যে বিদেশীরা আমাদের খণি খুঁড়িয়া সোনা তুলিতেছে, মাটি চষিয়া নব নব পণ্য দ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে, তাহারাই পুঁথিরাশির মধ্য হইতে আমাদের লুপ্ত শাস্ত্র উদ্ধার করিতেছে, এবং সেইগুলিই অলসভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া, তাহাদেরই কৃত তর্জ্জমা পড়িয়া আমরা এক একজন আর্য্য দিগ্‌গজ হইয়া উঠিতেছি এবং মনে করিতেছি পৃথিবীতে আমাদের তুলনা কেবল আমরাই।

ক্যাথলিক্ সোশ্যালিজ্‌ম্।

য়ুরোপে কিছুদিন হইতে সোশ্যালিষ্ট্ নামক এক দলের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ধন সমভাবে বিভাগ করিয়া দিতে চায়। এ সম্বন্ধে ফরাসী পণ্ডিত রেনাঁ বলিতেছেন, বর্ত্তমান কালে এ একটি বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে; একদিকে সভ্যতা বজায় রাখিতে হইবে অন্যদিকে সভ্যতার সমস্ত সুখসম্পদ সাধারণের মধ্যে সমানভাগে বাঁটিয়া দিতে হইবে। কথাটা শুনিবামাত্রই স্বতোবিরোধী বলিয়া বোধ হয়; এক পক্ষে উত্থান এবং অপর পক্ষের পতন এ যেন প্রকৃতি এবং সমাজের মূল নিয়ম।

প্রাচীন সমাজে যখন হীনাবস্থার লোক সর্ব্ব বিষয়েই হীনাবস্থায় ছিল তখন এ সম্বন্ধে কোন কথা উঠে নাই। কিন্তু আজ-

কাল য়ুরোপে সকলেরই রাজপুরুষ নির্ব্বাচনের অধিকার জন্মিয়াছে। প্রত্যেকেরই আত্মমর্য্যাদাবোধ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলে আমরা সকলেই সমান রাজা কিন্তু আমাদের সমান রাজত্ব কই? তাহারা যে সংখ্যায় বেশি এবং তাহাদের হাতে অনেক ক্ষমতা আছে এ কথা তাহারা প্রতিদিন বুঝিতেছে; এই জন্য সমস্যা প্রতিদিন গুরুতর এবং তাহার মীমাংসাকাল উত্তরোত্তর নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

এতকাল এই সোশ্যালিজ্‌ম্‌ মত প্রায় নাস্তিকতার সহচর স্বরূপে ছিল। প্রায় সমস্ত সোশ্যালিষ্ট্‌ পত্রই নাস্তিকতার গোঁড়ামি প্রচার করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি একটা পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। রোমান-ক্যাথলিক ধর্ম্মমণ্ডলী এই মতের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছে।

ইহাতে সোশ্যালিজ্‌মের বল কত বাড়িয়া উঠিতেছে তাহা বলা বাহুল্য। রোমান্‌-ক্যাথলিক মণ্ডলীর অধিপতি স্বয়ং পোপ্‌ লিয়ো অল্পদিন হইল তীর্থযাত্রী একদল ফরাসী মজুরদের সম্বোধন করিয়া আপনার অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহা একটা লক্ষণস্বরূপে ধরা যাইতে পারে। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় প্রায়ই প্রবল পক্ষকে আশ্রয় করিয়া বললাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। রোমের মোহন্তটি য়ুরোপের নাড়ি টিপিয়া বসিয়া আছেন। সোশ্যালিজ্‌মের আসন্ন উন্নতি ও ব্যাপ্তি নিশ্চিত অনুমান না করিলে তাঁহারা যে সহসা ইহার প্রতি প্রকাশ্য প্রসন্নতা দেখাইতেন ইহা তেমন সম্ভবপর বোধ হয় না; তাঁহারা এমন বালুকার পরে কথনই চরণক্ষেপ করিতেন না যাহা দুই দণ্ডে ধসিয়া যাইবে।

আদরের না অনাদরের ?

মঙ্গল আরতির মঙ্গল ধ্বনিতে জাগিয়া উঠিয়া আপনাকে শরতের মধুর জ্যোৎস্নায় মগ্ন দেখিলাম। পার্শ্বে শায়িতা সুকুমারী বালা আমারি,—আমারি সে—নির্ভয়ে নিস্পন্দে ঘুমাইতেছে। পাছে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, তাই বড় সাধ হইলেও চুম্বন করিলাম না। মধুর জ্যোৎস্নায়, মৃদুমন্দ বাতাসে, ঈষৎ ঘুমঘোরে দেখিলাম, ধরণী নিজ সন্তান সন্ততি লইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রায় মগ্ন—বুকের কাছে নিঃশঙ্ক-চিত্তে বাছারা ঘুমাইতেছে—সকলেই মাতৃস্নেহে, মাতৃআদরে আপ্লুত। হেথায় পক্ষপাতিতা নাই—সকলেই মাতার সমান যত্ন স্নেহের ধন। সুমধুর জ্যোৎস্নাটুকু মায়ের হাসিখানির মত প্রকৃতি জননীকে হাস্যময়ী করিয়া তুলিয়াছে—মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিলাম—ঘুমন্ত প্রকৃতি কি সুন্দর! দেখিতে দেখিতে তখন বহুদিনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল—এমনি কত জ্যোৎস্নায় আপনাকে প্রিয়জনে বেষ্টিত দেখিলাম। স্মৃতিতে মধুর জ্যোৎস্না আরো মধুরতর মনে হইতেছিল, মনে পড়িল—"তখন কে জানে কারে, কে জানিত আপনারে, কে জানিত সংসারের বিচিত্র ব্যাপার।" সহসা তীব্র কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিলাম—শুনিতে পাইলাম আমার বাতায়নের সম্মুখবর্ত্তী পুষ্করিণীর ঘাটে একটা কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইয়াছে।

"কেও?—কেষ্টদাসী আজ যে বড় রাত থাক্‌তে থাক্‌তে ঘাটে এসেছিস?—কাল রাতে তোদের পাড়ায় শাঁক বাজছিল, তোদের বৌএর কি এবার তবে বেটাছেলেটী হোল?"

"না গো ছোট কাকি, সে কথা আর বোলোনা—আমাদের

যেমন অদৃষ্ট, বৌএর আবার বেটাছেলে এজন্মে হবে! যা হয় একটা মেয়ে হোয়েছে।”

“এবার তিনটে মেয়ে হোল বুঝি?” “হাঁগো কাকি তিনটে হোল।” “তাহোলে গণ্ডাতর্ত্তি হবে—তবে যদি বেটা ছেলে হয়।”

“হাঁগো খুড়ী, তারি তো মতন দেখছি। তা মেয়েটা হোয়েছে শুনে দাদা বলে কেষ্ট আমি আর উঠতে পারিনা, আমার গায়ে আর বল শক্তি নেই। মায়ের কাছে ধাই বিদেয় চাইলে, মা আসলে বিছানা থেকে উঠ্‌লো না কথা কইলেনা। বৌ মেয়ে তুলবে না; কত বলা কওয়ায় কোলে নিলে, তা বলে যে গলা টিপে দেব। আমি এখানে না থাক্‌লে মেয়েটা বোধ করি মাটীতে পড়ে থেকে সদ্য মারা যেত। বাড়ি শুদ্ধ দুঃখেতে যেন কেমন হোয়ে রয়েছে।”

“তা থাক্‌বে বই কি, তিন তিনটে মেয়ে, কায়েতের ঘরে বিয়ে দিতে প্রাণ বেরুবে। অভাগীর মেয়ের যেমন অদৃষ্ট, দশমাস গর্ভে ধোরে কিনা একটা মাটীর ঢেলা হোল।” “আহা খুড়ী, পাছে এবার আবার মেয়ে হয় বোলে বৌ ভেবে ভেবে আধখানা হোয়ে গেছে। আর পোড়া মেয়েগুলোরও সকলি বিশ্রী কিনা, এবার বৌএর এমন অরুচি হোয়েছিল যে, পেটে জল যেত না। মেয়েটা এই সবে চার বছরের; খুকি হয়েছে শুনে বল্‌ছে ও তো খোকা নয় তবে ওকে বিলিয়ে দাও।” “কচি ছেলে ওরা যেমন শোনে তাই মুখে একটা একটা কথা পাকা মতন বোলে ফেলে, তা আটকৌড়ে হবেতো?”

“তা এখন কি জানি, হয় তো অমনি নিয়মরক্ষা আটটী ছেলে ডেকে কুলো বাজিয়ে দেবে। মা এবার কত সাধ করেছিল

খোকাটী হবে, আটকৌড়েতে ভাল কোরে হাঁড়ি করবে তবে ষষ্ঠী পূজোতে তেল সন্দেশ বিলবে তা কিছুই হোল না, সকলি মিথ্যা হোল।"

"তা মেজদিদি নরেশের বিয়ে দিকনা। বৌএর হোলনা হোলনা কোরে এতদিন পরে শেষ মেয়ে হোতেই চোল্লো। নরেশ একটী ছেলে কেবল মেয়ে হোলে নাম রাখবে কে ?" "তা খুড়ি দাদা কি কোরবে। একালের ছেলে, ওরা ঝগড়াঝাঁটীর ভয় পায়। বৌএর ছেলে হোলনা হোলনা কোরে মা যখন হেদিয়ে দাদার বিয়ে দিতে চেয়েছিল তখনি যার দাদা বিয়ে করতে চায়নি তা এখন তো মেয়ে হোচ্ছে—ছেলে হবার আশা হোয়েছে। তবে মায়ের কিনা একটি ছেলে মা তাড়াতাড়ি সকলি চায়। বৌএর কিছু এমন বেশি বয়সে মেয়ে হয়নি বছর আঠারতে বুঝি বড় মেয়েটা কোলে হয়েছে—তা মা একেবারে অস্থির হোয়ে বৌকে কত ওষুধ বিষুধ খাইয়েছিল কত মাদুলি কত ঠাকুরের দোর ধরা কত কি করার পর ঐ মেয়ে হোল। তা তখন আশা হোল মেয়ে হোয়েছে তা এইবার তবে নাতি হবে—ওমা বার বার তিনবার আর কত সহ্য করবে! তা মা তো বলে যে বৌএর এবার মেয়ে হোলেই ছেলের আবার বিয়ে দেব তা দাদা যে রাজী হয়না নইলে না কন্যে পর্য্যন্ত দেখে রেখেছে। আর মাও একটু চিরকাল অধৈর্য্য আছে, আমরা তাই বলি অত ভেবে হাতড়ে পাতড়ে বেড়ালে কি হবে, মেয়ে হোয়েছে, ছেলেও হবে, তা এবার আর আমাদের কিছু বলবার রইল না।"

এখনো সূর্য্যোদয় হয় নাই। উষার ঈষৎ মাত্র আভাস পাওয়া যাইতেছে, এখনো কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ পশ্চিমাকাশে জ্বল জ্বল করিতেছে।

মৃদু মৃদু প্রভাত সমীরণ কতদূর হইতে কেয়াফুলের সুমিষ্ট গন্ধ বহিয়া লইয়া আসিতেছে। জনকোলাহল এখনো উত্থিত হয় নাই। এমন সময় আমাদের পরিচিত গৃহিণীর কলকণ্ঠস্বরে পাড়ার সকল লোক জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আমিও উঠিয়া জানলায় গিয়া বসিলাম। একদিকে বাখারির বেড়া এবং তিন দিকে ইমারত বেষ্টিত একটী ক্ষুদ্র বাগান নামধারী স্থানের মধ্যে একটী ছোট রকম পুষ্করিণী। এখন বর্ষাতে কূলে কূলে জল হইয়াছে। কিন্তু চারিপাশের জল হিংচা, কলমী, সুশুনি শাকে সবুজ—কেবল মাঝখানে খানিকটা জল কতকটা পরিষ্কার আছে। পুখুরটীর পাড়ে একধারে আম জাম জামরুল প্রভৃতি দুচারিটী ফলবান্ বৃক্ষ—বৃক্ষের তলা কেহ কখনো পরিষ্কার করে না। একধারে পাঁচ ছয়টী কলাগাছ—প্রায়ই তাহাদের একটী না একটী গাছকে ফলভারে পুখুরের উপর অবনত দেখা যায়। একধারে দু'একটী আধ্‌মরা গাঁদাফুলের গাছ—দু'একটী জীর্ণ গোলাপ গাছ—কখনো তাহাতে ফুল হইতে দেখা যায় না। কদাচিৎ দুএকটী কুঁড়ি দেখা যায় কিন্তু তাহা অর্দ্ধস্ফুট না হইতে হইতে শুখাইয়া যায়। একটী অপরাজিতা লতা, হতাদরে বেড়ার গায়ে লতাইয়া উঠিয়া বেড়ার কঙ্কালের কতক অংশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—মাঝে মাঝে দু'চারিটী ফুলও লতার বুকে শোভা পায়—সে ফুলে দেবপূজাও হয়। রোপণকালে লতাটীর কত না আদর ছিল, কিন্তু এখন আর কেহ তাহার দিকে চাহে না—তবুও সে এখনো ধীরে ধীরে নিজ কার্য্য করিতেছে।

"ওমা কথা কইতে কইতে যে ভোর হোয়ে এল—আজ আর জাহ্নবী নাইতে যাওয়া হোল না—তা থাক্—একটু আহ্-

ঘাঁর জল পরশ করবো এখন—একেবারে তবে পুখুর থেকে চান্ কোরেই যাই। ওগো ও নাতবৌ এইখানে আমায় একটু তেল দিয়ে যা'।" আজ ঘাটের শুভদিন—ভারি মজলিস্—গৃহিণী নহিলে ঘাট ভাল মানায় না।

"তাই তো বলি কেষ্টদাসী একালের ছেলেপিলে কি মা বাপকে মানে ? আমার শ্বশুর বড় গিন্নির (ইহাঁর সপত্নীর) ছেলে হোল না বোলে অমনি আমার সঙ্গে কর্ত্তার বিয়ে দিলেন—তা বাছা, পরমেশ্বর মুখ রক্ষা করলেন তেমনি, বছর দুই বিয়ে না হোতে হোতে প্রথমেই আমার রাধানাথ হোল—তা আঃ কোথা গেল আমার সে ছেলে—আমি পোড়াকপালী বোসে আছি—ভাগ্যিস তার দুটো গুঁড়ো আছে তাই নিয়ে সংসারে আছি—নইলে পাগল হোয়ে কোন দেশে চোলে যেতুম। তার পর জানিস্ বাছা, তার বছরখানেক বাদে বড়গিন্নির হরলাল হোল। আমার যখন বিয়ে হোল তখন তো বড়গিন্নির ছেলে হবার বয়েস যায়নি—তবে ওর বাপ শুনেছি খুব ছোট বয়সে বিয়ে দিয়েছিলন—আর কর্ত্তার চেয়ে বড়গিন্নি বছর দুয়ের বয়সে ছোট ছিল—বিয়ের সময় মাথায় প্রায় এক দেখে সুতো জোঁকা দিয়ে তবে বিয়ে হয়। আমার একটু ডাগর হোয়ে বিয়ে হোয়েছিল, কর্ত্তার তো আমি দোজপক্ষের মত নই—আমিই সময়কালে বিয়ের পরিবারের মত হলুম। তা সেকালের কর্ত্তারা অত হিসেব কিতেব বুঝতেন না; বল্লেন বিয়ে কর—এঁরাও অমন একালের ছেলেদের মত মা বাপের কথা ঠেল্তে পারতেন না। আমার শ্বশুর বল্তেন, যে আবাগের বেটী কোঁদল করবে সে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকুক—আমার বাড়ি তাঁর ঠাই হবে না। তাঁদের দবন্

ছিল কত– কর্ত্তা বাড়ির ভেতর এলে আমরা কচিকাচা বৌ ঝি তো ভয়ে কাঁটা হতুম—ঠাকরুণ শুদ্ধ ভয়ে সারা হোতেন। একেলে মেয়েরা যেমন দিবারাত্রি স্বামীর সঙ্গে মুখোমুখী কোরে থাকে—জানিস কেষ্ট আমাদের তা হবার যো ছিল না। রাত্রে সকল নিশুতি হোলে তবে ঘরে কেউ দিয়ে আস্‌তো তবে যেতুম। এক একদিন বারান্দায় কি দালানে ঘুমিয়ে পড়তুম—আর কেউ ঘরে যেতে বল্‌তে যদি ভুলে যেতো তবে সেইখেনেই রাত কাট্‌তো। রাধানাথ ছমাসের হোলে তবে শাশুড়ি একদিন রাধানাথের বিছানা ঘরে দিলেন সেই দিন থেকে যার যেদিন পালা পড়তো সে সেইদিন ঘরে শুতে যেতুম। আমাদের ছেলে হোলে ছমাস কর্ত্তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করবার হুকুম থাক্‌তো না—তবে এদানী কিছু দরকার হোলে কর্ত্তা লুকিয়ে চুরিয়ে ভাঁড়ার ঘরে কি রান্নাঘরে এসে বোলে যেতেন। তা বাছা আমরা দিনের বেলা কথা কইতুম না—শাশুড়ি টের পেলে গঞ্জনা সহিতে হবে এমন কথা নাইবা কইলুম। তা একালে সব রকমই আলাদা, দেখে শুনে হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।”

মুখে অনর্গল বক্তৃতা চলিতেছে, হস্ত তৈলসমেত সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত হইতেছে। ক্রমে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে অনেকগুলি রমণীমুখকমল ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সকলেরই মন গৃহিণীর বক্তৃতার দিকে, সকলেই নিজ নিজ স্নান ভুলিয়া গিয়াছেন—কাহারও দাঁতমাজা আর শেষ হয় না, কেহ গামছা দিয়া গাত্র মর্দ্দন করিয়াও তৃপ্ত হইতেছেন না। মূল কথা, মিত্রদের মেয়েটা হইয়াছে শুনিয়া সকলেই তাইতো আহা মেয়েটা হোল বেটাছেলেটী হোলেই সার্থক হোত, বলিয়া আহা উহু করিতেছেন। একজন

আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "তা হোক কত লোকের সাত মেয়ের পর ছেলে হয়—আমার পিসতুত বোনের সেদিন চার মেয়ের পর খোকাটী হোয়েছে—খোকাটি এই ষেটের এক বছরের হোল।"

এই রমণীমণ্ডলীর মধ্যে দু'একটী ঘোমটাবৃত যুবতী বধূ ও কন্যা স্নান করিতেছিল—একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্যা আর থাকিতে পারিল না। মাতৃসম্বোধনে কৃষ্ণদাসীকে কহিল—"তা মা মামীর মেয়ে হোয়েছে বোলে তোমাদের দুঃখু রাখবার যেন ঠাঁই নেই তাই ঘাটে এসেও সেই কাহিনী হোচ্ছে—তা তুমি যা বল, আমার কিন্তু বাপু ঘোষেদের কালো কালো ছেলের চেয়ে মামীর মেয়েদের বেশ ভাল লাগে—অমন একটা কালো ছেলের চেয়ে সাতটা সুন্দর মেয়ে ভাল। তোমাদের এক কথা, মেয়ে বুঝি কোন কাজে লাগে না? তুমি এই যে আষাঢ় মাসে এখানে এসেছ দু তিন মাস যে কোরে দিদিমার সেবা করছ মামা তেমন করেন? দিদিমাই তো দুঃখু করেন আমার মেয়ে অসময়ে যত করে ছেলে আমার তেমন করে না। তার বেলা বুঝি মেয়ের দরকার?—এদিকে মেয়ে হোয়েছে শুনলেই সর্ব্বনাশ বাধে। এই যে ওবাড়ির ছোট ঠাকুরমা—কাকা তো এক পয়সা আন্‌তে পারেন না—যাই ক্ষেমা পিসী ছিলেন তিনি খরচ পত্র দিচ্ছেন তবে কাকার শুদ্ধ চল্‌চ্ছে। কিন্তু শুনেছি ক্ষেমা পিসীর আগে আর দু বোন্ হয় তাই ওঁর নাম ক্ষেমা রেখেছিল।" এমন বিদ্রোহসূচক কথা শুনিয়া ঘাটশুদ্ধ সকলে অবাক্ হইয়া গেল। কাক আর ডাকে না, গাছের পাতা আর নড়ে না। গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন "ওলো পের্‌ভা থাম্ থাম্ যখন তোর হবে, তখন বুঝবি—এখন ছেলেমানুষ কি বুঝবি—ছেলেমানুষের মুখে অত পাকা পাকা কথা ভাল শোনায় না।"

"তা ছোট ঠাকুরমা সত্যি কথা বল্‌ছি—কেন এই ওবাড়ির ছোট মামীও বল্‌ছেন যে ওঁর যদি মেয়ে হয় তাতে কিছু দুঃখু হবে না। মামীও তো মেয়েদের কত ভালবাসেন, কেবল দিদিমার লাঞ্ছনার ভয়েই তো পাছে মেয়ে হয় বোলে অত ভয় পান। মেয়ে হোয়েছে, এখন ছেলে হবার সাধ হয়, দিদিমার ভয়ে মেয়েদের ভাল কোরে আদর পর্য্যন্ত কোরতে পারেন না। মামা বাবু ভয়ে পূজোর ভাল কাপড় অবধি কোরতে দিতে সাহস পেলেন না—নইলে মেয়েকে দিতে তাঁর ইচ্ছা হয়—কে জানে বাপু তোমরা কি বোঝ—তোমরা কি মেয়ে নও—?" "হ্যাঁগো জেঠাইমা ঠাকরুণ আমরা মেয়ে বটে, তা আমার কত আদর ছিল জানিস, আমি মায়ের প্রথম সন্তান– দিদিমার আদুরে, ঠাকুর-মার আদুরে—ঠাকুরমা বলতেন ওকি আমার মেয়ে, ও আমার সাত বেটা, তা বোলে বাবু গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে হওয়া গৃহস্থের অলক্ষণ।"

ক্রমে প্রভার সমবয়স্কা আরও দুচারিটী কন্যা ঘাটে আসিয়া জুটিল। হরিদাসী কহিল—"কি ঠান্‌দিদি আজ যে ঘাট জাঁকিয়ে তুলেছ, ব্যাপারখানা কি?"

"কি লো হরিদাসী এসেছিস—তাই তো বলি, তুই নইলে কি ঘাট মানায়, আমরা বুড়ো মানুষ, আমরা আর ঘাট জাঁকাব কি, দুটো দুঃখের সুখের কথা কইছি বইতো নয়—তোদেরই এখন জাঁকের বয়েস—তাই বলছিলুম বলি হরিদাসী যে এখনো এল না—কাল রাতে বুঝি নাতজামাই এসেছিল?"

"সে আমি কি জানি ঠান্‌দিদি, সে তোমরা জান—আমরা ঘাটে আস্‌তে আস্‌তে পথের ধারে হরকালী কাকার বাড়ি

গেছলুম—তাদের খোকা হোয়েছে দেখে এলুম—তাই আস্তে একটু দেরি হোল।"

"বটে! ওদের কেমন অদৃষ্ট দেখেছিস্—এখন সময় ভাল সব দিকে ভাল হয়—বৌএদের কেবলই বেটাছেলে হোচ্ছে। আর ঘটাও তেমনি করে—এই আটকৌড়েতে হাঁড়ি করা রে—ষষ্ঠী পুজোয় তেল সন্দেশ দেওয়া রে—ভাতে বোগ্‌নো করা রে—খাওয়ান রে দাওয়ান রে সব করে। কেষ্টর মার যেমন অদৃষ্ট—একটা বৌ—কেবল গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে হোচ্ছে।"

হরিদাসী। "তা হোলই বা, মেয়ে বুঝি ফেল্‌না ?"

"ও বাবা! তোদের একালের যে সবই সমান দেখি—পেরভাও ঐ কথা নিয়ে কত মুখনাড়া দিলে—মেয়েছেলে আবার কোন্ কাযের গা ?"

"কোন্ কাযের নয় গা ? বাপ মা স্বামী পুত্র কারো অসুখ হোক্, কারো অনটন হোক্, মেয়েতে যত করে এত কোন ছেলেতে করে গা ? মাকে মেয়ে যত যত্ন করে, মায়ের দুঃখ যত মেয়েতে বোঝে এত কি ছেলেতে বোঝে ? ওগো স্ত্রীলোক হচ্ছে লক্ষ্মী—হাজার টাকা কড়ি থাক্, দেখ যে বাড়িতে গৃহিণী নেই সে ঘরকন্না কেমন বেশৃঙ্খল, যে ছেলেদের মা নাই সে ছেলেপিলের কত অযত্ন। মেয়ে হোয়েছে শুনেই তোমরা লাপিয়ে ওঠ, কিনা বিয়ে দিতে হবে। তা বাপু ছেলের জন্য কি কিছু খরচ নেই ? সেনেদের বাড়ি দেখ্‌তে পাই ছেলেদের খাওয়া হোলে তবে সেই পাতে মেয়েদের অমনি যা তা দিয়ে খেতে দেয়। ছেলেদের জুতো জামা সাফ্ কাপড়, মেয়েদের ময়লা পাঁচী ধুতি। ছেলেদের দু পয়সা কোরে এক একজনের

খাবার বরাদ্দ, মেয়েদের এক পয়সার আটার রুটী কোরে তিন চারটীকে দেয়। ছেলেরা ভাল গদিতে খাটে শোয়—মেয়েগুলি মেঝেতে মাদুরে একটা ছেঁড়া লেপ পেতে শোয়। বড় বড় ছেলে-রাও মা বাপের সঙ্গে শুতে পায়, ছোট বোন্ দুটী রাঁধুনীর কাছে শোয়। আহা, তাদের যদি একটু যত্ন আছে! সেদিন ওবাড়ির মেজকাকীর মেয়ে মামার বাড়ি থেকে বাড়ি এসেছে ঠাকুরমার কাছে সকালে ভাত চেয়েছে—তখনো কেউ খায়নি বোলে ঠাকুরমা সচ্ছন্দে তাকে বল্লে কি না মেয়েমানুষ আগদোকের ভাত খাবি কি! এখনো কেউ খায়নি আগেভাগে ভাত দাও! আগে বাপ খুড়ো খাগ্ তবে সেই পাতে খাস্। আহা, সে ছ সাত বৎসরের মেয়ে অত কি জানে, ভাতের জন্য কাঁদতে লাগ্‌লো। খাশুড়ির ব্যাভার দেখে মেজকাকীমা রাগ কোরে তখনি তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলে। আমাদের কাছে কত দুঃখু করতে লাগলো যে, বাছা একদিন বাড়ি এল, দুটো ভাতের জন্যে কেঁদে চোলে গেল একি মায়ের প্রাণে সয়! তা কেজানে মেয়ে আদরের না অনাদরের!"

"বাবা, এ কালের মেয়েগুলোর মুখের তোড় দেখ যেন ঝড় বয়ে গেল, যা যা আর জলে পড়ে থাকিস্‌নে অসুখ হবে।"

যাহা হউক, অল্পবয়স্কারা আর অধিক উত্তর প্রত্যুত্তর করিল না তাহার স্নান সমাপনান্তে গৃহে চলিয়া গেল। সকলেই আসি-তেছে, অল্পবিস্তর শুনিয়া চলিয়া যাইতেছে কিন্তু পুষ্করিণী-অধি-কারিণীর সেই তৈলমর্দ্দনই চলিতেছে। এমন সময় ব্যস্তসমস্ত হইয়া হরকালীর মায়ের প্রবেশ—কি ব্যাপার!—ইনি ভারি ব্যস্ত—ইহাঁরই গৃহে কাল শাঁক বাজিয়াছে—বধুর পুত্রসন্তান হইয়াছে।

"এ কি ঠাকুরঝি যে আজ গঙ্গা নাইতে যাস্‌নি ? আমি বলি আজ কেবল আমারই যাওয়া হয়নি—তা বোন্ কি করি মেজ বৌমার কাল রাত্রে বেটাছেলেটী হোল—তা ফেলে যাই কি কোরে ? জানিস্ তো একালের মেয়েগুলো সব বিবি হোয়েছে—তাপ সেঁক নেবে না, ঝাল খাবে না—আমি তেমন মেয়ে নই—ঐ জন্যে বৌএদের কখনো প্রসবকালে বাপের বাড়ি পাঠাই না। সেজ বৌএর বাপ আবার ডাক্তর, তিনি তাপ নিতে দেবেন না, ঝাল খেতে দেবেন না—মেয়েকে গদি পেতে শোয়াতে চান—জান ঠাকুরঝি আমাদের যেমন নিয়ম আছে ডাক্তর বলেন ও সব ফেলে দাও—আমি তেমন মেয়ে নই—এই বোসে থেকে বৌকে ভাজা ভাজা কোরে তাপ দিয়ে এলুম এইবার নেয়ে গিয়ে ঝাল খেতে দেব। ডাক্তর আছেন তিনি আছেন—তাঁর মেয়ে ঘরে এনে কি আমি নিয়ম ভঙ্গ করবো। সেবার আঁতুড়ে সেজ বৌএর মেয়েটা গেল, ডাক্তর দেখ্‌তে এসে বল্লেন, এই সব স্যাঁতানে জায়গায় পড়ে ব্যায়ারাম হোয়েছে—বোলে আঁতুড় নাড়তে চান্—আমি তা কিছুতে করতে দিইনি।"

"সে মেয়েটার কই কি ব্যায়ারাম হোয়েছিল, আমি তো শুনিনি—তার উপর না সেই বাবার দৃষ্টি পড়েছিল ?"

"তাই তো বলছি ভাই—ওঁরা বড় বোঝেন, শিশি শিশি ওষুধ এল, গেলাতে চান্—গিল্‌বে কে ? বাবা মুখ চেপে ধোরে আছেন—সে জ্ঞান নেই। ও রোগের যা, রোজা এনে সব কর্‌লুম, তা কিচ্ছু হোল না। হবে কি—রোজা বল্লে যে পোয়াতি চাঁপাফুলের গাছের নিচে গেছ্‌লো—তাই দৃষ্টি পড়েছে। সাহে-

বের মেয়ে, বেটী হয় তো কোন গাছতলায় মাছতলায় গেছলো ও সব তো মানা হয় না। এবার আমি আর বাপের বাড়ি মুখো হোতে দিইনি। সেবার যেন মেয়েটা গেল গেল কিছু ক্ষতি হোল না—এবার বেটাছেলেটী হোয়েছে, একটু ভাল কোরে তাপ সেঁক না দিলে কি হয়। পোয়াতি ভাল থাক্‌লে তবে ছেলের পিত্তেশ—কি বলিস্‌ ভাই?"

"তা বই কি, বংশরক্ষার জন্য বৌএর আদর, নইলে পরের মেয়ে ঘরে এনে জঞ্জাল বই তো নয়। তা হোক্‌ বেটাছেলেটি হোয়েছে—আটকৌড়েতে হাঁড়ি করিস্‌। তোদের স্থতিকা পূজো আছে তো?"

"হ্যাঁ সুতিকাপূজো হবে বই কি—তা লক্ষ বামনের পায়ের ধূলো কোথা পাব, বারোটী বামনের পায়ের ধূলো দেব—আর পূজা আশ্রয় সব হবে। আটকৌড়ে যেমন আর সব বৌএর ছেলেদের বেলা করেছি এরও তেমনি হবে—একহাঁড়ি জলপান একটী করে সিকি, চারটে করে মেঠাই এই সব ঘরে ঘরে দেব—আর বাড়িতে ছেলেরা যারা আসবে তাদের বেটাছেলেদের দু'আনা মেয়েদের চার পয়সা করে দেব। আর বেঁচে বর্ত্তে থাকে তো ভাতটীও দিতে হবে। যেমন বেটাছেলেটী হোয়েছে আহ্লাদের তেমনি খরচপত্রও হবে। এই ধাইকে নগদ এক টাকা একটা ঘড়া কালই দিতে হোল—আবার আসবে বিদেয় নিতে। মেয়ে হোলে সেই যা নাড়ীকাটা একটা টাকা ধরা আছে—আর কি!"

"তা পরমেশ্বর দিন দিয়েছেন আমোদ আহ্লাদ খরচপত্র করবি বই কি। আমার দু মেয়ে এখানে আছে, আমার ঘরে

তিনটে হাঁড়ি দিস, আর আমার সতীনপো বৌও ভিন্ন হোয়েছে।”

“হ্যাঁ ভাই তা বল্লে ভাল এই বাড়ি গিয়ে হাঁড়ির ফর্দ্দ করতে হবে। আবার বাজনা আস্‌বে, তবে নাচ আসবে, তার বিদায় খরচ ঢের”—

“শুনিছিস মিত্তিরদের বোএর আবার মেয়ে হোয়েছে!”

“ওমা বলিস্ কি আবার মেয়ে—কে বল্লে ?”

“এই কেষ্ট রাত থাক্‌তে এসেছিল, আঁতুড় ছুঁয়েছিল কি না, সেই কত দুঃখ খেদ করতে লাগ্‌লো—তারি সঙ্গে কথায় কথায় তো জাহ্নবী নাইতে যাওয়া হোল না—আমি ভোরে কাপড় কাছতে এসেছি আর কেষ্ট এল।”

“হ্যাঁ ঠাকুরঝি গঙ্গা তোমার কার নাম গা ?”

“আমার ছোট খুড়শাশুড়ির নাম “ফঙ্গামণি” তাই আমরা জাহ্নবী বলি—ঠাকুরদের নাম আমাদের প্রায় করবার যো নেই আমাদের বৃহৎ পরিবার সকল নাম বেচে চল্‌তে হয় তো—আমরা তো একেলে নই যে শুদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ির নামটী হদ্দ মেরে কেটে বাচ্‌বো।”

“তাই তো ঠাকুরঝি মিত্তিরদের বৌটো কি গা—এবার গোটা চার পাঁচ মেয়ে হোল বুঝি—আমার বড় বৌমার যেটের কোলে এই দুটী ; দুটী নষ্ট হোয়েছে ; তাই শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে মেজ বৌমারও দুটী বেটা একটা মেয়ে তা মেয়েটা মামার বাড়ি থাকে, দিদিমার আদুরে, মেজ বৌমা বাপের একটী মেয়ে কি না। তা ঐ প্রথম মেয়ে দিদিমাই মানুষ কোরেছে, সে মেয়ের ভার আর আমাদের নিতে হবে না—দিদিমা তাকে হাতের তেলোয় কোরে নাচিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, বেটাছেলে

কোরে কাপড় পরান হয়, হেমন্তকুমারী নাম তা হেম বাবু বোলে ডাকা হয়। সে মেয়ের আদিখ্যেতা কত। আর সেজ বৌএর দুটো মেয়ের একটা সেই অাঁতুড়ে গেছে আর এই খোকাটী হোয়েছে।”

“তা বেঁচে থাক্ আমরা সব পাঁচ কর্ম্মে যাব খাব নেব। আমাদের ঘরের কথা। মেয়েগুলো কেবল মিথ্যা বই তো নয়। স্থতিকা পূজো নেই, আটকড়াই কর আর না কর, ভাত তা বড় সাধ হয় তো পাঁচজনকে এনে খাওয়াও। একটু কেবল পেসাদ মুখে দেওয়া, তার ক্রিয়া নেই কর্ম্ম নেই পিতৃপুরুষ একগণ্ডুষ জল পায় না। ঐ যা বিয়ের সময় একবার পিতৃপুরুষ জল পান বই তো নয়।”

“যাই এই বেলা বাড়ি যাই সেজ বৌএর বাপ হয়তো এসে এতক্ষণ কত হ্যাঙ্গামা করছে। ছেলেরা ছেলেমানুষ তারা তো কথা কইতে বড় পারে না—আমি এমন জবরদস্তি না হোলে রক্ষা ছিলো! আর ছেলেগুলোরও ঐ মত—সব একেলে কিনা। তা আমার ওপর বড় কথা কয়না, বেশি বল্লেই আমি বলি যে এখন বড় হোয়েছিস আমায় মান্‌বি কেন আমি তোদের চারটী নিয়ে বিধবা হোয়ে কত কষ্ট কোরে তোদের এত বড় করলুম এখন আমি পর হলুম শ্বশুরই আপনার হোল। তা ওরা আর বড় কথা কইতে পারে না। এই ছোট ছেলে ঐ একটু মুখফোঁড়—আর কোলের কিনা আদুরে—ওকে কিছু বলতে পারিনে ও অাঁতুড় মাতুড় ছুঁয়ে নেপে স্থষ্টি করে। এই অাঁতুড় উঠবে আর বৌগুলোকে দিয়ে নেপ বালিস পর্য্যন্ত সব কাচিয়ে নেব।”

“ওকথা আর বলিস্‌নে—জাত জন্ম আর রইলনা। একালের ছেলে, ওরা সব একরকম। আমার ছোট জামাই অমনি, সে বার

বিধু প্রসব হোতে এখানে এসেছিল, জামাই রোজ দেখতে আসতো সেই বিছানায় বোসে গল্পসল্প কোরে চোলে যেত। প্রথম যেদিন এল—আমি তখন নাইতে গেছি—মালা হাতে করে দাঁড়িয়েছি আর আঁতুড় থেকে বেরিয়ে আমার থপ্ করে পায়ের ধুলো নিলে। কি করবো বল্লুম বাবা আঁতুড় ছুঁয়ে কি আমায় ছুঁতে আছে আবার হাতে মালা। তা অপ্রস্তুত হোয়ে বলে, "আমার অত মনে ছিল না।" আমি আর কি করব—মালা গেল আবার পুকুরে নেয়ে মরি। তা জামাইএর যে মত মেয়েকে সেই মতেই রাখতে হয়—আমি লুকিয়ে দুটো দুটো গুঁড়ো ঝাল দিই—মেয়ে-গুলোও তেমনি হাত পেতে নিলে কতক খেলে কতক বা না খেলে—বলে ঝাল খেলে মা কেবল জল তেষ্ণা বাড়ে বইতো নয়, তোমরা তো জল দেবে না—শুদ্ধ সাবু খেয়ে থাকলে তেষ্ণাও হয় না জলও চাই না।" কেজানে ভাই ওদের কেমন কথা। আঁতুড়ে তেষ্টা পায়না—আমাদের এমনি তেষ্টা ছিল যে অতি ময়লা জলও এক কোষ চুরি কোরে খেয়েছি। আমাদের কালে ঝাল দিয়ে শুদ্ধ মুখ ধুতে জল দিত। তাতে কি প্রাণ বাঁচে!"

"তা বই কি, আমার এই চারটী গুঁড়ো হোয়েছে ফি বারই আঁতুড়ে মাগীকে পয়সা দিয়ে পায়ে হাতে ধরে জল চুরি কোরে খেয়েছি এদিকে ভাজা ভাজা তাপ, ওদিকে সরা সরা ঝাল—যেমন তেষ্ণা তেমনি গা'র জ্বালা—ওতেই তো শরীর ঝনঝনে হয়। ঐ গো বাজনা এসেছে, তবে আজ আসি।" বলিয়া গামছা নিংড়া-ইতে নিংড়াইতে ভিজা কাপড়ের অঞ্চল স্কন্ধে ফেলিয়া প্রস্থান।

গৃহিণী। "দেখেছিস্ গয়লা বৌ, হরকালির মায়ের তেজ দেখেছিস্! অহংকারে মাটীতে পা পড়ে না, আপনার চার ছেলে

বোলে কেবল জানান হয় আমার চারটী গুঁড়ো। যমের জ্বালা ভুগ্‌তে হয়নি তাই অত জাঁক—ছেলে হোলেই তো হয় না বাঁচাই মূল। যমে না সর্ব্বনাশ করলে আমিও আজ রাজার মা।"

গয়লা বৌ। "তা বৈকি মাঠাকুরুণ যমের জ্বালা বড় জ্বালা। আমার দু ছেলে দু মেয়ে যমকে দিয়েছি এখন দুটী মেয়ে একটী ছেলে নিয়ে প্রাণ ধোরে আছি—বড়টী শশুর বাড়ি গেছে, মা কেঁদে কেঁদে মরছি। মা আমরা দুঃখী মানুষ তা বাছারা আমার এমন যে আমার পয়সা নেই কেমন বোঝে—পাছে চাইলে না দিতে পারি তাই এত সোণার সামগ্রী পাড়ায় আছে কখনো খেতে কিনতে চায় না।

গৃহিণী। "তোর মেয়েটী না বেশ ভাগ্যিমন্তের ঘরে পড়েছে?"

গয়লা বৌ। "হ্যাঁ মা, তোমার আশীর্ব্বাদে তারা বড় ভাগ্যি-মন্ত, আর আমার নয়নতারাকে খুব যত্ন করে। কিন্তু তা বোলে কি মায়ের মন বোঝে—আমি যে সকালে এক পয়সার মুড়ি তিন জনকে দিতে পারি না, তাতে যে আমার বুক ফেটে যায়।"

গৃহিণী। "তা কি করবি কাঁদিসনে চুপ কর্। মেয়েজন্ম পরের ঘরে যাবার জন্যেই হয়েছে। তাই তো বলি গয়লা বৌ মেয়েগুলো মিথ্যা। দু দিন বাদে পরের ঘর যাবে—তা বলে একালের মেয়েদের কাছে তা বলবার যো নেই।"

গয়লা বৌ। "তা মা দুদিন বাদে শ্বশুরবাড়ি যাবে বোলেই তো আমার প্রাণ কেমন করে তাই জন্যেই তো মা আমি মেয়ে দুটীকে না দেখে থাক্‌তে পারিনে। বেটাছেলে মা বেঁচে থাক্‌লে ওরা আপনারা আন্‌বে নেবে, বৌ হবে আদর যত্ন চির-দিন পাবে—আমার প্রাণ ঠাণ্ডা থাক্‌বে। মেয়েদের মা না

করলে আর কে করবে ? খাশুড়ী ননদ অত করবে না—দুদিন বাদে মেয়েরা আবার মা হবে—আপনার ছানাপোনা নিয়েই ব্যস্ত হবে। আজ যদি মা আমি না আদর করি তো কে আর তাদের আদর করবে ?”

গৃহিণী। “তা বই কি। তোর ঢের গেছে কি না তাই তোর বেশি মায়া—নইলে জগত জুড়ে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের আদর কম। ছেলেটী হোয়েছে বল্‌তে দশ হাত বুক হয়—শুন্‌তে কেমন। ঘটাঘটি আমোদ আহ্লাদ হয়। সাত ছেলে হোলেও অরুচি নেই। মেয়ে প্রথম হোলে, লোকে বলে তা হোক্—এইবারে ছেলে হবে। প্রথম যা হয়েছে বেঁচে থাক্—জেঁয়াচ বজায় থাকলে তবে তো মঙ্গল। তবে তো ছেলের পিত্তেশ।”

গয়লা বৌ। “হ্যাঁ মা, যাই বেলা হোল।”

ক্রমে ঘাট শূন্য হইয়া আসিল—স্বপ্নময় মোহমুগ্ধ নয়নে আসিয়াছিলাম, সত্যের তীব্রতা লইয়া ফিরিলাম। প্রকৃতি জননীর আর সেই মধুর স্নেহময় ভাব নাই—এখন চারিদিকে কর্ত্তব্যের ঘোর শাসন—কর্ত্তব্য লইয়া সকলে ছুটাছুটি করিতেছে। নয়নে আর সেই মোহ নাই—সূর্য্যালোকে সকলি পরিষ্কার স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। মনে জাগিতেছে আদরের না অনাদরের! স্নেহেও পক্ষপাতিতা আছে—শুধু স্নেহে নহে—মাতৃস্নেহেও আছে—মাতাও কন্যা অপেক্ষা পুত্রকে অধিক স্নেহ যত্ন করিয়া থাকেন। ভাবিতে ভাবিতে শয্যাসম্মুখে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, আমার সে ফুলটী এখনো ফুটিয়া উঠে নাই—আমার চুম্বনের সূর্য্যালোক এখনো সে ফুল স্পর্শ করে নাই তাই এখনো সে ফোটে নাই—নিঃশঙ্ক সুষুপ্ত মুখে যেন লেখা রহিয়াছে পড়িলাম—

"অনুগ্রহ কোরে এই কোরো, অনুগ্রহ কোর' না এ জনে।"

আমি তাহাকে চুম্বন করিলাম—হাসিয়া আঁখি মেলিয়া সে আমার মুখের পানে চাহিল। আমি বুকে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—মা আমার, তুমি আদরের না অনাদরের?——আমি আদরের!——

জ্যোতির্বিজ্ঞান। স্পেক্‌ট্রস্কোপ ও ফটোগ্রাফি।

মনুষ্যজাতি যখন একান্ত অসভ্য অবস্থা হইতে উন্নতিপথে কিছু দূর অগ্রসর হইল তখন তাহারা নিজ পরিবারের আহারের ব্যবস্থা করিয়াও অন্য প্রকার চিন্তার ও কার্য্যের অবসর পাইতে আরম্ভ করিল। সেই সময় হইতেই বিশ্বের বিচিত্র শোভা তাহাদের আনন্দের ও বিস্ময়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রথম প্রথম তাহাদের চতুষ্পার্শীয় জীবজন্তু গাছপালার সহিত অপেক্ষাকৃত পরিচয় থাকায় উহাদের মধ্যে কৌতূহলের বা বিস্ময়ের কারণ কিছুই দেখিতে পাইত না। পৃথিবীর বাহিরের চন্দ্র সূর্য্য তারার প্রতি তাহাদের চিত্তের কিছু অধিক আকর্ষণ দেখা দিল। এই জন্যই জ্যোতির্বিদ্যা সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞানের আকার ধারণ করিল।

সর্ব্বাগ্রে, অবশ্য, চন্দ্র সূর্য্য তারা যে পৃথিবীর এক প্রান্তে উদয় হইয়া অপর প্রান্তে অস্ত যায় ইহাই সকলের চক্ষে পড়িল; ক্রমে সূর্য্য এবং চন্দ্রের যে এক স্থানে নিয়মিত উদয় এবং অস্ত

হয় না তাহা ধরা পড়িল এবং যাহারা অধিক সূক্ষ্মদর্শী তাহারা দেখিল যে, গ্রহদের গতিও এইরূপ জটিল।

চক্ষুর কার্য্য এইখানেই ফুরাইল—ইহার পর নূতন কিছু বাহির করিতে হইলে যুক্তি বা যন্ত্রের সাহায্য আবশ্যক হইয়া পড়িল। কিন্তু আমাদের দেশে দুইটার মধ্যে কোনটা বড় একটা লওয়া হইল না। সুতরাং ভারতবর্ষের জ্যোতিষ শাস্ত্র কিছু দূর অগ্রসর হইয়া ক্ষান্ত রহিল এবং ফলিত জ্যোতিষ নামক জটিল শাস্ত্র তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিল। বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় এই শাস্ত্রের সত্য মিথ্যা বিচার বোধ করি অসম্ভব এবং অনাবশ্যক।

ইতিমধ্যে য়ুরোপে টলেমি, কোপর্নিকস্, গ্যালিলিও, কেপ্‌লর, ন্যুটন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কি রূপে জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতি সাধন করিলেন সকলেরই কিছু না কিছু জানা আছে। টলেমি, আকাশে পৃথিবীবেষ্টনকারী বিবিধ স্ফীত স্ফটিক গোলক কল্পনা করিয়া লইয়া চন্দ্র সূর্য্য গ্রহের যে গতিবিধি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ভ্রমসংকুল হইলেও তাহাতে একটুকু সত্য রহিয়া গিয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, জ্যোতিষ্কদিগের যে জটিল গতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহা বাস্তবিক কতকগুলি চক্রাকার গতির সংমিশ্রনের ফল। ভাবিয়া দেখিতে গেলে সেকালের পক্ষে এইটুকু আবিষ্কারই যথেষ্ট আশ্চর্য্য এবং বোধ হয় যে, টলেমি যদি পৃথিবীর অভ্যন্তরের বস্তু ও ঘটনার প্রতি আর একটু দৃষ্টি দিতেন তাহা হইলে তিনিই বুঝিতে পারিতেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পৃথিবীর চারিদিকে না ঘুরিয়া পৃথিবীই ঘুরিতেছে।

যাহা হৌক কোপর্ণিকস্ আসিয়া টলেমির ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, কোনপ্রকার যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে তিনি গ্রহগণের দূরত্ব এবং গতিবেগ মোটামুটি নির্ণয় করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারও দুই একটি ভ্রম রহিয়া গিয়াছিল; যথা, তিনি সূর্য্যকে শুধু সৌরজগতের নহে, সমস্ত বিশ্বের কেন্দ্রে স্থিত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু এ মত কেহ গ্রহণ না করাতে ইহাতে জ্যোতিষশাস্ত্রের কোন অনিষ্ট হইল না।

গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার ও নির্ম্মাণ করিয়া মনুষ্যের দর্শনেন্দ্রিয় সহস্র গুণ বলবান করিলেন এবং নব নব শোভা দেখাইয়া মানব জাতির অনুসন্ধান-তৃষ্ণা আরও প্রবল করিয়া তুলিলেন।

কেপ্লর কোপর্ণিকসের মোটামুটি সিদ্ধান্তগুলিকে সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ করিয়া দিলেন। গ্রহগণের অয়নমণ্ডল যে বৃত্তাভাসাকার * এবং সূর্য্য সেই বৃত্তাভাসের দুই অধিশ্রয়ের * মধ্যে একটি অবলম্বন করিয়া স্থিত ইহা বাহির করিয়া ন্যূটনের জগদ্বিখ্যাত আবিষ্ক্রিয়ার পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। তাঁহাকে বড়ই পরিশ্রম করিয়া ইহা বাহির করিতে হইয়াছিল, কারণ তখনও অঙ্কশাস্ত্রের তাদৃশ উন্নতি হয় নাই। তিনি অনুমানের দ্বারা

* বৃত্তাভাস=Ellipse—ডিম্বের ন্যায় আকার বিশেষ। বৃত্ত যেরূপ কেন্দ্রস্থানে সূতার এক প্রান্ত ধরিয়া অপর প্রান্তের দ্বারা অঙ্কিত হয়, বৃত্তাভাস সেইরূপ দুই অধিশ্রয়ের (focus) স্থানে সূতার দুই প্রান্ত বাঁধিয়া অঙ্কিত হইতে পারে।

অয়নমণ্ডলের এক এক প্রকার আকার কল্পনা করিয়া সেই অনুসারে কোন্ নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন্ গ্রহ কোথায় থাকা উচিত তাহা গণনা করিতেন—সে স্থানে যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট গ্রহকে দেখিতে পাইলে বুঝিতেন যে কল্পিত আকার ঠিক হইয়াছে।

ইহাঁর পর ন্যূটনের অভ্যুদয়। গ্রহগণের অয়নমণ্ডলের আকৃতি আলোচনা করিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, কোনও এক শক্তির দ্বারা গ্রহগণের কেন্দ্র সূর্য্যের কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। অনেকে মনে করেন যে, এই মাধ্যাকর্ষণী শক্তির আবিষ্কার বুঝি ন্যূটনের খ্যাতির প্রধান কারণ—কিন্তু তাহা নহে। ন্যূটন যে, বলিতে পারিয়াছিলেন যে, হস্ত হইতে প্রস্তর খণ্ড বা বৃক্ষ হইতে ফলের পতন যে শক্তির দ্বারা নিয়মিত হইতেছে সেই একই বিশ্বব্যাপী শক্তির বলে চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে এবং সূর্য্য তাহার অজ্ঞাত অনন্ত পথে চালিত হইতেছে, ইহাই তাঁহার গৌরব। এই এক কথায় যেন জড়জগতের একটা প্রকাণ্ড রহস্য-আবরণ ভাঙ্গিয়া গেল—বিজ্ঞান নূতন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বময় অসঙ্কোচে নিজ অধিকার স্থাপন করিল।

ইহার পর কিছুদিন জ্যোতিষ শাস্ত্র কলের মত চলিতে লাগিল। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি এই কয়টি গ্রহ জানা ছিল। য়ুরানস্ এবং নেপ্ট্যুন আবিষ্কৃত হইল। গ্রহগণের গতি কি সুন্দররূপে স্থির করা হইয়াছিল নেপ্ট্যুনের আবিষ্ক্রিয়া তাহার দৃষ্টান্ত। য়ুরানস্ যে সময়ে যেখানে থাকিবার কথা সে সময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইতে পারিত না। কিন্তু সকলেই জানিল গণনার ভুল হওয়া অসম্ভব, নিশ্চয়ই অন্য কোন

কারণ আছে। স্থির হইল যে, কোন এক অনাবিষ্কৃত গ্রহ তাহার আকর্ষণী শক্তি দ্বারা য়ুরানসের গতির বিকৃতি ঘটাইতেছে। কিরূপ গ্রহ কতদূরে থাকিলে এইরূপ বিকৃতি ঘটিতে পারে গণনা করিয়া যথাস্থানে দুরবীক্ষণের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি পাঠাইবামাত্র নেপ্‌ট্যুন ধরা পড়িল! মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মধ্যে যে প্রকাণ্ড ব্যবধান ছিল তাহার মধ্যে একে একে বিস্তর ক্ষুদ্র গ্রহখণ্ড প্রকাশ হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে সকল ছায়াপথকে নীহারিকা-রাশি বলিয়া ধারণা ছিল তাহাদের অধিকাংশ অসংখ্য ক্ষুদ্র তার-কার সমষ্টি বলিয়া জ্ঞাত হইল। উজ্জ্বলতার তারতম্য অনুসারে শ্রেণী বিভাগ * করিয়া নক্ষত্রগণের তালিকা প্রস্তুত হইতে চলিল।"

এমন কি, কিছু দিন পরে কার্য্য ফুরাইবার উপক্রম হইল। জ্যোতিষীরা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। নূতন ধূমকেতু বা নূতন গ্রহখণ্ড যে আবিষ্কার করিবার ছিল না তাহা নহে। নক্ষত্রের তালিকা সম্পূর্ণ হয় নাই এবং দুই একটি নূতন তালিকায় প্রবৃত্ত হইলে উপকার বৈ অপকারের সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু সমস্ত জীবন কেবলমাত্র তালিকা করা জ্যোতিষীরা নিজ বুদ্ধির এবং পরিশ্রমের অপব্যবহার মনে করিতে আরম্ভ করিলেন। দার্শ-নিকরাও হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। দার্শনিক কঁৎ (Comte) জ্যোতিষ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে এক স্থানে বলিয়া গিয়াছেন যে, এই শাস্ত্রের অন্তর্গত কতকগুলি বিবরণ আমরা

* শুধু চোখে আমরা যে তারাগুলি দেখিতে পাই তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ১৪ ১৫টি প্রথম শ্রেণীয়। তাহার পরের ৫০টি দ্বিতীয় শ্রেণীয়। ইত্যাদি। অবশেষে যে গুলি সহজ দৃষ্টিতে কেবল দেখা যায় মাত্র সে গুলি ষষ্ঠ শ্রেণীয়। ইহা হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীয় তারা কিরূপ তাহা কতক পরিমাণে অনুমানে করা যাইতে পারিবে।

কোন কালেই কিছু জানিতে পারিব না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়াছেন যে,জ্যোতিষ্কগণের গুরুত্ব দূরত্ব বা আয়তন আমরা যতই ঠিক বাহির করি না কেন,তাহারা কোন্ কোন্ পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত ইহা আমাদের জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীতে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল যখন একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র এই সকল অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া পুনর্ব্বার জ্যোতিষ শাস্ত্রকে জাগাইয়া তুলিল।

উৎসবের সময় আমরা সকলেই দেয়ালগিরির ভগ্ন কাচখণ্ড লইয়া ছেলেবেলায় খেলা করিয়াছি এবং তাহার ভিতর দিয়া সকল বস্তুকে নানা বর্ণযুক্ত দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি, কিন্তু বোধ করি কেহ কখনো স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এই কাচখণ্ডের এত ক্ষমতা—যে, ইহার দ্বারা আমরা কেবল মাত্র চর্ম্ম-চক্ষে লাল নীল রং না দেখিয়া মানস-চক্ষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিপ্রকরণ পর্য্যন্ত দেখিবার সাহায্য পাইব। স্পেক্‌ট্রস্কোপ নামে এইরূপ ত্রিকোণা-কাচবিশিষ্ট যন্ত্রটির সহিত অনেকে পরিচিত আছেন। যাঁহারা পরিচিত নহেন তাঁহাদের জন্য অল্পই বলা আবশ্যক। সকলেই জানেন যে, যে কোন পদার্থ যথেষ্ট উত্তপ্ত হইলেই বাষ্পীভূত হয়। কোন ত্রিকোণা কাচের ভিতর দিয়া এই বাষ্প নিরীক্ষণ করিলে দেখা যায় যে এক এক পদার্থের বাষ্পের এক এক বিশেষ রং। রং দেখিলেই জানা যায় যে কোন্ বস্তুর বাষ্প দেখিতেছি। কিন্তু এই কাচ দিয়া কোন জ্বলন্ত বস্তুর রং দেখিলে দেখা যায় যে উহাতে লাল নীল সবুজ প্রভৃতি সকল মৌলিক রংই আছে। ত্রিকোণা কাচের ক্ষমতাই এই যে, উহা জ্বলন্ত বস্তুর প্রকাশমান শ্বেত রশ্মিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলে। জ্বলন্ত বস্তুর সম্পূর্ণ রশ্মি যদি পূর্ব্বোক্ত বাষ্পের ভিতর

দিয়া আসে তাহা হইলে প্রত্যেক বাষ্প উক্ত রশ্মি হইতে নিজ নিজ রং আত্মসাৎ পূর্ব্বক আটক করিয়া রাখে—স্পেক্ট্রস্কোপ দিয়া দেখিতে গেলে সেই সেই রঙের স্থান শূন্য দেখা যায়। কোন্ কোন্ রং নাই তাহাই দেখিলে উক্ত রশ্মি কোন্ কোন্ বাষ্পের ভিতর দিয়া আসিয়াছে বুঝা যায়।

সূর্য্য নক্ষত্রাদি জ্বলন্ত জ্যোতিষ্কের উপরিস্থিত সকল বস্তুই তাহাদের প্রচণ্ড উত্তাপে বাষ্পীকৃত হইয়া তাহাদের আবরণস্বরূপে বিরাজ করিতেছে। অতএব সূর্য্যের সম্পূর্ণ রশ্মি স্পেক্ট্রস্কোপ দ্বারা নিরীক্ষণ করিয়া যে যে রঙের অভাব দেখা যায় তদনুসারে জানা যায় সূর্য্যের উপরে কোন্ কোন্ পদার্থের বাষ্প আছে।* এবং সূর্য্য কি কি উপাদানে নির্ম্মিত তাহাও এই উপায়ে ধরা পড়ে। নক্ষত্রগুলিও সূর্যের ন্যায় বাষ্পাবৃত জ্বলন্ত পিণ্ড, ইহাদের সম্বন্ধেও এইসকল যুক্তি খাটে। এইরূপ অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ পদার্থ সূর্য্য এবং নক্ষত্রাদিতে পাওয়া যায়—অধিক মাত্রায় জলজান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দূরবীক্ষণযোগে সকলে যেগুলিকে নীহারিকারাশি মনে করিত সেগুলির অধিকাংশ তারার সমষ্টি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। সকলের ধারণা হইয়া গিয়াছিল দূরবীক্ষণ আরও উন্নতি লাভ করিলে সকল নীহারিকাই বুঝি তারারূপে ধরা দিবে। স্পেক্ট্রস্কোপ্ দ্বারা জানা গেল যে তাহা নহে কতকগুলি বাস্তবিক নীহারিকা আছে এবং তাহারা জ্বলন্ত জলজানরাশি মাত্র।

ইতিপূর্ব্বেই লাপ্লাস অনুমান করিয়াছিলেন যে সমুদয় জ্যোতিষ্ক নীহারিকার ন্যায় বাষ্পীয় অবস্থায় একত্রে মিশিয়া ছিল, এবং তাহা হইতে ক্রমে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বর্ত্তমান স্বাতন্ত্র্য ও

উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহার পর তাহার আর বড় সন্দেহ রহিল না।

আর একটি যন্ত্রের কথা বাকি আছে। এ পর্য্যন্ত যন্ত্রগুলি চক্ষের সাহায্য করিতেছিল মাত্র। ফটোগ্রাফিক ক্যামেরায় আমরা যেন একটি নূতন চক্ষু পাইলাম। আমাদের নিজ চক্ষু অপেক্ষা ইহাতে চারিটি অধিক ক্ষমতা আছে। প্রথমতঃ ইহা আমাদের চক্ষু অপেক্ষা শীঘ্র দেখিতে পায়। মুহূর্ত্তের সহস্র ভাগের এক ভাগে সূর্য্যের একটি চিত্র পাইতে পারি ; চক্ষু বহুকালের পরিশ্রমে যাহা দেখিতে পাইত সে চিত্রে তাহা সমস্তই অঙ্কিত হয়। দ্বিতীয়তঃ ইহা অধিক দূরের দৃশ্য দেখিতে পায়। যে সকল তারা কোনো দূরবীক্ষণ যোগে কোনো চক্ষু দেখিতে পায় না, তাহার আলোকরেখা আসিয়া ইহাতে নিজ চিত্র রাখিয়া যায়। তৃতীয়তঃ ইহার অধিকক্ষণ ধরিয়া দেখিবার ক্ষমতা আছে। আমাদের চক্ষু দুই চারি মুহূর্ত্তে যাহা দেখিতে পায় তাহার অধিক আর কিছুতেই দেখিতে পাইবে না। কিন্তু ইহা যত অধিক ক্ষণ তাক্‌াইয়া থাকে ততই অধিক দৃশ্য এবং ততই উত্তমরূপে দেখিতে পায়। চতুর্থতঃ ইহার সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ক্ষমতা এই যে, যাহা কিছু একবার ইহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় তাহা স্থায়ীরূপে থাকিয়া যায়।

বাস্তবিকই এই নূতন চক্ষু পুরাতন অপেক্ষা শীঘ্র এবং সুন্দরতররূপে কার্য্য করিতে পারে। একটি সচরাচর দূরবীক্ষণের সাহায্যে আমরা বহুরাত্রি অসম্ভব পরিশ্রম করিলে চতুর্দ্দশ শ্রেণীর তারা পর্য্যন্ত, সংখ্যায় সবসুদ্ধ ৪০,০০,০০০ তারা দেখিতে পাই। শুধু চোখে যাহা দেখিতাম ফটোগ্রাফ ফলকে তাহার চিত্র এক মুহূর্ত্তে পাওয়া যায়। ১৫ মিনিট কালে চক্ষু এবং দূরবীক্ষণের সীমা

ছাড়াইয়া যায় এবং আরও কিছুকাল রাখিলে আমরা ষোড়শ শ্রেণী পর্য্যন্ত অর্থাৎ সংখ্যায় ৪০০,০০,০০০ তারার চিত্র দেখিতে পায়।

ইহা বলিলে কি বুঝায় একবার ভাবিয়া দেখা যাক। সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৯১০,০০,০০০ মাইল দূরে স্থিত। আলোক এত দ্রুতগতি যে এই ব্যবধান পার হইতে তাহার মোটে ৮ মিনিট কাল ব্যয় হয়। উক্ত ষোড়শ শ্রেণীর নক্ষত্র হইতে সে আলোক পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ বৎসরে পঁহুছায়। আমরা আজি আমাদের ক্যামেরায় লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেকার চিত্র দেখিতেছি! যখন সেই আলোকরেখা যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল তখন পৃথিবীর অস্তিত্বই ছিল না—যখন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তখন হয়ত সেই নক্ষত্রের জ্বলন্ত অবস্থা গিয়াছে, হয়ত আমাদের বর্ত্তমান পৃথিবীর ন্যায় উহা ফল ফুল প্রভৃতি অসংখ্য শোভায় শোভিত কিম্বা হয়ত তাহাও ফুরাইয়া গিয়াছে আমরা যাহার জ্বলন্ত চিত্র দেখিতেছি তাহা হয়ত এক্ষণে জীবশূন্য জড়পিণ্ড মাত্র! আমাদের এবং সকল জ্যোতিষ্কের সে অবস্থা একদিন না একদিন ঘটিবে।

ইহার পর যখন ভাবিয়া দেখি যে, এই নক্ষত্রসকলের কতকগুলিকে আমরা ওজন করিতে পারিতেছি, কতকগুলির দূরত্ব এবং গতিবেগ নির্ণয় করিতে পারিতেছি, এমন কি উহারা সকলে কোন্ পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত তাহাও বলিয়া দিতে পারিতেছি তখন সত্য সত্যই নিজ ক্ষমতা ভাবিয়া হতবুদ্ধি হইতে হয়। আমাদের এই একমুষ্টি মস্তিষ্ক চালনা করিয়া আমরা কি না করিতেছি—ভবিষ্যতে কি না করিতে পারিব! জ্যোতিষশাস্ত্রেই আমাদের এই সুদূরগামিনী ক্ষমতার পরিচয়—এই জন্যই ইহার সর্ব্বপ্রথম বিকাশ এবং এই জন্যই ইহার এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি।

সাধনা।

কঙ্কাল।

আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম, তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলান থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলা খট্‌খট্‌ শব্দ করিয়া নড়িত। দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত। আমরা তখন পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট মেঘনাদবধ এবং ক্যাম্বেল স্কুলের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা পড়িতাম। আমাদের অভিভাবকের ইচ্ছা ছিল আমাদিগকে সহসা সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিবেন—তাঁহার অভিপ্রায় কতদূর সফল হইয়াছে যাঁহারা আমাদিগকে জানেন তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করা বাহুল্য এবং যাঁহারা জানেন না তাঁহাদের নিকট গোপন করাই শ্রেয়।

তাহার পর বহুকাল অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে সেই ঘর হইতে কঙ্কাল এবং আমাদের মাথা হইতে অস্থিবিদ্যা কোথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে অন্বেষণ করিয়া জানা যায় না।

অল্পদিন হইল একদিন রাত্রে কোন কারণে অন্যত্র স্থানাভাব হওয়াতে আমাকে সেই ঘরে শয়ন করিতে হয়। অনভ্যাসবশতঃ ঘুম হইতেছে না। এপাশ ওপাশ করিতে করিতে গির্জ্জার ঘড়িতে বড় বড় ঘণ্টাগুলো প্রায় সব ক’টা বাজিয়া

গেল। এমন সময়ে ঘরের কোণে যে তেলের সেজ জ্বলিতে-ছিল সেটা প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরিয়া খাবি খাইতে খাইতে একেবারে নিবিয়া গেল। ইতিপূর্ব্বেই আমাদের বাড়িতে দুই একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তাই এই আলো নেবা হইতে সহজেই মৃত্যুর কথা মনে উদয় হইল। মনে হইল, এই যে রাত্রি দুই প্রহরে একটি দীপশিখা চিরান্ধকারে মিলাইয়া গেল, প্রকৃতির কাছে ইহাও যেমন, আর মানুষের ছোট ছোট প্রাণশিখা কখনো দিনে কখনো রাত্রে হঠাৎ নিবিয়া বিস্মৃত হইয়া যায় তাহাও তেমনি।

ক্রমে সেই কঙ্কালের কথা মনে পড়িল। তাহার জীবিত-কালের বিষয় কল্পনা করিতে করিতে সহসা মনে হইল একটি চেতন পদার্থ অন্ধকারে ঘরের দেয়াল হাতড়াইয়া আমার মশারির চারদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে। সে যেন কি খুঁজিতেছে পাই-তেছে না এবং দ্রুততরবেগে ঘরময় প্রদক্ষিণ করিতেছে। নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম সমস্তই আমার নিদ্রাহীন উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা। এবং আমারই মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করিয়া যে রক্ত ছুটিতেছে তাহাই দ্রুত পদশব্দের মত শুনাইতেছে। কিন্তু তবু গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। জোর করিয়া এই অকারণ ভয় ভাঙ্গিবার জন্য বলিয়া উঠিলাম "কেও!" পদশব্দ আমার মশারির কাছে আসিয়া থামিয়া গেল এবং একটা উত্তর শুনিতে পাইলাম "আমি। আমার সেই কঙ্কালটা কোথায় গেছে তাই খুঁজিতে আসিয়াছি।"

আমি ভাবিলাম, নিজের কাল্পনিক সৃষ্টির কাছে ভয় দেখান কিছু নয়—পাশবালিশটা সবলে আঁকড়িয়া ধরিয়া চিরপরিচিতের

মত অতি সহজ সুরে বলিলাম—"এই দুপর রাত্রে বেশ কাজটি বাহির করিয়াছ! তা, সে কঙ্কালে এখন আর তোমার আবশ্যক!"

অন্ধকারে মশারির অত্যন্ত নিকট হইতে উত্তর আসিল "বল কি! আমার বুকের হাড় যে তাহারই মধ্যে ছিল! আমার ছাব্বিশ বৎসরের যৌবন যে তাহার চারিদিকে বিকশিত হইয়াছিল—একবার দেখিতে ইচ্ছা করে না?"

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম "হাঁ। কথাটা সঙ্গত বটে। তা তুমি সন্ধান করগে যাও। আমি একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করি।"

সে বলিল "তুমি একলা আছ বুঝি। তবে একটু বসি। একটু গল্প করা যাক্। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমিও মানুষের কাছে বসিয়া মানুষের সঙ্গে গল্প করিতাম। এই পঁয়ত্রিশটা বৎসর আমি কেবল শ্মশানের বাতাসে হুহু শব্দ করিয়া বেড়াইয়াছি—আজ তোমার কাছে বসিয়া আর একবার মানুষের মত করিয়া গল্প করি।"

অনুভব করিলাম, আমার মশারির কাছে কে বসিল। নিরুপায় দেখিয়া আমি বেশ একটু উৎসাহের সহিত বলিলাম—"সেই ভাল। যাহাতে মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠে এমন একটা কিছু গল্প বল।"

সে বলিল "সব চেয়ে মজার কথা যদি শুনিতে চাও ত আমার জীবনের কথা বলি।" গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুটা বাজিল।

"যখন মানুষ ছিলাম এবং ছোট ছিলাম তখন এক ব্যক্তিকে যমের মত ভয় করিতাম। তিনি আমার স্বামী। মাছকে বঁড়শি দিয়া ধরিলে তাহার যেমন মনে হয় আমারও সেইরূপ মনে হইত। অর্থাৎ কোন্ এক সম্পূর্ণ অপরিচিত জীব যেন বঁড়শিতে

গাঁথিয়া আমাকে আমার স্নিগ্ধ গভীর জন্ম-জলাশয় হইতে টান মারিয়া ছিনিয়া লইয়া যাইতেছে—কিছুতে তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। বিবাহের দুই মাস পরেই আমার স্বামীর মৃত্যু হইল এবং আমার আত্মীয় স্বজনেরা আমার হইয়া অনেক বিলাপ পরিতাপ করিলেন। আমার শ্বশুর অনেকগুলি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিয়া শাশুড়ীকে কহিলেন, 'শাস্ত্রে যাহাকে বলে বিষকন্যা, এ মেয়েটি তাই।' সে কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।—শুনিতেছ? কেমন লাগিতেছে?"

আমি বলিলাম—"বেশ। গল্পের আরম্ভটি বেশ মজার।"

"তবে শোন। আনন্দে বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। ক্রমে বয়স বাড়িতে লাগিল। লোকে আমার কাছে লুকাইতে চেষ্টা করিত কিন্তু আমি নিজে বেশ জানিতাম আমার মত রূপসী এমন যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। তোমার কি মনে হয়?"

"খুব সম্ভব। কিন্তু আমি তোমাকে কখন দেখি নাই।"

"দেখ নাই! কেন? আমার সেই কঙ্কাল! হি হি হি হি! আমি ঠাট্টা করিতেছি! তোমার কাছে কি করিয়া প্রমাণ করিব, যে, সেই দুটো শূন্য চক্ষুকোটরের মধ্যে বড় বড় টানা দুটি কালো চোখ ছিল, এবং রাঙা ঠোঁটের উপরে যে মৃদু হাসিটুকু মাখানো ছিল এখনকার অনাবৃত দন্তসার বিকট হাস্যের সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না। এবং সেই কয়খানা দীর্ঘ শুষ্ক অস্থিখণ্ডের উপর এত লালিত্য, এত লাবণ্য, যৌবনের এত কঠিন-কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা প্রতিদিন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছিল, তোমাকে তাহা বলিতে গেলে হাসি পায় এবং রাগও ধরে। আমার সেই শরীর হইতে যে অস্থিবিদ্যা শেখা যাইতে পারে তাহা তখনকার বড় বড় ডাক্তারেরাও বিশ্বাস করিত না। আমি

জানি, একজন ডাক্তার তাঁহার কোন বিশেষ বন্ধুর কাছে আমাকে কনকচাঁপা বলিয়াছিলেন। তাহার অর্থ এই, পৃথিবীর আর সকল মানুষই অস্থিবিদ্যা এবং শারীরতত্ত্বের দৃষ্টান্তস্থল ছিল কেবল আমিই সৌন্দর্য্যরূপী ফুলের মত ছিলাম। কনকচাঁপার মধ্যে কি একটা কঙ্কাল আছে?

"আমি যখন চলিতাম তখন আপনি বুঝিতে পারিতাম, যে, একখণ্ড হীরা নড়াইলে তাহার চারিদিক হইতে যেমন আলো ঝক্‌মক্ করিয়া উঠে, আমার দেহের প্রত্যেক গতিতে সৌন্দর্য্যের ভঙ্গী নানা স্বাভাবিক হিল্লোলে চারিদিকে ভাঙ্গিয়া পড়িত। আমি মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের হাত দুখানি নিজে দেখিতাম—পৃথিবীর সমস্ত উদ্ধত পৌরুষের মুখে রাশ লাগাইয়া মধুরভাবে বাগাইয়া ধরিতে পারে এমন দুইখানি হাত। সুভদ্রা যখন অর্জ্জুনকে লইয়া দৃপ্ত ভঙ্গীতে আপনার বিজয়-রথ বিস্মিত তিন লোকের মধ্যে দিয়া চালাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার বোধ করি এইরূপ দুখানি অস্থূল সুডোল বাহু, আরক্ত করতল এবং লাবণ্যশিখার মত অঙ্গুলি ছিল।

"কিন্তু আমার সেই নির্লজ্জ,নিরাবরণ, নিরাভরণ চিরবৃদ্ধ কঙ্কাল তোমার কাছে আমার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। আমি তখন নিরুপায় নিরুত্তর ছিলাম। এই জন্য পৃথিবীর সব চেয়ে তোমার উপর আমার বেশি রাগ। ইচ্ছা করে আমার সেই ষোল বৎসরের জীবন্ত, যৌবনতাপে উত্তপ্ত আরক্তিম রূপখানি একবার তোমার চোখের সাম্‌নে দাঁড় করাই, বহুকালের মত তোমার দুই চক্ষের নিদ্রা ছুটাইয়া দিই, তোমার অস্থিবিদ্যাকে অস্থির করিয়া দেশছাড়া করি।"—

আমি বলিলাম "তোমার গা যদি থাকিত ত গা ছুঁইয়া বলি-

তাম, সে বিদ্যার লেশমাত্র আমার মাথায় নাই। আর তোমার সেই ভুবনমোহন পূর্ণ যৌবনের রূপ রজনীর অন্ধকার-পটের উপরে জাজ্বল্যমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর অধিক বলিতে হইবে না।”

“আমার কেহ সঙ্গিনী ছিল না। দাদা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন বিবাহ করিবেন না। অন্তঃপুরে আমি একা। বাগানের গাছ-তলায় আমি একা বসিয়া ভাবিতাম সমস্ত পৃথিবী আমাকেই ভালবাসিতেছে। সমস্ত তারা আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। বাতাস ছল করিয়া বারবার দীর্ঘনিশ্বাসে পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং যে তৃণাসনে পা দুটি মেলিয়া বসিয়া আছি তাহার যদি চেতনা থাকিত তবে সে পুনর্ব্বার অচেতন হইয়া যাইত। পৃথিবীর সমস্ত যুবাপুরুষ ঐ তৃণপুঞ্জরূপে দল বাঁধিয়া নিস্তব্ধে আমার চরণবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছে এইরূপ আমি কল্পনা করিতাম। হৃদয়ে অকারণে কেমন বেদনা অনুভব হইত।

“দাদার বন্ধু শশিশেখর যখন মেডিকাল কালেজ হইতে পাশ হইয়া আসিলেন তখন তিনিই আমাদের বাড়ির ডাক্তার হইলেন। আমি তাঁহাকে পূর্ব্বে আড়াল হইতে অনেকবার দেখিয়াছি দাদা অত্যন্ত অদ্ভুত লোক ছিলেন—পৃথিবীটাকে যেন ভাল করিয়া চোখ মেলিয়া দেখিতেন না। সংসারটা যেন তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট ফাঁকা নয়—এই জন্য সরিয়া সরিয়া একেবারে প্রান্তে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহার বন্ধুর মধ্যে এক শশিশেখর। এই জন্য, বাহিরের যুবকদের মধ্যে আমি এই শশিশেখরকেই সর্ব্বদা দেখিতাম। এবং যখন আমি সন্ধ্যাকালে পুষ্পতরুতলে সাম্রাজ্ঞীর আসন গ্রহণ করিতাম, তখন পৃথিবীর সমস্ত পুরুষজাতি শশি-

শেখরের মূর্ত্তি ধরিয়া আমার চরণাগত হইত।—শুনিতেছ? কি মনে হইতেছে?”

আমি সনিশ্বাসে বলিলাম “মনে হইতেছে শশিশেখর হইয়া জন্মিলে বেশ হইত।”

“আগে সবটা শোন।—একদিন বাদলার দিনে আমার জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার দেখিতে আসিয়াছেন। সেই প্রথম দেখা। আমি জান্‌লার দিকে মুখ করিয়া ছিলাম, সন্ধ্যার লাল আভাটা পড়িয়া রুগ্ন মুখের বিবর্ণতা যাহাতে দূর হয়। ডাক্তার যখন ঘরে ঢুকিয়াই আমার মুখের দিকে একবার চাহিলেন তখন আমি মনে মনে ডাক্তার হইয়া কল্পনায় নিজের মুখের দিকে চাহিলাম। সেই সন্ধ্যালোকে কোমল বালিশের উপরে একটি ঈষৎ ক্লিষ্ট কুসুমপেলব মুখ; অসংযমিত চূর্ণকুন্তল ললাটের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে এবং লজ্জায় আনমিত বড় বড় চোখের পল্লব কপোলের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছে। ডাক্তার নম্র মৃদুস্বরে দাদাকে বলিলেন ‘একবার হাতটা দেখিতে হইবে।’ আমি গাত্রাবরণের ভিতর হইতে ক্লান্ত সুগোল হাত খানি বাহির করিয়া দিলাম একবার হাতের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যদি নীলবর্ণ কাঁচের চুড়ি পরিতে পারিতাম ত আরো বেশ মানাইত। রোগীর হাত লইয়া নাড়ি দেখিতে ডাক্তারের এমন ইতস্তত ইতিপূর্ব্বে কখন দেখি নাই। অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে কম্পিত অঙ্গুলিতে নাড়ি দেখিলেন। তিনি আমার জ্বরের উত্তাপ বুঝিলেন, আমিও তাঁহার অন্তরের নাড়ি কিরূপ চলিতেছে কতকটা আভাস পাইলাম। বিশ্বাস হইতেছে না?”

আমি বলিলাম "অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখিতেছি না— মানুষের নাড়ি সকল অবস্থায় সমান চলে না।"

"কালক্রমে আরো দুই চারিবার রোগ ও আরোগ্য হইবার পরে দেখিলাম, আমার সেই সন্ধ্যাকালের মানস-সভায় পৃথিবীর কোটি কোটি পুরুষসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া ক্রমে একটিতে আসিয়া ঠেকিল, আমার পৃথিবী প্রায় জনশূন্য হইয়া আসিল। জগতে কেবল একটি ডাক্তার এবং একটি রোগী অবশিষ্ট রহিল। আমি গোপনে সন্ধ্যাবেলায় একটি বাসন্তী রঙের কাপড় পরিতাম, ভাল করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া মাথায় এক গাছি বেল ফুলের মালা পরিতাম, একটি আয়না হাতে লইয়া বাগানে গিয়া বসিতাম। কেন! আপনাকে দেখিয়া কি আর পরিতৃপ্তি হয় না! বাস্তবিকই হয় না। কেন না, আমি ত আপনি আপনাকে দেখিতাম না। আমি তখন একলা বসিয়া দুইজন হইতাম। আমি তখন ডাক্তার হইয়া আপনাকে দেখিতাম, মুগ্ধ হইতাম এবং ভাল বাসিতাম এবং আদর করিতাম অথচ প্রাণের ভিতরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস সন্ধ্যাবাতাসের মত হূহূ করিয়া উঠিত। সেই হইতে আমি আর একলা ছিলাম না; যখন চলিতাম, নতনেত্রে চাহিয়া দেখিতাম পায়ের অঙ্গুলিগুলি পৃথিবীর উপরে কেমন করিয়া পড়িতেছে, এবং ভাবিতাম এই পদক্ষেপ আমাদের নূতন পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তারের কেমন লাগে; মধ্যাহ্নে জান্‌লার বাহিরে ঝাঁ ঝাঁ করিত, কোথাও সাড়াশব্দ নাই, মাঝে মাঝে এক একটা চিল অতিদূর আকাশে শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইত; এবং আমাদের উদ্যানপ্রাচীরের বাহিরে খেলেনাওয়ালা সুর ধরিয়া 'চাই, খেলেনা চাই, চুড়ি চাই' করিয়া ডাকিয়া যাইত, আমি একখানি

ধব্‌ধবে চাদর পাতিয়া নিজের হাতে বিছানা করিয়া শয়ন করিতাম, একখানি অনাবৃত বাহু কোমল বিছানার উপর যেন অনাদরে মেলিয়া দিয়া ভাবিতাম, এই হাতখানি এমনি ভঙ্গীতে কে যেন দেখিতে পাইল, কে যেন দুইখানি হাত দিয়া তুলিয়া লইল, কে যেন ইহার আরক্ত করতলের উপর একটি চুম্বন রাখিয়া দিয়া আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া যাইতেছে।—মনে কর এই খানেই গল্পটা যদি শেষ হয় তাহা হইলে কেমন হয় ?”

আমি বলিলাম “মন্দ হয় না। একটু অসম্পূর্ণ থাকে বটে, কিন্তু সেইটুকু আপন মনে পূরণ করিয়া লইতে বাকি রাতটুকু বেশ কাটিয়া যায়।”

“কিন্তু তাহা হইলে গল্পটা যে বড় গম্ভীর হইয়া পড়ে। ইহার উপহাসটুকু থাকে কোথায় ? ইহার ভিতরকার কঙ্কালটা তাহার সমস্ত দাঁত ক’টি মেলিয়া দেখা দেয় কই ?—তবে পরে শোন। একটুখানি পসার হইতেই আমাদের বাড়ির একতলায় ডাক্তার তাঁহার ডাক্তারখানা খুলিলেন। তখন আমি তাঁহাকে মাঝে মাঝে হাসিতে হাসিতে ঔষধের কথা, বিষের কথা, কি করিলে মানুষ সহজে মরে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। ডাক্তারির কথায় ডাক্তারের মুখ খুলিয়া যাইত। শুনিয়া শুনিয়া মৃত্যু যেন পরিচিত ঘরের লোকের মত হইয়া গেল। ভালবাসা এবং মরণ কেবল এই দুটোকেই পৃথিবীময় দেখিলাম।

“আমার গল্প প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—আর বড় বাকী নাই।”

আমি মৃদুস্বরে বলিলাম “রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।”

“কিছুদিন হইতে দেখিলাম ডাক্তার বাবু বড় অন্যমনস্ক, এবং

আমার কাছে যেন ভারি অপ্রতিভ। একদিন দেখিলাম তিনি কিছু বেশি রকম সাজসজ্জা করিয়া দাদার কাছে তাঁহার জুড়ি ধার লইলেন রাত্রে কোথায় যাইবেন। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। দাদার কাছে গিয়া নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম 'হাঁ দাদা, ডাক্তার বাবু আজ জুড়ি লইয়া কোথায় যাইতেছেন?' সংক্ষেপে দাদা বলিলেন, 'মরিতে।' আমি বলিলাম, 'না, সত্য করিয়া বল না।' তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ খোলসা করিয়া বলিলেন 'বিবাহ করিতে।' আমি বলিলাম 'সত্য না কি!' বলিয়া অনেক হাসিতে লাগিলাম। অল্পে অল্পে শুনিলাম এই বিবাহে ডাক্তার বারোহাজার টাকা পাইবেন। কিন্তু আমার কাছে এ সংবাদ গোপন করিয়া আমাকে অপমান করিবার তাৎপর্য্য কি? আমি কি তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিয়াছিলাম যে, এমন কাজ করিলে আমি বুক ফাটিয়া মরিব? পুরুষদের বিশ্বাস করিবার যো নাই। পৃথিবীতে আমি একটি মাত্র পুরুষ দেখিয়াছি এবং এক মুহূর্ত্তে সমস্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছি।

"ডাক্তার রোগী দেখিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘরে আসিলে আমি প্রচুর পরিমাণে হাসিতে হাসিতে বলিলাম 'কি ডাক্তার মহাশয়! আজ না কি আপনার বিবাহ!' আমার প্রফুল্লতা দেখিয়া ডাক্তার যে কেবল অপ্রতিভ হইলেন তাহা নহে, ভারি বিমর্ষ হইয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম 'বাজনা বাদ্য কিছু নাই যে!' শুনিয়া তিনি ঈষৎ একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন— 'বিবাহ ব্যাপারটা কি এতই আনন্দের?' শুনিয়া আমি হাসিয়া অস্থির হইয়া গেলাম। এমন কথাও ত কখনো শুনি নাই। আমি বলিলাম, 'সে হইবে না বাজনা চাই, আলো চাই।' দাদাকে এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিলাম যে দাদা তখনি রীতিমত উৎসবের

আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি কেবলি গল্প করিতে লাগিলাম, বধূ ঘরে আসিলে কি হইবে, কি করিব, জিজ্ঞাসা করিলাম 'আচ্ছা ডাক্তার মহাশয়, তখনো কি আপনি রোগীর নাড়ি টিপিয়া বেড়াইবেন ?' হি হি হি হি! যদিও মানুষের বিশেষতঃ পুরুষের মনটা দৃষ্টিগোচর নয় তবু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কথাগুলি ডাক্তারের বুকে শেলের মত বাজিতেছিল।

"অনেক রাত্রে লগ্ন। সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার ছাতের উপর বসিয়া দাদার সহিত দুই এক পাত্র মদ খাইতেছিলেন। দুইজনেরই এই অভ্যাসটুকু ছিল। ক্রমে আকাশে চাঁদ উঠিল। আমি হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলাম 'ডাক্তার মশায় ভুলিয়া গেলেন না কি ? যাত্রার যে সময় হইয়াছে।' এইখানে একটা সামান্য কথা বলা আবশ্যক। ইতিমধ্যে আমি গোপনে ডাক্তারখানায় গিয়া খানিকটা গুঁড়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম এবং সেই গুঁড়ার কিয়দংশ সুবিধামত অলক্ষিতে ডাক্তারের গ্লাসে মিশাইয়া দিয়াছিলাম। কোন্ গুঁড়া খাইলে মানুষ মরে ডাক্তারের কাছে শিখিয়াছিলাম। ডাক্তার এক চুমুকে গ্লাসটি শেষ করিয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র গদ্গদ কণ্ঠে আমার মুখের দিকে মর্ম্মান্তিক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—'তবে চলিলাম।'

"বাঁশি বাজিতে লাগিল। আমি একটি বারানসী সাড়ি পরিলাম; যতগুলি গহনা সিন্ধুকে তোলা ছিল, সবগুলি বাহির করিয়া পরিলাম; সিঁথিতে বড় করিয়া সিঁদুর দিলাম। আমার সেই বকুলতলায় বিছানা পাতিলাম। বড় সুন্দর রাত্রি। ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না। সুপ্তজগতের ক্লান্তি হরণ করিয়া দক্ষিণে বাতাস বহিতেছে। জুঁই আর বেলফুলের গন্ধে সমস্ত বাগান আমোদ করিয়াছে। বাঁশির শব্দ যখন ক্রমে দূরে চলিয়া গেল, জ্যোৎস্না

যখন অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, এই তরুপল্লব এবং আকাশ এবং আজন্মকালের ঘর দুয়ার লইয়া পৃথিবী যখন আমার চারিদিক হইতে মায়ার মত মিলাইয়া যাইতে লাগিল তখন আমি নেত্র নিমীলন করিয়া হাসিলাম। ইচ্ছা ছিল যখন লোকে আসিয়া আমাকে দেখিবে তখন এই হাসিটুকু যেন রঙীন নেশার মত আমার ঠোঁটের কাছে লাগিয়া থাকে! ইচ্ছা ছিল যখন আমার অনন্তরাত্রির বাসর ঘরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিব তখন এই হাসিটুকু এখান হইতেই মুখে করিয়া লইয়া যাইব। কোথায় বাসর ঘর! আমার সে বিবাহের বেশ কোথায়! নিজের ভিতর হইতে একটা খট্‌খট্ শব্দে জাগিয়া দেখিলাম আমাকে লইয়া তিনটি বালক অস্থিবিদ্যা শিখিতেছে। বুকের যেখানে সুখদুঃখ ধুক্‌ধুক্ করিত এবং যৌবনের পাপ্‌ড়ি প্রতিদিন একটি একটি করিয়া প্রস্ফুটিত হইত, সেইখানে বেত্র নির্দ্দেশ করিয়া কোন্ অস্থির কি নাম মাষ্টার শিখাইতেছে। আর সেই যে অন্তিম হাসিটুকু ওষ্ঠের কাছে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলাম, তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলে কি?—গল্পটা কেমন লাগিল?”

আমি বলিলাম “গল্পটি বেশ প্রফুল্লকর।” এমন সময় প্রথম কাক ডাকিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, “এখনো আছ কি?” কোন উত্তর পাইলাম না। ঘরের মধ্যে ভোরের আলো প্রবেশ করিল।

দাক্ষিণাত্যে আর্য্য-উপনিবেশ।

দাক্ষিণাত্যে আর্য্যগণ কোন সময় প্রথম বসতি করেন, তাহা নিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারণ করা যায় না। অতি প্রাচীনকালে বিন্ধ্যগিরি আর্য্যভূমির দক্ষিণ সীমা ছিল। দাক্ষিণাত্য তখন অরণ্যময় এবং নরমাংসলোলুপ ভীষণদর্শন কৃষ্ণকায় অনার্য্যগণ

(রাক্ষসগণ) কর্ত্তৃক অধিবাসিত। এই দাক্ষিণাত্যবাসী অনার্য্যগণ প্রায়ই আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ করিয়া আর্য্যঋষিগণের যজ্ঞাদি নষ্ট ও নানা প্রকার উপদ্রব করিত। আর্য্যনৃপতিগণের চেষ্টায় সময়ে সময়ে তাহাদের উপদ্রব নিবারিত হইত বটে, কিন্তু সূর্য্যবংশাবতংস প্রবলপরাক্রম ভগবান্ রামচন্দ্র ব্যতীত আর কেহই তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারেন নাই। মহাবীর রামচন্দ্রই দাক্ষিণাত্যের নৃশংস অনার্য্যগণের অধিকাংশকে নিহত ও অবশিষ্ট সকলকে পরাজিত ও বশীভূত করিয়া দাক্ষিণাত্যে আর্য্যগণের উপনিবেশ স্থাপনের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। রামচন্দ্রের পূর্ব্বে আর্য্যবীরগণ যে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, তাহা নহে। তাঁহার পূর্ব্বেও আর্য্যগণ বীরবেশে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ভুজবলে তথায় দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য (বিদর্ভ ও সৌরাষ্ট্র) স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু অনার্য্যদিগকে দমন করা তাঁহাদের দাক্ষিণাত্যে রাজ্যস্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল না। বিদর্ভ ও সৌরাষ্ট্র ব্যতীত সমগ্র দাক্ষিণাত্য তৎকালে ক্রূরপ্রকৃতি অনার্য্যগণের ক্রীড়াস্থল ছিল। কিন্তু অবশেষে ভগবান্ রামচন্দ্রের অদ্ভুত বুদ্ধিকৌশলে ও অমিত বাহুবলে দাক্ষিণাত্যের অনার্য্যজাতিসকলকে আর্য্যগণের সম্পূর্ণ পদানত হইতে হইয়াছিল।

বীরবেশে আর্য্যগণের দাক্ষিণাত্যে প্রবেশের বহুকাল পূর্ব্বে মানবহিতচিকীর্ষু প্রশান্তমূর্ত্তি আর্য্যঋষিগণ ধীরে ধীরে এই যজ্ঞনষ্টকারী ক্রূরমনা অনার্য্যগণপরিপূর্ণ মহারণ্যময় দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথম মহাত্মা অগস্ত্য বিন্ধ্যগিরি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে * প্রবেশ করিয়া তথায় স্বীয়

* দণ্ডকারণ্য—দণ্ডক রাজার স্থাপিত দেশ। মহর্ষি শুক্রের অভিশাপে

আশ্রম স্থাপন করেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম অনার্য্যদিগের মধ্যে আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পুরাণে কথিত আছে যে, একদা বিন্ধ্যাচল সূর্য্যের গতিরোধকরণ মানসে অতিশয় দীর্ঘকলেবর ধারণ করিলে, দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া তাহার প্রতিবিধানার্থ অগস্ত্যমুনিকে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের অনুরোধে মহামুনি অগস্ত্য বিন্ধ্যাচল সমীপে উপস্থিত হইলে, উক্ত পর্ব্বত মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিল। তখন অগস্ত্য তাহাকে বলিলেন "বিন্ধ্য! আমি যাবৎ দক্ষিণদিক্ হইতে ফিরিয়া না আইসি, তাবৎ তুমি এই অবস্থাতেই থাক।" পর্ব্বত তাহাই করিল। কিন্তু অগস্ত্য দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিয়া আর বিন্ধ্যাচলের নিকট ফিরিলেন না। পুরাণের এই অলঙ্কারোক্তি হইতে এই সত্য প্রকাশিত হইতেছে যে, অগস্ত্যই সর্ব্ব প্রথম বিন্ধ্যাদ্রি উল্লঙ্ঘন করিয়া, দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে (আধুনিক মহারাষ্ট্র দেশে) আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। ডাঃ ভাণ্ডারকর বলেন, অতি প্রাচীন কালে আর্য্যাবর্ত্তবাসী আর্য্যগণ বিন্ধ্যগিরিকে অতিশয় দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া মনে করিতেন। বিন্ধ্যগিরির অত্যুন্নত শিখরাবলী তাঁহাদের নিকট সূর্য্যেরও গতিরোধক বলিয়া মনে হইত। বিন্ধ্যাদ্রির পশ্চিমোত্তরভাগকে "পারিযাত্র" বলে। পারিযাত্র * অর্থে যাত্রার (দাক্ষিণাত্য গমনের) প্রতিরোধক পর্ব্বত। এই পর্ব্বত তৎকালে আর্য্যগণের দাক্ষিণাত্য গমনের বাধা জন্মাইতেছিল

ইহা অরণ্যে পরিণত হইয়া যায়। রামায়ণের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার রামানুজের মতে দণ্ডকারণ্য এক্ষণে মহারাষ্ট্র দেশ হইয়াছে। ডাঃ রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর সম্পূর্ণ রূপে এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন।

* এই পর্ব্বত হইতে চাম্বেল ও বেটওয়া এই দুই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

বলিয়া আর্য্যগণ এই পর্ব্বতের নাম "পারিযাত্র" রাখিয়াছিলেন, বোধ হয়। তৎপরে কিছুদিন গতে, মহর্ষি অগস্ত্য * বিন্ধ্যাদ্রিকে তাহার মস্তক অবনত করিয়া থাকিতে আদেশ করিলেন; অর্থাৎ বিন্ধ্যগিরি উল্লঙ্ঘন করিয়া দাক্ষিণাত্যে স্বীয় আশ্রম স্থাপন-পূর্ব্বক আর্য্যগণের দাক্ষিণাত্য প্রবেশের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত পৌরাণিক উপাখ্যানটি রচিত হইয়াছে, ডাঃ ভাণ্ডারকরের এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কারণ, পুরাণোক্ত অধিকাংশ উপাখ্যানই এইরূপ ঐতিহাসিক-সত্য-মিশ্রিত রূপকালঙ্কারে পরিপূর্ণ।

পৌরাণিক উপাখ্যানগুলিকে রূপকাচ্ছাদিত বলিয়া নির্দ্দেশ করায়, পৌরাণিক তত্ত্বানভিজ্ঞ প্রাচীন সমাজ হয়ত আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইবেন; এবং আমাদিগকে অহিন্দু বা নাস্তিক নামে অভিহিত করিবেন। কারণ, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ধ্রুব বিশ্বাস যে, পুরাণের প্রত্যেক বর্ণ অমোঘ সত্যপূর্ণ। কিন্তু তাঁহাদের এই বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস যে, আর্য্যসমাজের বহুল অনিষ্ট সাধন করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। বঙ্গদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি

* ইহাঁর প্রথম ও প্রকৃত নাম 'মান,' তৎপরে বিন্ধ্যাচলের দর্প চূর্ণ করিয়া তিনি অগস্তি (অগং বিন্ধ্যং স্ত্যায়তি) নাম প্রাপ্ত হন। অগস্ত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদে (৭।৩৩।১৩) ও বৃহৎ সংহিতাতে লিখিত আছে যে যজ্ঞস্থলে উর্ব্বশীকে দেখিয়া মিত্র ও বরুণের রেতঃস্খলন হয়। সেই শুক্র যজ্ঞীয় কুম্ভে পতিত হওয়ায় মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাতে অগস্ত্য ও বসিষ্ঠ নামে দুই বীর্য্যবন্ত তপস্বী উৎপন্ন হইলেন। মহাতপা অগস্ত্যের আকার লাঙ্গলের জোয়ালের ন্যায় হইয়াছিল। অগস্ত্যমুনির আশ্রম বরাবর একস্থানে ছিল না। রামায়ণের সময় তাঁহার আশ্রম দণ্ডকারণ্যে এবং মহাভারতের সময় গয়ার নিকটে ছিল। (বিশ্বকোষ)। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহোদয়ের মতে অগস্ত্য একটি বংশের নাম। এতদনুসারে মহাভারতীয় অগস্ত্য রামচন্দ্রের সমসাময়িক অগস্ত্যের বংশধর ছিলেন, অনুমিত হয়।

মহাশয়ও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। পুরাণ ত অতি দূরের কথা—তাঁহার মতে শ্রুতিও এইরূপ ঐতিহাসিক সত্যমিশ্রিত রূপকালঙ্কারে পরিপূর্ণ। চূড়ামণি মহাশয় ক্রমোন্নতির প্রণালী বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন :—"বাস্তবিক মনুষ্যশরীরই আত্মার সম্পূর্ণ শক্তি বিকাশের উপযুক্ত স্থান। শ্রুতি (ঐতরেয় উপনিষদ্) বলেন, (স্থানাভাবে মূল উদ্ধৃত হইল না) "বিধাতা তাপ, বায়ু, আলোক প্রভৃতি সৃষ্টি করিলে তাহারা চক্ষুরিন্দ্রিয়াদি শক্তিরূপে পরিণত হইয়া আপন আপন কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত আধার প্রার্থনা করিলে, বিধাতা তাহাদিগকে গবাকার শরীর দিলেন। তাহারা যেন বিধাতাকে বলিল 'ইহা আমাদের পর্য্যাপ্তি মতে ক্রিয়ার উপযুক্ত হয় নাই।' পরে বিধাতা অশ্বাকার শরীর উপস্থিত করিলেন, তাহাতেও তাহারা ঐরূপ বলিল, পরে পুরুষাকার শরীর উপস্থিত করিলেন, তাহাতে তাহারা বলিল, 'ইহা আমাদের পর্য্যাপ্ত ক্রিয়ার উপযোগী হইয়াছে।'—ইহা আলঙ্কারিক কথা মাত্র; বাস্তবিক ক্রমোন্নতিই ইহার তাৎপর্য্য বোধ হয়।" (ধর্ম্ম ব্যাখ্যা ১ম খণ্ড ২৬।২৭ পৃঃ)। চূড়ামণি মহাশয় শ্রুতিবাক্যকে রূপকালঙ্কারমিশ্রিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া কি "বঙ্গবাসী"প্রমুখ গোঁড়া হিন্দুগণ * তাঁহাকে অহিন্দু

---

* শ্রদ্ধাস্পদ চূড়ামণি মহাশয় প্রাচীন সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যে সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি বলিয়াছেন—"নব্য সমাজের অবস্থা বলিলাম। আবার আজকালের প্রাচীন সমাজের অবস্থা আরও শোচনীয়। প্রাচীন সমাজ স্থূল সূক্ষ্ম কোনও চিন্তারই আবশ্যকতা মনে করেন না। তাঁহারা যাহা করিয়া আসিতেছেন, তাহাই করিবেন। আর্য্যশাস্ত্রের নির্ম্মল সুযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি যে তাঁহাদের ঘোর স্বেচ্ছাচার ও স্বার্থপরতায় বিমিশ্রিত হইয়া, এখন নিতান্ত মলিনবেশে পরিণত ও ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা প্রাচীন সমাজ ঈষৎ কটাক্ষ করিয়াও দেখেন না। প্রাচীন সমাজ স্তম্ভের ন্যায় নিশ্চিন্ত ও অচল অটল।" ধর্ম্মব্যাখ্যা ১ম খণ্ড ৩পৃঃ দ্রষ্টব্য।

কিন্তু আমি তোমাকে কি বল্‌ছিলুম, সে কোথায় গেল! আমি বল্‌ছিলেম, কোন একটা বিশেষ প্রসঙ্গ নিয়ে তার আগাগোড়া তর্ক নাই হল। তার মীমাংসাই বা নাই হল। কেবল দুজনের মনের আঘাত প্রতিঘাতে চিন্তাপ্রবাহের মধ্যে বিবিধ ঢেউ তোলা—যাতে করে তাদের উপর নানা বর্ণের আলোছায়া খেল্‌তে পারে—এই হলেই বেশ হয়। সাহিত্যে এ রকম সুযোগ সর্ব্বদা ঘটে না—সকলেই সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ মত প্রকাশ করতেই ব্যস্ত—এই জন্যে অধিকাংশ মাসিক পত্র মৃত মতের মিউজিয়াম্ বল্লেই হয়। মত সকল জীবিত অবস্থায় যেথানে নানা ভঙ্গীতে সঞ্চরণ করে সেখানে পাঠকদের প্রবেশ লাভ দুর্লভ। অবশ্য, সেখানে কেবল গতি, নৃত্য এবং আভাস দেখা যায় মাত্র, জিনিষটাকে সম্পূর্ণ হাতে তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করা যায় না, কিন্তু তাতে যে একরকমের জ্ঞান এবং সুখ পাওয়া যায় এমন অন্য কিছুতে পাবার সুবিধে নেই। * * * *

নীরব বিদায়।

১

নীরব বিদায় ও যে, নীরব বিদায় আহা,
নীরব বিদায়!
শব্দে বুঝাইতে যাই, অর্থের পাই না থাই,
এ জগতে হায় হায় নীরব বিদায়,
ভাষায় কি বুঝান' গো যায়!

মুখে কথা নাহি ফোটে, ভাবগুলি কেঁপে ওঠে,
চঞ্চল সরসীজলে শশীবিম্বপ্রায় ;
হায়, ও যে নীরব বিদায় !

২

বৃথায় বৃথায় চেষ্টা ; নীরব বিদায়
তুলিকায় ধরা কভু যায় !
দাসী আসি লয়ে যায়, সন্তানে তুলিয়ে হায় ;
মা তাহার বার বার ফিরে ঘুরে চায় !
দৃষ্টি যেন পিছু পিছু ধায় !
অঙ্গযষ্টি অবিচল, নেত্রে নাহি অশ্রুজল,
বর্ণ নাহি মূরতিরেখায় !
হায় ওযে নীরব বিদায় !

৩

বৃথা চেষ্টা ! এজগতে নীরব বিদায়,
পুষ্পভ্রষ্ট সৌরভের প্রায়,
জননীর দৃষ্টি হয়ে, বালকেরে সঙ্গে লয়ে,
সন্তানের পাঠ-গৃহে ধায় !
"ভাসান্"—গঙ্গার ধারে, রথযাত্রা হেরিবারে,
নয়নমণিরে মাতা, সাজায়ে পাঠায় ;
নিজে কিন্তু স্নেহময়ী, বাতায়নে বসি ওই,
এক মনে কি বস্তু ধেয়ায় !
চক্ষে অশ্রুজল নাই, কান্না নাই, ছায়া নাই,
ভাষায় ও বোঝান' কি যায় ?
হায় ওযে নীরব বিদায় !

৪

তুমি কি ভেবেছ মনে, বিবাহ-যামিনী
হ'লে পরে ভোর,
কন্যারে বিদায় দিতে, কন্যার জননী
ফেলে শুধু নয়নের লোর ?
না গো না "বরের মাতা" তারো চিত্তে গুপ্ত ব্যথা,
হয়ে থাকে, পুত্র যবে দু' দিনের তরে,
যায় দূরে, বধূ আনিবারে !
রসের আভাষ নাই, ছন্দের বিকাশ নাই,
গান গেয়ে গাওয়া কি গো যায় ?
হায় ওযে নীরব বিদায় !

৫

ভ্রান্তি ! ভ্রান্তি ! এজগতে নীরব বিদায়,
ত্বক্‌স্পর্শে ছোঁয়া কভু যায় ?
আশঙ্কায় চক্ষু বুজি, দুটি অন্ন মুখে গুঁজি,
ওই যুবা কার্য্যালয়ে ধায় !
প্রাণের যুবার তরে, তাম্বুল লইয়া করে,
তরুণী যে দিতেছে বিদায়,
মর্ম্মে গাঁথা নীরব ভাষায়
জলে শশীছায়া প্রায়, বিদায় কি উথলায়,
তরুণীর নয়ন কোণায় ?
ও বিদায় কায়াহীন ! ওবিদায় ছায়াহীন !
বোঝা যায়, হিয়ায়, হিয়ায়।
আকুলি ব্যাকুলি নাই, অধরে কাঁপুনি নাই,

ভাষায় ও বোঝান কি যায় ?
হায় ও যে নীরব বিদায় !

৬

হের দেখ, একমাত্র সন্তানরতন,
দূর দেশে যায় ;
অন্ন, অন্ন, অন্ন, চাই ; বিনা বাক্যে যায় তাই,
ঘরে ঘরে এ কাহিনী দুঃখী বাঙ্গালায় !
পিতামাতা দেয় তারে নীরব বিদায় !
ফেলে না চক্ষের জল, পাছে হয় অমঙ্গল,
নীল অভ্র মগ্ন হয় ঘন জোছনায় !
শশী গেলে অস্তাচলে, যামিনী শিশির ছলে,
কাঁদিতে না পায় !
নয়নে কালিমা নাই, অধরে ভাবনা নাই ;
ভাষায় ও বোঝান কি যায় ?
হায় ও যে নীরব বিদায় !

৭

যুবতী হারালে পতি, যুবা হারাইলে সতী,
বিরহী কি মৃতের শয্যায়,
আলিঙ্গি পাষাণ বুক, চুম্বিয়া অসান বুক,
দেয় চুপে নীরব বিদায় ?
না গো, ডুকুরিয়া হায়, ভাঙ্গিয়া চিত্তকারায়,
অশ্রুজলে মেদিনী ভাসায় !
সেত নহে নীরব বিদায় !

দেখিবে ? দেখিতে চাও নীরব বিদায় ?
ওই মৃত বৃদ্ধার শয্যায়,
পড়ে আছে নীরব বিদায় !
বুড়ার নাহিক সুখ, বুড়ার নাহিক দুঃখ,
বুড়া দেয় নীরব বিদায় !
তোমাদের সুখ আছে, তোমাদের দুঃখ আছে,
বুড়ার সর্ব্বস্ব চলে যায়,
চিরতরে চিরতরে হায় !
ওযে হায় আশাহারা, [illegible]ন মতে ছিল খাড়া,
প্রান্তরের বজ্রদগ্ধ রসালের প্রায় ;
ভূমিকম্পে শুষ্ক তরু ভূমিতে লুটায় !
চক্ষেতে চাহনি নাই, অধরে কাঁপনি নাই,
বিন্ধ্যাচলে গুহামাঝে, বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রায় !
হায় ওযে নীরব বিদায় !

স্ত্রীপুরুষভেদে অপরাধের ন্যূনাধিক্য।

সকল সভ্যজাতির আদালৎ-সংক্রান্ত তথ্য-তালিকা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা এবং বালিকারা বালক অপেক্ষা বেআইনী অপরাধে কম লিপ্ত। বিশেষতঃ য়ুরোপের উত্তর ভাগ অপেক্ষা দক্ষিণ ভাগে স্ত্রীলোকের অপরাধ কম দৃষ্ট হয়। তাহার কারণ প্রথমতঃ, য়ুরোপের দক্ষিণ ভাগে মারপীঠের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক—স্ত্রীলো-

কেরা দুর্ব্বল সুতরাং মারপীঠের অপরাধে তাহারা তত লিপ্ত হইতে পারে না। য়ুরোপের উত্তর ভাগে চুরি প্রভৃতি অপরাধের আধিক্য সুতরাং ঐ সকল অপরাধে স্ত্রীলোকেরা সহজে লিপ্ত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণ য়ুরোপে স্ত্রীলোকেরা অনেকটা গৃহে বদ্ধ থাকে, বাহিরের হট্টগোলের মধ্যে যায় না, সুতরাং কুসঙ্গ ও কুদৃষ্টান্তে তাহাদের চরিত্র তেমন দূষিত হইতে পারে না।

অপরাধের সংখ্যা ছাড়িয়া দিয়া যদি গুরু লঘুতার বিষয় ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যা[illegible] যে স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা গুরুতর অপরাধে অপরাধী। মসিয়ো গেরি ও কেত্‌লে অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ফ্রান্সদেশে শিশুহত্যা, ভ্রূণহত্যা, বিষ-প্রয়োগ, গৃহ-চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধে স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা অধিক অপরাধী; পিতৃমাতৃ-হত্যায় স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সমান এবং শিশুদিগের প্রতি অত্যাচার পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অধিক দেখা যায়।

আর এক কথা, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা দুষ্কর্ম্মে বেশি পাকিয়া যায়—বেশি অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডীয় কারাগারের তথ্য-তালিকা অনুশীলন করিয়া জানা যায় যে, স্ত্রীলোকেরা যখন একবার অপরাধে লিপ্ত হয় তখন পুরুষদিগের অপেক্ষা বারম্বার অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত হয়—সমস্ত য়ুরোপের তথ্য-তালিকাতেও এই কথার সত্যতা সপ্রমাণ হয়।

সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অপরাধে যে কম লিপ্ত তাহার কারণ কি? তাহার সহজ উত্তর এই যে, ধর্ম্মনীতি বিষয়ে স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্ত্রীলোকেরা যুগ-যুগান্তর হইতে শিশুর লালনপালনে রত; তাহাদের এই মাতৃভাব তাহা-

দের মনে কতকগুলি নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তি বরাবর জাগাইয়া রাখিয়াছে—সুতরাং এই নিঃস্বার্থ ভাবের পরিচালনায় তাহাদের অপরাধ-প্রবণতা হ্রাস হইয়াছে। আর এক কারণ এই যে স্ত্রীলোকেরা দুর্ব্বল, সুতরাং যে সকল অপরাধ বল-সাধ্য তাহা তাহাদের ক্ষমতার অতীত। কিন্তু অনেক সময়ে স্ত্রীলোকেরা যে সকল অপরাধ বলসাধ্য বলিয়া নিজে করিতে পারে না, তাহা পুরুষদিগকে উষকাইয়া দিয়া সাধন করে—অথচ স্বয়ং ঐ কার্য্যে লিপ্ত নহে বলিয়া দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পায়।

ইংলণ্ডে যে সকল জাল জুয়াচুরি অপরাধে অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের পুরুষেরা দণ্ডনীয় হয়, অনেক স্থলে স্ত্রীলোকেরা তাহাতে ভিতরে ভিতরে লিপ্ত থাকে। অনেক সময়ে স্ত্রীদিগের গার্হস্থ্য অপব্যয়িতা, পরিচ্ছদের অপব্যয়িতা ও পাড়াপ্রতিবাসীদিগের উপর টক্কর দিবার ইচ্ছা হইতে স্বামীরা দুষ্কর্ম্মে নীত হয় ও অবশেষে কারাদণ্ড ভোগ করে।

যে সকল দেশে স্ত্রীলোকেরা অপ্রকাশ্যভাবে গৃহের অন্তরালে অবস্থিতি করে সেখানকার স্ত্রীলোকদিগের অপরাধসংখ্যা অনেক কম। গ্রীস দেশে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অপরাধ যে এত কম, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। পক্ষান্তরে স্কটলণ্ডে স্ত্রীলোক-অপরাধীর সংখ্যা যে বেশি তাহার কারণ, তত্রস্থ স্ত্রীলোকেরা অনেকটা বাহিরের কাজে নিযুক্ত। অত শারীরিক শ্রমের কাজ যুরোপের আর কোন স্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে দেখা যায় না। স্কট্-স্ত্রীরা মাঠে ঘাটে কারখানায় পুরুষদের সহিত একত্র কাজ করে—স্বীয় জীবিকার জন্য পুরুষদের উপর তত নির্ভর করে না—তাহাদের সামাজিক উদ্যম-চেষ্টা অনেকটা পুরুষদিগেরই মত, কাজে-কাজেই তাহাদের অপরাধপ্রবণতাও অনেকটা পুরুষদিগের সমান।

অপরাধের তথ্যতালিকা আলোচনা করিয়া এই সত্যটি জানা যায় যে, যে পরিমাণে স্ত্রীলোকেরা বাধ্য হইয়া বাহিরের জীবন-সংগ্রামে প্রবেশ করে সেই পরিমাণে তাহারা অপরাধপ্রবণ হইয়া উঠে। আজকাল ইংলণ্ডে যেরূপ লোক-মতের গতি দেখা যাইতেছে তাহাতে ইংলণ্ডের ভাবী সমাজের অবস্থা বড় আশ্বাসজনক বলিয়া বোধ হয় না। স্ত্রীলোকদিগের জন্য সর্ব্বপ্রকার কাজের দ্বার উদ্ঘাটিত হউক এই দিকেই লোকের মনের গতি দেখা যাইতেছে। প্রকাশ্য জীবনসংগ্রামের কঠোর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে স্ত্রীলোকের উচ্চতর প্রবৃত্তিসকল অক্ষত থাকিবে কি না সন্দেহ হয়। আজকাল ইংলণ্ডের মন্ত্রিনির্ব্বাচনের সংগ্রামে স্ত্রীলোকেরাও যোগ দিতেছেন—সকলেই অবগত আছেন, এই সকল নির্ব্বাচন-ব্যাপারে কত প্রকার অসৎ উপায় অবলম্বিত হয়—সুতরাং এই সকল কাজে স্ত্রীলোকেরা ব্যাপৃত হইলে তাহাদের নৈতিক অবস্থার কিরূপ উন্নতি হইবে তাহা দেখাই যাইতেছে—শুধু তাহা নহে, তাহাদের সন্তানসন্ততির উপর এই প্রভাবের কুফল সংক্রামিত হইতে পারে। আসল কথা, গৃহই স্ত্রীলোকের কার্য্যক্ষেত্র। সন্তানের লালনপালন ও সন্তানকে শিক্ষাদান এই দুইটি স্ত্রীলোকের প্রধান কার্য্য। যদি স্ত্রীলোকেরা গৃহকে পবিত্র রাখিতে পারেন—জ্ঞানধর্ম্মের আলোকে আলোকিত করিতে পারেন—গৃহের মধ্যে সুখস্বচ্ছন্দতা স্থাপন করিতে পারেন—গৃহকে শ্রী সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের জীবনের কাজ করা হইল—তাঁহাদের এই কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিলে দুষ্কর্ম্ম অপরাধ সমাজ হইতে যে অচিরাৎ তিরোহিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বধূ।

"বেলা যে প'ড়ে এল, জলকে চল্।"
পুরাণো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে ছায়া সখি, কোথা সে জল।
কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশথ-তল।
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে "জলকে চল্।"

কলসী লয়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা,
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূধূ,
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দিঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দু'ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে,
পিক কুহরে তীরে অমিয়-মাখা।
পথে আসিতে ফিরে, আঁধার তরুশিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা।

অশথ উঠিয়াছে   প্রাচীর টুটি,'
সেখানে ছুটিতাম   সকালে উঠি'।
শরতে ধরাতল   শিশিরে ঝলমল,
করবী থোলো থোলো   রয়েছে ফুটি'।
প্রাচীর বেয়ে বেয়ে   সবুজে ফেলে ছেয়ে
বেগুনী ফুলে ভরা   লতিকা দুটি।
ফাটলে দিয়ে আঁখি   আড়ালে বসে থাকি,
আঁচল পদতলে   পড়েছে লুটি'।

কোথায় আছ তুমি   কোথায় মাগো!
কেমনে ভুলে তুই   আছিস্ হাঁগো!
উঠিলে নব শশি,   ছাদের পরে বসি
আর কি উপকথা   বলিবি না গো!
হৃদয়-বেদনায়   শূন্য বিছানায়
বুঝি মা আঁখিজলে   রজনী জাগো!
কুসুম তুলি লয়ে'   প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার   কুশল মাগো।
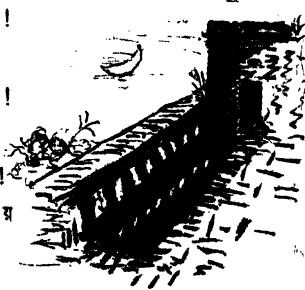
বা নাস্তিক বলিবেন? উক্ত শ্রুতিবাক্যের অলঙ্কারাদি বর্জ্জন করিয়া তাহা হইতে ক্রমোন্নতির প্রণালী সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত নিষ্কাশন করা, চূড়ামণি মহাশয় ও তন্মতাবলম্বিগণের মতে যদি যুক্তি ও হিন্দুয়ানির বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্বোদ্ধৃত অগস্ত্যোপাখ্যান হইতে, চূড়ামণিপ্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া, অগস্ত্যের সর্ব্বপ্রথম বিন্ধ্যোল্লঙ্ঘন সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত নিষ্কাশিত করিলে বোধ হয়, হিন্দুধর্ম্মের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হইবে না।

যাঁহারা পুরাণশাস্ত্র বিশেষরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন, পুরাণগুলি অর্থবাদ ও অলঙ্কারাদিতে পরিপূর্ণ। কেবল যে, পুরাণেই অর্থবাদ ও অলঙ্কারাদি আছে তাহা নহে। বেদেও বিস্তর অর্থবাদ ও আলঙ্কারিক বর্ণনা দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রীয় বিচারে অর্থবাদ ও অলঙ্কারাদির প্রামাণ্য নাই*। পুরাণে যেরূপ অনেক অসম্ভব গল্প আছে, বেদের মধ্যেও ঠিক্ সেইরূপ আছে। অসম্ভব উপাখ্যান ও অসঙ্গত রচনা দেখিয়া আজকাল অনেকে পুরাণকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রাচীন ঋষিগণ তাদৃশ বা ততোধিক অসঙ্গত দেখিয়াও বেদকে অবজ্ঞা করিতেন না, প্রত্যুত বিচারমার্গ অবলম্বন করিয়া তাহার যাথার্থ্য নিরূপণ পূর্ব্বক সত্যাংশ গ্রহণ ও

* তাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন;

"গ্রন্থমভস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থমশেষতঃ॥"

অর্থাৎ ধান্যার্থী যেমন সর্ব্বসমেত আহরণ করিয়া ধান্যভাগ গ্রহণপূর্ব্বক অবশিষ্ট পলাল (তুঁষ) ভাগ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তন্মধ্যস্থিত সত্যাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক অসত্যাংশ পরিত্যাগ করিবেন।

২

অসত্যাংশ পরিহার করিতেন। * অসত্যাংশকে একেবারে হেয় জ্ঞান না করিয়া তাহাকে সত্যাংশের উপকারক বলিয়া মনে করিতেন। অর্থবাদাদি অসত্যাংশের পরিহারপূর্ব্বক বেদবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণের নিমিত্ত প্রাচীন ঋষিগণ যেরূপ ব্যাকুল, শ্রদ্ধাবান্ ও বিচারনিপুণ হইয়াছিলেন, আমরাও যদি সেইরূপ হই, ও উপেক্ষাত্মিকা বুদ্ধিকে দমন করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমরাও পুরাণশাস্ত্র হইতে বহু বিধ অমূল্য ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইব, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এ বিষয়ের আলোচনায় আর অধিক লেখনীক্ষয় না করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা যাউক।

অগস্ত্য সম্বন্ধে বাল্মীকিরামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে—"যিনি মানবদিগের হিতাভিলাষী হইয়া যমতুল্য অসুরদিগকে বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিয়া এই দক্ষিণদিক্‌কে মনুষ্যদিগের বাসযোগ্য করিয়াছেন, এবং রাক্ষসগণ যাঁহার প্রভাবে ত্রাসান্বিত হইয়া এই দক্ষিণদিক্‌কে উপভোগ করেনা, অবলোকন মাত্র করে; সেই পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষি অগস্ত্যের ঐ আশ্রম। সেই পুণ্যকর্ম্মা অগস্ত্য যে অবধি এই দিকে আগমন করিয়াছেন, নিশাচরেরা সেই কাল অবধি বৈর পরিত্যাগ করিয়া শান্তস্বভাব হইয়াছে। এই দক্ষিণদিক্ সেই ভগবান্ অগস্ত্যঋষির প্রভাবে ক্রূরকর্ম্মা নিশাচরদিগের অধর্ষণীয় ও মানবদিগের বাসযোগ্য হইয়া ত্রিলোকমধ্যে তদীয়

* কি প্রকার বিচারপ্রণালীকে শাস্ত্রীয় বিচারপ্রণালী বলে তাহা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় প্রণীত "সাঙ্খ্যদর্শন"এর "বেদশাস্ত্রের সত্যোদ্ধার প্রণালী" শীর্ষক অধ্যায়ে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধের এই অংশটি বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সাঙ্খ্যদর্শনের বেদশাস্ত্রের সত্যোদ্ধার প্রণালী শীর্ষক অধ্যায়ের ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিত হইল।

নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্য তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করতঃই সূর্য্যের পথ নিরোধ করিবার নিমিত্ত আর নিরন্তর বর্দ্ধিত হইতেছে না।" (অরণ্যকাণ্ড ১১শ সর্গ।)

বিন্ধ্যগিরির দর্প চূর্ণ করিলে পর, মহামুনি অগস্ত্য দাক্ষিণাত্যে গিয়া বসতি করেন; এবং দ্রাবিড়াদি অঞ্চলের অসভ্য লোকদিগের মধ্যে নানা বিদ্যার প্রচার ও আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করিতে লাগিলেন। অগস্ত্যবরগার ও অগস্ত্যসর্গ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, অগস্ত্য দ্রাবিড়(১)ভাষার ব্যাকরণকর্ত্তা এবং তদ্দেশে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রচারকর্ত্তা। তাঁহার নামে অদ্যাপি বহুবিধ চিকিৎসাগ্রন্থ প্রচলিত আছে। যদিও তৎকৃত কোনও ব্যাকরণ এখন বিদ্যমান নাই, তথাপি, জনশ্রুতি অনুসারে তাঁহার শিষ্য তোলগোপ্যের ব্যাকরণমধ্যে অগস্ত্যের ব্যাকরণ-সূত্র সমূহ প্রবিষ্ট রহিয়াছে। একথা যতদূর সত্য হউক, কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে, অগস্ত্য দ্রাবিড়াদি দেশে গমনপূর্ব্বক তদ্দেশীয় ভাষানুশীলন করিয়া, তত্রত্য অধিবাসিগণের মধ্যে আর্য্য-জ্ঞান, আর্য্যশাস্ত্র ও আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। (২) কেহ

---

১ দ্রাবিড় সম্বন্ধে ৺ বাবু প্যারীচরণ সরকার স্বপ্রণীত ভারতবর্ষীয় ভূগোলে বলিয়াছেনঃ—"Dravira was the name of the extreme southern part of the Peninsula, bounded on the north by a line drawn from Pulicut, near Madras, to the Ghats between Pulicut and Bangalore, and along the curve of these Mountains, westward, to the boundary line between Malabar and Canara, which it follows to the sea so as to include Malabar." Geography of India p 8. দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বভাগে কলিঙ্গের দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত দ্রাবিড় দেশ।

২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দ্বিতীয় কল্প ১ম ভাগ ১৮৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

কেহ বলেন, মহর্ষি অগস্ত্য দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছিলেন। পণ্ডিত-প্রবর অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকার বলেন, অগস্ত্যকর্ত্তৃক ভারতের দক্ষিণদিকে আর্য্যসভ্যতার অনেক উন্নতি হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যের বিবিধ গ্রন্থে এই জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ আছে যে, সমস্ত দাক্ষিণাত্য রামচন্দ্রের বনবাসের পূর্ব্বে অসভ্য ও অব্রহ্মণ্য দেশ ছিল। অনন্তর ভগবান রামচন্দ্র রাবণবিনাশপূর্ব্বক অযোধ্যা নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, সে স্থান হইতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদি জাতি দক্ষিণ দেশে গমন পূর্ব্বক পাণ্ড্য, চোল প্রভৃতি রাজ্য স্থাপন করে; এবং তৎকালের অগস্ত্যাদি ব্রাহ্মণগণ তদ্দেশে যাত্রা করিয়া তথায় আর্য্যশাস্ত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হন। (১) শ্রীযুক্ত মেকেঞ্জী সাহেব দাক্ষিণাত্য হইতে যে সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এবিষয়ের ভূরি ভূরি বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।(২)

ঋগ্বেদান্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অন্যান্য ব্রাহ্মণাপেক্ষা সমধিক প্রাচীন। এই ব্রাহ্মণের ৭ম অধ্যায়ের ১৮শ পঙ্‌ক্তিকায় লিখিত আছে যে, বিশ্বামিত্রের অভিশপ্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রগণ হইতে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ ও মুতিব নামক জাতি সকল এবং দস্যুগণ উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল জাতি আর্য্যগণের বাসসীমার বহির্ভাগে বাস করে। মার্কণ্ডেয়, বায়ু ও মৎস্য পুরাণে অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর ও পুলিন্দ জাতিকে দাক্ষিণাত্যবাসী বলা হইয়াছে। (৩) কাদ-

১ প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ রামচন্দ্রের পূর্ব্বেই অগস্ত্য দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ২য় কল্প ১ম ভাগ ১৮৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩ মার্কণ্ডেয়পুরাণের ৫৭ অধ্যায়, বায়ুপুরাণের ৪৫ অধ্যায় এবং মৎস্য-পুরাণের ১১২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। Quoted in Dr Bhandarkar's History of Dekkan.

ম্বরী (১) প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থেও লিখিত আছে যে, শবর ও পুলিন্দ এই দুই জাতি বিন্ধ্যগিরির পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলময় প্রদেশে বাস করে (২)। মিসরদেশীয় ভূগোলবেত্তা টলেমীর গ্রন্থ (১৫২ খৃঃ অঃ) পাঠে জানা যায়, তৎকালে পুলিন্দজাতি নর্ম্মদা-নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিত। অতি প্রাচীন কালে পুণ্ড্রজাতি দিনাজপুর, রাজসাহী, মুরশিদাবাদ, বীরভূম, বর্দ্ধমান, নদীয়া, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করিত (৩)। তৎকালে বঙ্গদেশ অনার্য্যনিবাস ছিল (৪)। রামায়ণের সময় পুণ্ড্র ও অন্ধ্র (৫) জাতি বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণে বাস করিত (৬)।

---

১ কাদম্বরী প্রণেতা বাণভট্ট কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের (খৃঃ ৬০৭—৬৫০ খৃঃ) পার্ষদ ছিলেন।

২ "শবর—এই অনার্য্যজাতি ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিত। ইহাদের শ্রেষ্ঠ ভূষণ ময়ূরপুচ্ছ। বাণপুর হইতে কটক পর্য্যন্ত খুরদা নামক স্থানের জঙ্গলে শোর (sours) এবং গোদাবরীনদীর দুই পার্শ্বস্থ জঙ্গলে সৌর (souras) নামে দুই অনার্য্যজাতি আছে, ইহরাই কি প্রাচীন শবর?" শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক পদ্যানুবাদিত মহাভারত, সুলভ সংস্করণ ২১৫ পৃঃ পাদ টীকা দেখ।

৩ Vide P. C. Sircar's Geography of India p 8.

৪ শুধু বঙ্গদেশ কেন, রাজপুতানার মরুভূমি, গুজরাট, মালব ও দক্ষিণ-বেহার প্রভৃতি প্রদেশে তৎকালে অনার্য্যগণ বাস করিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শেষ অধ্যায়ে লিখিত আছে, বিন্ধ্য ও চর্ম্মন্বতী (চোম্বেল) নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ অতি প্রাচীন কাল হইতে "ভোজ" নামে পরিচিত ছিল। এতদ্‌ব্যতীত এই ব্রাহ্মণে "স্বরাট্" (সৌরাষ্ট্র বা সুরাট) প্রদেশকেও অনার্য্যনিবাস বলা হইয়াছে। Vide R. C. Dutt's Ancient India.

৫ প্রাচীন অন্ধ্রজাতি এক্ষণে তেলেগু নামে পরিচিত। বর্ত্তমান তেলিঙ্গানা (গোদাবরীর মোহনার নিকটস্থ প্রদেশ) অন্ধ্রজাতির বাসভূমি ছিল।

৬ পুণে (পুণা) ডেক্কানকলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক ডাঃ রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর এম, এ, মহোদয় প্রণীত Early history of the Dekkan down to the Mahomedan conquest অর্থাৎ মুসলমানবিজয় পর্য্যন্ত দক্ষিণের (মহারাষ্ট্রদেশের) প্রাচীন ইতিহাস নামক গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ দেখ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই সকল অনার্য্যজাতিকে "দস্যু" অর্থাৎ মনুষ্যাকৃতি জন্তু বা জানোয়ারতুল্য মনুষ্য বলা হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমিত হইতেছে যে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচনাকালে নর্ম্মদাতট-প্রদেশ ও বিন্ধ্যাদ্রির অগ্নিকোণস্থিত কতকগুলি প্রদেশ (গোদাবরীনদীর মোহানা পর্য্যন্ত ভূভাগ) ও তত্তৎপ্রদেশবাসী অনার্য্যগণের বিষয় আর্য্যগণের সামান্যরূপ জ্ঞানগোচর ছিল (১)। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত অন্যান্য প্রদেশের বিশেষতঃ অতি দক্ষিণ-দিগ্বর্ত্তী পাণ্ড্য, চোল ও দ্রাবিড় প্রভৃতি প্রদেশের বিষয় তাঁহারা তৎকালে কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। মনুসংহিতার (২)

১ মনুসংহিতার দশমাধ্যায়ে পৌণ্ড্রক, ঔড্র, ও দ্রাবিড়দেশবাসিগণকে সংস্কারবিহীন ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে। এতাবতা প্রমাণ হইতেছে যে, তৎকালে আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বভাগে স্থিত প্রদেশসকলের বিষয়ই অবগত ছিলেন; দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশস্থিত প্রদেশ সকল তখনও আর্য্যগণের নিকট অপরিচিত ও অগম্য ছিল।

২ মনুসংহিতা অতি প্রাচীন গ্রন্থ; কিন্তু ইহা আদৌ যে আকারে রচিত হইয়াছিল, সে আকারে এখন পাওয়া যায় না। আদৌ মনুসংহিতা সূত্রাকারে লিখিত ছিল, বোধ হয়, কিন্তু এখন সংক্ষিপ্ত ও পদ্যময়। মীমাংসা গ্রন্থ সমুদায়ে ও গৌতম বোধায়ন বশিষ্ঠ প্রভৃতি প্রাচীন সংহিতায় বৃদ্ধমনু, বৃহন্মনু ও মনুসংহিতা হইতে যে সকল প্রমাণ ও সূত্র উদ্ধৃত আছে, প্রচলিত মনুসংহিতায় সেই সমস্ত পাওয়া যায় না। মহামতি বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় মনুসংহিতার যে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত আছে, বর্ত্তমান মনুসংহিতায় সেগুলি দৃষ্ট হয় না। দক্ষিণদেশবাসী পরশুরাম নামক জনৈক রাজা মনুসংহিতা পুস্তকাকারে সঙ্কলন করিয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে (মঙ্গালোর, মালব, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি অঞ্চলে) ঐ রাজার একটি অব্দ প্রচলিত আছে। কলিযুগের ১৯৩৫ বৎসর অতীত হইলে, (১১৭৬ পূঃ খৃঃ অঃ) সূর্য্য কন্যারাশিতে গমন করিলে আশ্বিনমাসে এই অব্দ প্রথম স্থাপিত হয়। তদ্দৃষ্টে মান্যবর স্যার প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও সার উইলিয়ম জোন্স্ সাহেব মীমাংসা করিয়াছেন, পুস্তকাকারে মনুসংহিতার বয়ঃক্রম আজ ৩০৬৭ বৎসর। একথা প্রামাণিক হইলে, খৃষ্টের প্রায় ১২ শত বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের কোনও কোনও স্থানে বিদ্যা ও আর্য্যশাস্ত্র চর্চ্চা হইত, অনুমান করা বোধ হয়, অসঙ্গত নহে।

দশমাধ্যায় পাঠে অবগত হওয়া যায়, তৎকালে দাক্ষিণাত্যের অতি দক্ষিণভাগস্থিত দ্রাবিড় প্রদেশের বিষয়ও আর্য্যগণ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্যে আপনাদের আধিপত্য স্থাপিত করিতে পারেন নাই, বলিয়া বোধ হয়।

মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বানুসারে (৪৯ অধ্যায়ে) পরশুরাম এক-বিংশতিবার (পদ্মপুরাণ মতে সপ্তবিংশতি বার) পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করত অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, যজ্ঞের দক্ষিণা উপ-লক্ষে মহর্ষি কশ্যপকে সমগ্র পৃথিবী দান করিলেন। কশ্যপ উহা প্রতিগ্রহ করিয়া পরশুরামকে বলিলেন, "এক্ষণে এই সমস্ত পৃথিবী আমার হইয়াছে; অতএব ইহাতে বাস করা আর তোমার কর্ত্তব্য নহে, তুমি সত্বর দক্ষিণ সমুদ্রতীরে গমন কর।" এদিকে সমুদ্র মহাত্মা জামদগ্ন্যের নিমিত্ত পৃথ্বীসীমা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় উদরমধ্যে "শূর্পারক" নামক স্থান (অপরান্ত বা উত্তর কঙ্কণের রাজধানী—শূর্পারক) নির্ম্মাণ করিয়া রাখিলেন(১)। পুরাণান্তরে কথিত আছে, কশ্যপের আদেশে পরশুরাম দক্ষিণ সমুদ্রতীরে গমন করিয়া স্বীয় আবাসের নিমিত্ত সমুদ্রের নিকট কিঞ্চিৎ স্থান প্রার্থনা করিলেন। সমুদ্র এই প্রার্থনায় অসম্মত হইলে, পরশুরাম সহ্যাদ্রি (পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর উত্তরাংশ) শিখরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া মহাকোপে সমুদ্রের প্রতি এক

১ "শূর্পারক" প্রদেশকে পৃথ্বীসীমার বহির্ভাগে বলিয়া বর্ণনা করায় অনুমিত হইতেছে যে, পুরাকালে আর্য্যগণ এই ভারতবর্ষকেই পৃথিবী বলিয়া জানিতেন। এই নিমিত্তই বোধ হয়, ভারতবর্ষের আকৃতি অনুসারে পৃথিবীকে পুরাণাদিতে ত্রিকোণাকৃতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাচীন আর্য্যগণ যে ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশের বিষয় অবগত ছিলেন না, এ কথা আমরা বলিতেছি না। তবে সাধারণে যে তৎকালে এই ভারতবর্ষকেই পৃথিবী বলিয়া মনে করিত, তাহা পুরাণাদি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

ভয়ঙ্কর বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সমুদ্র ঐ বাণের ভয়ে সরিয়া যায়। যে স্থান পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্র সরিয়া যায়, তাহা "কণখল" (সহ্যাদ্রির পশ্চিমাংশস্থিত প্রদেশ) নামে প্রসিদ্ধ হইল (১)। স্কন্দ পুরাণীয় সহ্যাদ্রিখণ্ডে উক্ত হইয়াছে যে, সহ্যাদ্রির শিখরদেশে দণ্ডায়মান হইয়া পরশুরাম কুঠার নিক্ষেপ করিলে, সমুদ্র যে স্থান হইতে সরিয়া যায়, সেই স্থানের নাম "কেরল" (আধুনিক মালাবার ও কানাড়া) বা পরশুরাম ক্ষেত্র। পরশুরাম সম্বন্ধীয় এই কিম্বদন্তী মহাকবি কালিদাসও অবগত ছিলেন (২)।

কেরলোৎপত্তি গ্রন্থানুসারে, ক্ষত্রিয় বংশের অত্যাচার শান্তির জন্য ভগবান্ পরশুরাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং ক্ষত্রিয় বিনাশপূর্ব্বক বীরহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত তিনি দাক্ষিণাত্যে গোকর্ণ (বর্ত্তমান কোঁকণ বা কঙ্কণ) তীর্থে যাত্রা করিয়াছিলেন। সে স্থানে তিনি সমুদ্রতটের প্রসারণ দ্বারা কেরলরাজ্য স্থাপন করিলেন; এবং আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া উক্ত উভয় প্রদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। সহ্যাদ্রিখণ্ডে ও দ্রাবিড় ভাষার এক গ্রন্থে লিখিত আছে, পরশুরাম সে দেশ ব্রাহ্মণহীন দেখিয়া কতিপয় কৈবর্ত্তকে যজ্ঞোপবীত প্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ করিলেন (৩)। কথিত আছে, পরশুরাম গোমান্তকে (কঙ্কনের দক্ষিণাংশে) একটি বৃহৎ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। যজ্ঞান্তে পরশুরাম ব্রাহ্মণগণের বাসের জন্য আটটী

---

১ বিবিধার্থসংগ্রহ ৪র্থ পর্ব্ব ৩৭ খণ্ড (শকাব্দ ১৭৭৯, বৈশাখ,) পৃঃ ৩৪ দেখ।

২ "অবকাশং কিলোদন্বান্ রামায়াভ্যর্থিতং দদৌ।
অপরান্তমহীপালব্যাজেন রঘবে করং॥"

৩ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ২য় কল্প, ১ম ভাগ, ৫৬ সংখ্যা দেখ।

গ্রাম দান করিলেন। কেবলমাত্র কয়েকজন সারস্বত ব্রাহ্মণ এই স্থানে থাকিতে সম্মত হইলেন। এইরূপে এদেশে সারস্বত ব্রাহ্মণগণের বাস হয়। এই সকল আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে এই সত্য প্রকাশিত হয় যে, আর্য্য-ঋষি মহাত্মা পরশুরাম কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশের অধিবাসিগণের মধ্যে আর্য্যসভ্যতা, আর্য্যজ্ঞান ও আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি আর্য্যাবর্ত্তবাসী ব্রাহ্মণদিগকে সেই দেশে লইয়া গিয়া তথায় তাঁহাদের বসতি বিস্তার করিবার সুবিধা করিয়া দেন।

রামায়ণোক্ত ঋষিগণের মধ্যে অনেকেরই আশ্রম দণ্ডকারণ্যে ছিল, এরূপ উল্লেখ রামায়ণেই দেখা যায়। সূর্য্যবংশাবতংস ভগবান্ রামচন্দ্রের বনগমনের পূর্ব্ব হইতেই মহাত্মা অগস্ত্যের আশ্রম এই দণ্ডকারণ্যে (আধুনিক মহারাষ্ট্র দেশে) ছিল। মহাত্মা পরশুরামও রামচন্দ্রের পূর্ব্বেই দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। রামায়ণে বানররাজ * সুগ্রীবকে বেদবিদ্যাবিশারদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। রামচন্দ্রের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান তাঁহার সহিত বিশুদ্ধ সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন

---

* দাক্ষিণাত্যের এক অর্দ্ধসভ্য অনার্য্যজাতি রামায়ণে বানর নামে বর্ণিত হইয়াছে, বোধ হয়। ইহারা রাক্ষস নামে অভিহিত অনার্য্যজাতি অপেক্ষা কিছু উন্নত ও সভ্য ছিল। দাক্ষিণাত্য হইতে প্রাপ্ত এক গ্রন্থে এই জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ আছে যে, ভগবান রামচন্দ্রের কালে বানরের ন্যায় পুচ্ছবিশিষ্ট একপ্রকার মনুষ্য জাতি দাক্ষিণাত্যে বাস করিত। বলা বাহুল্য তাহাদের এই পুচ্ছকল্পনা অলঙ্কার মাত্র। (J. A. S. Vol VII p 398) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বর্ণিত সুগ্রীবের সুরম্য পুরী, অপূর্ব্ব উদ্যান, প্রচুর ঐশ্বর্য্য, শোভন সভা, মনোহর বস্ত্র, দিব্যাভরণ, উত্তমা স্ত্রী ও সুশীল চরিত্র ইত্যাদি বিষয় পাঠ

করিয়া তাঁহার বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন (১)। বাতাপী ইল্বল নামক দণ্ডকারণ্যবাসী দুই জন রাক্ষস সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে পারিত (২)। পাণ্ড্যদেশ সম্বন্ধে বাল্মীকির রামায়ণে যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তাহাতে তৎকালে যে উহা অতি হীন অবস্থায় ছিল, এরূপ বোধ হয় না (৩)। অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থেও দাক্ষিণাত্যবাসিগণের সম্বন্ধে এই প্রকারের অনেক উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই সকল আলোচনা করিলে অনুমিত হয় যে, ভগবান্ রামচন্দ্রেরও বহুপূর্ব্বে উদারহৃদয় আর্য্যঋষিগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়া তথায় আর্য্যসভ্যতা ও আর্য্যধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছিলেন; কিন্তু তখনও উহা সুসভ্য আর্য্যগণের সম্পূর্ণ বাসোপযোগী হয় নাই।

করিলে বানরগণকে প্রত্যুত মনুষ্য বলিয়াই মনে হয়। কর্ণাট ও অন্ধ্রদেশে সুগ্রীব, ও বালী, ও তারার যে সমস্ত প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহা সর্ব্বাংশে অবিকল মনুষ্যের ন্যায়। বেশীর ভাগ, সুগ্রীব ও বালীর পশ্চাদ্ভাগে একটি পুচ্ছ অঙ্কিত আছে। অদ্যাপি দক্ষিণদেশে এরূপ এক পার্ব্বতীয় ও আরণ্য বিকটাকৃতি মনুষ্যজাতি বিদ্যমান আছে যে, তাহাদিগকে দেখিলে বানর বলিয়াই মনে হয়।

১ "নানৃগ্বেদবিনীতস্য না যজুর্ব্বেদধারিণঃ।
ন সামবেদবিদুষো শক্যমেবং বিভাষিতুম্॥
নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধাশ্রুতম্।
বহুব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্॥"

রামায়ণ ৪। ৪

অত্যুক্তি হইলেও, ইহা যে, রামচন্দ্রের পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যবাসী বানরাদি কোন কোন অনার্য্য জাতির মধ্যে আর্য্যসভ্যতা অনেক পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, একথার পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই।

২ "ধারয়ন্ ব্রাহ্মণং রূপংইল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্।
আমন্ত্রয়তি বিপ্রান্ সঃ শ্রাদ্ধমুদ্দিশ্য নির্ঘৃণঃ॥"

রামায়ণ। ১২

৩ "ততো হেমময়ং দিব্যং মণিমুক্তাবিভূষিতং।
যুক্তং কবাটং পাণ্ড্যানাং গত্বা দ্রক্ষথ বানরাঃ॥"

রামায়ণ ৪। ৪১। ১৮

মীমাংসা।

আমাদের বাড়ির পাশেই নবীন ঘোষের বাড়ি। একেবারে সংলগ্ন বলিলেই হয়।

আমি কখনও আমাদের বাড়ির ছাদেও উঠি না, জানালায়ও দাঁড়াই না। আপন মনে গৃহকার্য্য করিয়া যাই।

নবীন ঘোষের বড় ছেলে মুকুন্দ ঘোষকে কখনও চক্ষে দেখি নাই।

কিন্তু মুকুন্দ ঘোষ কেন বাঁশি বাজায়! সকালে বাজায়, মধ্যাহ্নে বাজায়, সন্ধ্যাবেলায় বাজায়। আমার ঘর হইতে স্পষ্ট শোনা যায়।

আমি কবি নই, মাসিক পত্রের সম্পাদক নই, মনের ভাব সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারি না। কেবল সকালে কাঁদি, মধ্যাহ্নে কাঁদি, সন্ধ্যাবেলায় কাঁদি। এবং ইচ্ছা করে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যাই।

বুঝিতে পারি রাধিকা কেন তাঁহার সখীকে সম্বোধন করিয়া কাতর স্বরে বলিয়াছিলেন "বারণ করলো সই, আর যেন শ্যামের বাঁশি বাজে না বাজে না।"

বুঝিতে পারি চণ্ডিদাস কেন লিখিয়াছেন,

"যে না দেশে বাঁশির ঘর সেই দেশে যাব,
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব।"

কিন্তু পাঠক, আমার এ হৃদয়বেদনা তুমি কি বুঝিয়াছ?—

পাঠকের উত্তর।

আমি বুঝিয়াছি। যদিও আমি কুলবধূ নই। কারণ, আমি

পুরুষ মানুষ। কিন্তু আমার বাড়ির পাশেও একটি কন্সর্টের দল আছে। তাহার মধ্যে একটি ছোক্‌রা নূতন বাঁশি অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে—প্রত্যূষ হইতে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত সারিগম্‌ সাধিতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা সড়গড় হইয়াছে; এখন প্রত্যেক স্বরে কেবলমাত্র আধস্থর শিকিস্থর তফাৎ দিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমার চিত্ত উদাসীন হইয়া উঠিয়াছে—ঘরে আর কিছুতে মন টেঁকে না। বুঝিতে পারিতেছি রাধিকা কেন বলিয়াছিলেন "বারণ করলো, সই, আর যেন শ্যামের বাঁশি বাজে না বাজে না।" শ্যাম বোধ করি তখন নূতন সারিগম্‌ সাধিতে ছিলেন। বুঝিতে পারিতেছি চণ্ডিদাস কেন লিখিয়াছিলেন—

> "যে না দেশে বাঁশির ঘর সেই দেশে যাব,
> ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব।"

বোধ হয় চণ্ডিদাসের বাসার পাশে কন্সর্টের দল ছিল।

আমার বাড়ির পাশে যে ছোক্‌রা বাঁশি অভ্যাস করে, বোধ হয় তাহারি নাম মুকুন্দ ঘোষ।

শ্রীসঙ্গীতপ্রিয়।

আমার এ কি হইল! এ কি বেদনা! নিদ্রা নাই, আহার নাই, মনে স্থখ নাই। থাকিয়া থাকিয়া "চমকি চমকি উঠি"।

কমলপত্র বীজন করিলে অসহ্য বোধ হয়, চন্দনপঙ্ক লেপন করিলে উপশম না হইয়া বিপরীত হয়।

শীতল সমীরণে সমস্ত জগতের তাপ নিবারণ করে, কেবল আমি হতভাগিনী, সখীকে ডাকিয়া বলি "উহু উহু, সখি, দ্বার রোধ করিয়া দাও।"

সখীরা স্নেহভরে দেহ স্পর্শ করিলে চমকিয়া হাত ঠেলিয়া দিই। না জানি কোন্ স্পর্শে আরাম পাইব!

মনোহরা শারদ পূর্ণিমা কাহার না আনন্দদায়িনী—কেবল আমার কষ্ট কেন দ্বিগুণ বাড়াইয়া তোলে!

আমার ন্যায় আর কোন হতভাগিনী সম্বন্ধে জয়দেব লিখিয়াছেন,—

"নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরং।
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরং।"

অন্যত্র লিখিয়াছেন "নিশি নিশি রুজমুপযাতি।" আমারও সেই দশা। রাত্রেই বাড়িয়া উঠে।

আমার এ কি হইল?

পাঠকের উত্তর।

তোমার বাত হইয়াছে। অতএব পূবে হাওয়া বহিলে যে দ্বাররোধ করিয়া দাও সেটা ভালই কর। পরীক্ষাস্বরূপে চন্দনপঙ্ক লেপন না করিলেই উত্তম করিতে। পূর্ণিমার সময় যে বেদনা বাড়ে সে তোমার একলার নহে, রোগটার ঐ এক লক্ষণ। চাঁদের সহিত বিরহ, বাত, পয়ার এবং জোয়ার ভাঁটার একটা যোগ আছে।

রাধিকার ন্যায় রাত্রে তোমার রোগ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু রাধিকার সময় ভাল ডাক্তার ছিল না তোমার সময়ে ডাক্তারের অভাব নাই। অতএব আমার ঠিকানা সম্পাদকের নিকট জানিয়া লইয়া অবিলম্বে চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিবে।

নূতন উত্তীর্ণ ডাক্তার।

স্বরলিপি।

("মায়ার খেলা" হইতে)

শান্তা। আমার পরাণ যাহা চায়,
তুমি তাই, তুমি তাই গো!
তোমা ছাড়া আর এ জগতে
মোর, কেহ নাই, কিছু নাই গো!
তুমি সুখ যদি নাহি পাও,
যাও, সুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে
আর কিছু নাহি চাই গো!
আমি, তোমার বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী
দীর্ঘ বরষ মাস!
যদি আর কারে ভাল বাস,
যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে, তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও,
আমি যত দুখ পাই গো!

মিশ্র কানেড়া—কাওয়ালি।

৪ | ৪

॥ মা পা মা ঙ্গা। রা সা সরা ন্‌া। সা -া -া -া।
॥ আ মা র, প। রা ণ, যা হা। চা — — য়।

। সা মপা পা -পা-। -া -া ধা পধা। মা -পা -ধপা মপা।
। তু মি, তা ই। — — তু মি। তা — — ই।

। মা -ঙ্গা -রসা -রা॥ মা পা পা পা। পা -া ধা পধা।
। গো — — —॥ তো মা ছা ড়া। আ র, এ জ।

। মা -া পা -া। -া -া মা পা। মা পর্সা র্সা -া।
। গ — তে —। — — মো র। কে হ না ই।

। -া -া ঞধা পধা। মা -পা -ধপা মপা। মা -ঙ্গা -রসা -রা॥
। — — কি ছু। না — — ই। গো— — —॥

। · · পা পধা। মা পা পা -না। না -র্সনা ধা না।
। তু মি। সু খ, ষ —। দি — না হি।

। র্সা -নর্সা -র্রর্সা -না। র্সা -া র্সা -া। না র্সা র্রা র্রা।
। পা — — —। ও, — যা ও। সু খে র, স।

। র্রা -ঙ্গর্রা র্সা র্রা। নর্সা -া ঞা -া। -ধা -ঞধা পা পধা।
। ন্ধা — নে —। যা — — —। — ও আ মি।

। মা পা পা পা। পা -া পা -ধা। মা পা পা -না।
। তো মা রে, পে। য়ে — ছি —। হৃ দ য় —।

। না -র্সা র্সা -া। নর্সা -নর্রা র্সঞা ধা। ধর্সা -ঞা ধা পধা।
। মা — ঝে —। আ — র, কি। ছু, — না হি।

। মা -পা -ধপা মপা। মা -ঙ্গা -রসা -রা॥ ধা ধা ধা ধা।
। চা — — ই। গো— — —॥ তো মা র, বি।

। ধা -ঞধা পা -ধা। মা পা পা পা। পা -া পা -া।
। র — হে —। র হি ব, বি। লী — ন —।

। মা পা ধা ধা। ধা -ঞধা পা -ধা। মপা -া -মা -া।
। তো মা তে, ক। রি — ব —। বা — — —।

। -ঙ্গা -া -া -া। ঙ্গা -রঙ্গমা রা রা। রা -া সা -া।
। — — — স। দী — র্ঘ, দি। ব — স —।

। রা -া সা সরা। ন্া -া সা -া। রা -মা মা মা।
। দী — র্ঘ, র। জ — নী —। দী — র্ঘ, ব।

। পা -া পধা মা। পা -া -া -া। · · পা পধা।
। র — — ষ। মা — — স। য দি।

। মা -পা না না। না -র্সনা ধা না। র্সা -া -র্রর্সা -না।
। আ — র, কা। রে — ভা ল। বা — — —।

। র্সা -া র্সা র্সা। নসা -নর্রা র্রা র্রা। র্রা -ঙ্গর্া র্রা র্সা।
। সো,— য দি। আ — র ফি। রে — না হি।

। নসা -া -ঞা -া। ধা -ঞধা পা পা। মা পা পা -া।
। আ — — —। স, — ত বে। তু মি, যা —।

। পা -া পা ধা। মা পা পা -না। না -র্সা র্সা -া।
। হা, — চা ও। তা ই, যে —। ন, — পা ও।

। নর্সা নর্রা র্সঞা -ধা। ধর্সা -ঞা ধা পধা। মা -পা -ধপা মপা।
। আ মি, য —। ত, — দু খ। পা — — ই।

। মা -ঙ্গা -রসা -রা॥ ॥
। গো — — —॥ ॥

("ব্রহ্ম-সঙ্গীত" হইতে)

দরশন দাও হে, প্রভু, এই মিনতি।
তব পদ-আশে হৃদয় সদাই আকুল অতি।
তুমি মম জীবন, প্রাণের প্রাণ,
তোমা বিনা প্রভু নাহি কোন গতি।

* সুরট—তেওট।

৪—৩।৪

।১।২´।৩।০।

॥ {মা রা মা পা। ঞ্রঞ্রা পা -া। মা রা সন্া সা।
॥ {দ র শ ন। দাও হে —। প্র ভু, এ ই।

। রমা মমা গমা} ॥ রা রা মা মা। পা -া পা। মা পা না র্সা।
। মি ন নি} ॥ ত ব, প দ। আ — সে। হৃ দ য়, স।

। র্সা -া র্সা। র্সা -র্সনর্র্া র্সা ঞ্রধা। পা মমা -পমা} ॥
। দা — ই। আ — কু ল। অ তি —} ॥

। · · · ·। · · ·। মা পা না না। {{র্সা -া -া।
। । । তু মি, ম ম। {{জী — —।

নর্সা -র্র্সা -নর্সা র্সা। -র্সর্সা -ঞ্রর্সা ঞ্রধা। পা -া ধা পা।
। ব — — ন। — — —। প্রা — ণে র।

---

* "গীত-সূত্র-সার" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ "মোতীরা মাঙ্গা দে" গীতের সুরে ভাঙ্গা। একটু-আধটু পরিবর্ত্তন আছে।

। মা -পা -র্সা। নর্সা -র্রা -া -র্সর্রা। -র্মর্গা -র্মর্রা -র্গর্রা।
। প্রা — —। ণ — — —। — — —।

। (র্রা না না না) }}। না না না না। র্সা র্সা -া।
। (তু মি, ম ম) }}। তো মা বি না। প্র ভু —।

। র্সা র্সনা র্সা র্রা। র্সর্রা সঞ্জা -ধপা ॥ ॥
। না হি কো ন। গ তি — ॥ ॥

যে-সুর ঈষৎ ছুঁইয়া যায় তাহার পার্শ্বে /॰ এক আনা চিহ্ন দেওয়া হয়। এক আনা চিহ্ন না দিয়া ঐ সুরটি ছোট অক্ষরে লিখিলেও চলে।

আলোচনা।

(পত্র)

লেখা সম্বন্ধে তুমি যে প্রস্তাব করেছ সে অতি উত্তম। মাসিক পত্রে লেখা অপেক্ষা বন্ধুকে পত্র লেখা অনেক সহজ। কারণ, আমাদের অধিকাংশ ভাবই বুনো হরিণের মত, অপরিচিত লোক দেখ্‌লেই দৌড় দেয়। আবার, পোষা ভাব এবং পোষা হরিণের মধ্যে স্বাভাবিক বন্য শ্রী পাওয়া যায় না।

কাজটা দু'রকমে নিষ্পন্ন হতে পারে। এক, কোন একটা বিশেষ বিষয় স্থির করে দু'জনে বাদ প্রতিবাদ করা। কিন্তু তার একটা আশঙ্কা আছে, মীমাংসা হবার পূর্ব্বেই বিষয়টা ক্রমে একঘেয়ে হয়ে যেতে পারে। আর এক, কেবল

লেখা। অর্থাৎ কোন উদ্দেশ্য না রেখে লেখা। কেবল লেখার জন্যেই লেখা। অর্থাৎ ছুটির দিনে দুই বন্ধুতে মিলে রাস্তার বেরিয়ে পড়া; তার পরে যেখানে গিয়া পড়ি তাতে কিছু আসে যায় না—এবং পথ হারালেও কোন মনিবের কাছে কৈফিয়ৎ দেবার নেই।

দস্তুরমত রাস্তায় চল্‌তে গেলে অপ্রাসঙ্গিক কথা বল্‌বার যো থাকে না। কিন্তু প্রাপ্য জিনিষের চেয়ে "ফাউ" যেমন বেশি ভাল লাগে তেমনি অধিকাংশ সময়েই অপ্রাসঙ্গিক কথা-টায় বেশি আমোদ পাওয়া যায়; মূল কথাটার চেয়ে তার আশপাশের কথাটা বেশি মনোরম বোধ হয়; অনেক সময়ে রামের চেয়ে হনুমান এবং লক্ষণ, যুধিষ্ঠিরের চেয়ে ভীষ্ম এবং ভীম, সূর্য্যমুখীর চেয়ে কমলমণি বেশি প্রিয় বলে বোধ হয়।

অবশ্য, সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক কথা বল্লে একেবারে পাগলামী করা হয়; কিন্তু তাই বলে নিজের নাসাগ্রভাগের সমসূত্র ধরে ভূমিকা থেকে উপসংহার পর্য্যন্ত একেবারে সোজা লাইনে চল্লে নিতান্ত কলে তৈরি প্রবন্ধের সৃষ্টি হয়, মানুষের হাতের কাজের মত হয় না। সে রকম আঁটাআঁটি প্রবন্ধের বিশেষ আবশ্যক আছে এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু সর্ব্বত্রে তারই বড় বাহুল্য দেখা যায়। সে গুলো পড়লে মনে হয় যেন সত্য তার সমস্ত সুসংলগ্ন যুক্তিপরম্পরা নিয়ে একেবারে সম্পূর্ণভাবে কোথা থেকে আবির্ভূত হল! মানুষের মনের মধ্যে সে যে মানুষ হয়েচে, সেখানে তার যে আরো অনেকগুলি সম-বয়সী সহোদর ছিল, একটি বৃহৎ বিস্তৃত মানসপুরে যে তার একটি বিচিত্র বিহারভূমি ছিল, লেখকের প্রাণের মধ্যে থেকেই সে যে প্রাণ লাভ করেচে, তা' তা'কে দেখে, মনে হয় না—

এখন মনে হয় যেন কোন ইচ্ছাময় দেবতা যেমন বল্লেন "অমুক প্রবন্ধ হোক্" অমনি অমুক প্রবন্ধ হল—"লেট্ দেয়ার্ বি লাইট্ এণ্ড দেয়ার ওয়াজ্ লাইট্।" এই জন্য তাকে নিয়ে কেবল আমাদের মাথার খাটুনি হয়, কেবল মাত্র মগজ দিয়ে সেটাকে হজম করবার চেষ্টা করা হয়; আমাদের মানসপুরে যেখানে আমাদের নানাবিধ জীবন্তভাব জন্মাচ্চে খেল্‌চে এবং বাড়চে সেখানে তার স্বর পরিচিতভাবে প্রবেশ করতে পারে না; প্রস্তুত হয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে হয়, সাবধান হয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে হয়; তার সঙ্গে কেবল আমাদের একাংশের পরিচয় হয় মাত্র, ঘরের লোকের মত সর্ব্বাংশের পরিচয় হয় না।

ম্যাপে এবং ছবিতে অনেক তফাৎ। ম্যাপে "পার্স্পেক্টিভ" থাক্‌তে পারে না; দূর নিকটের সমান ওজন্, সর্ব্বত্রই অপক্ষপাত; প্রত্যেক অংশকেই সূক্ষ্মবিচার মত তার যথাপরিমাণ স্থান নির্দ্দেশ করে দিতে হয়;—কিন্তু ছবিতে অনেক জিনিষ বাদ পড়ে; অনেক বড় ছোট হয়ে যায়; অনেক ছোট বড় হয়ে ওঠে; কিন্তু তবু ম্যাপের চেয়ে তাকে সত্য মনে হয়, তাকে দেখ্‌বামাত্রই এক মুহূর্ত্তে আমাদের সমস্ত চিত্ত তাকে চিন্‌তে পারে। আমরা চোখে যে ভুল দেখি তাকে সংশোধন করতে গেলে ছবি হয় না ম্যাপ হয়, তাকে মাথা খাটিয়ে আয়ত্ত করতে হয়। কিন্তু এই রকম আংশিক চেষ্টা ভারি শ্রান্তিজনক। যাতে আমাদের সমস্ত প্রকৃতি উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেয় না, পরস্পরের ভার লাঘব করে না, নিজ নিজ অংশ বণ্টন করে নেয় না, তাতে আমাদের তেমন পরিপুষ্টি সাধন হয় না। যে কারণে খনিজ পদার্থের চেয়ে প্রাণিজ পদার্থ আমরা শীঘ্র

গ্রহণ এবং পরিপাক করতে পারি, সেই কারণে একেবারে অমিশ্র খাঁটি সত্য কঠিন যুক্তি আকারে আমাদের অধিকাংশ পাকযন্ত্রের পক্ষেই গুরুপাক। এই জন্য সত্যকে মানবের জীবনাংশের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিলে সেটা লাগে ভাল।

সেই কাজ্ করতে গেলেই প্রথমতঃ একটা সত্যকে এক দমে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত আগাগোড়া দেওয়া যায় না। কারণ, অধিকাংশ সত্যই আমরা মনের মধ্যে আভাসরূপে পাই, এবং তার পশ্চাতে আমাদের মাথাটাকে প্রেরণ করে গড়ে পিটে তার একটা আগাগোড়া খাড়া করে তুল্‌তে চেষ্টা করি। সেটা'ক বেশ একটা সঙ্গত এবং সম্পূর্ণ আকার না দিলে একটা চলনসই প্রবন্ধ হল না মনে করি। এই জন্যে নানাবিধ কৃত্রিম কাঠ খড় দিয়ে তাকে নিয়ে একটা বড় গোছের তাল পাকিয়ে তুল্‌তে হয়।

আমি ইংরিজি কাগজ এবং বইগুলো যখন পড়ি তখন অধিকাংশ সময়েই আমার এই কথা মনে হয়, যে, একটা কথাকে একটা প্রবন্ধ কিম্বা একটা গ্রন্থে পরিণত করতেই হবে এই চেষ্টা থাকাতে প্রতিদিনকার ইংরাজি সাহিত্যে যে কত বাজে বকুনির প্রাচুর্ভাব হয়েচে তার আর সংখ্যা নেই—এবং সত্যটুকুকে খুঁজে বের করা কত দুঃসাধ্য হয়েচে। যে কথাটা বলা হচ্চে সেটা আসলে কত সহজ, এবং সংক্ষিপ্ত, সেটাকে না-হক্ কত দুরূহ এবং বৃহৎ করে তোলা হয়! আমার বোধ হয় ইংরাজি সাহিত্যের মাপকাঠিটা বড় বেশি বেড়ে গেছে;—তিন ভল্যুম না হলে নভেল হয় না এবং মাসিক পত্রের এক একটা প্রবন্ধ দেখ্‌লে ভয় লাগে। আমার বোধ হয় নাইণ্টীন্থ্ সেঞ্চুরি যদি অতবড় আয়তনের কাগজ না হত তা হলে ওর লেখাগুলো ঢের বেশি পাঠ্য এবং খাঁটি হত।

আমার ত মনে হয় বঙ্কিম বাবুর নভেলগুলি ঠিক নভেলের যত বড় হওয়া উচিত তার আদর্শ। ভাগ্যে তিনি ইংরাজি নভেলিষ্টের অনুকরণে বাঙ্গলায় বৃহদায়তনের দস্তুর বেঁধে দেন নি, তা হলে বড় অসহ্য হয়ে উঠ্‌ত—বিশেষতঃ সমালোচকের পক্ষে। এক একটা ইংরাজি নভেলে এত অতিরিক্ত বেশি কথা, বেশি ঘটনা, বেশি লোক, যে, আমার মনে হয় ওটা একটা সাহিত্যের বর্ব্বরতা। সমস্ত রাত্রি ধরে যাত্রা গান করার মত। প্রাচীন কালেই ওটা শোভা পেত। তখন ছাপাখানা এবং প্রকাশক সম্প্রদায় ছিল না, তখন একখানা বই নিয়ে বহুকাল জাওর কাট্‌বার সময় ছিল।—এমন কি, জর্জ্ এলিয়টের নভেল যদিও আমার খুব ভাল লাগে তবু এটা আমার বরাবর মনে হয় জিনিষগুলো বড় বেশি বড়—এত লোক, এত ঘটনা, এত কথার হিজিবিজি না থাক্‌লে বইগুলো আরো ভাল হত। কাঁঠাল ফল দেখে যেমন মনে হয়, প্রকৃতি একটা ফলের মধ্যে ঠেসাঠেসি করে বিস্তর সারবান্ কোষ পূরতে চেষ্টা করে ফলটাকে আয়তনে খুব বৃহৎ এবং ওজনে খুব ভারি করেচেন বটে এবং একজন লোকের সঙ্কীর্ণ পাকযন্ত্রের পক্ষে কম দুঃসহ করেন নি কিন্তু হাতের কাজটা মাটি করেচেন। এরি একটাকে ভেঙ্গে ত্রিশ পঁয়ত্রিশটা ফল গড়লে সেগুলো দেখ্‌তে ভাল হত। জর্জ্ এলিয়টের এক একটি নভেল এক একটি সাহিত্য কাঁঠাল বিশেষ। ক্ষমতা দেখে মানুষ আশ্চর্য্য হয় বটে কিন্তু সৌন্দর্য্য দেখে মানুষ খুসি হয়। স্থায়িত্বের পক্ষে সহজতা সরলতা সৌন্দর্য্য যে প্রধান উপকরণ তার আর সন্দেহ নেই।

সত্যকে যথাসাধ্য বাড়িয়ে তুলে তাকে একটা প্রচলিত দস্তুরমত আকার দিয়ে সত্যের খর্ব্বতা করা হয়, অতএব তার

কাজ নেই। তা ছাড়া সত্যকে এমন ভাবে প্রকাশ করা যাক্ যাতে লোকে অবিলম্বে জান্‌তে পারে যে, সেটা আমারই বিশেষ মন থেকে বিশেষভাবে দেখা দিচ্চে। আমার ভাল লাগা মন্দ লাগা, আমার সন্দেহ এবং বিশ্বাস, আমার অতীত এবং বর্ত্তমান তার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাক্, তা হলেই সত্যকে নিতান্ত জড়পিণ্ডের মত দেখাবে না।

আমার বোধ হয় সাহিত্যের মূল ভাবটাই তাই। যখন কোন একটা সত্য লেখক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা দেয়, যখন সে জন্মভূমির সমস্ত ধূলি মুছে ফেলে এমন ছদ্মবেশ ধারণ করে যাতে করে' তাকে একটা অমানুষিক স্বয়ম্ভু সত্য বলে মনে হয় তখন তাকে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি নানা নাম দেওয়া হয়। কিন্তু যখন সে সঙ্গে সঙ্গে আপনার জন্মভূমির পরিচয় দিতে থাকে, আপনার মানবাকার গোপন করে না, নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা এবং জীবনের আন্দোলন প্রকাশ করে তখনি সেটা সাহিত্যের শ্রেণীতে ভুক্ত হয়। এই জন্যে বিজ্ঞান দর্শন সবই সাহিত্যের মধ্যে মিশিয়ে থাক্‌তে পারে এবং ক্রমেই মিশিয়ে যায়। প্রথম গজিয়ে তারা দিনকতক অত্যন্ত খাড়া হয়ে থাকে, তার পরে মানবজীবনের সঙ্গে তারা যতই মিলে যায় ততই সাহিত্যের অন্তর্ভূত হতে থাকে, ততই তার উপর সহস্র মনের সহস্র ছাপ পড়ে এবং আমাদের মনোরাজ্যে তাদের আর প্রবাসীভাবে থাক্‌তে হয় না।

এই রকম সাহিত্য আকারে যখন সত্য পাই, তখন সে সর্ব্বতোভাবে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী হয়।

কিন্তু সাধারণের সহজে ব্যবহারোপযোগী হয় বলেই সাধারণের কাছে অনেক সময় তার বিশেষ গৌরব চলে যায়। যেন

সত্যকে মানবজীবন দিয়ে মণ্ডিত করে' প্রকাশ করা কম কথা! সেটাকে সহজে গ্রহণ করা যায় বলে' যেন সেটাকে সৃজন করাও সহজ! তাই আমাদের সারবান সমালোচকেরা প্রায়ই আক্ষেপ করে থাকেন, বাঙ্গলায় রাশি রাশি নাটক নভেল কাব্যের আমদানি হচ্চে! কই হচ্চে! যদি হত, তা হলে আমাদের ভাবনা কি ছিল!

আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না, আমরা জ্ঞানতঃ কিম্বা অজ্ঞানতঃ মানুষকেই সবচেয়ে বেশি গৌরব দিয়ে থাকি! আমরা যদি কোন সাহিত্যে অনেকগুলো ভ্রান্ত মতের সঙ্গে একটা জীবন্ত মানুষ পাই সেটাকে কি চিরস্থায়ী করে রেখে দিইনে? জ্ঞান পুরাতন এবং অনাদৃত হয় কিন্তু মানুষ চিরকাল সঙ্গদান করতে পারে। সত্যকার মানুষ প্রতিদিন যাচ্চে এবং আস্চে; তাকে আমরা খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখি, এবং ভুলে যাই, এবং হারাই। অথচ মানুষকে আয়ত্ত করবার জন্যেই আমাদের জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্যাকুলতা। সাহিত্যে সেই চঞ্চল মানুষ আপনাকে বদ্ধ করে' রেখে দেয়; তার সঙ্গে আপনার নিগূঢ় যোগ চিরকাল অনুভব করতে পারি। জীবনের অভাব সাহিত্যে পূরণ করে। চিরমনুষ্যের সঙ্গ লাভ করে' আমাদের পূর্ণ মনুষ্যত্ব অলক্ষিতভাবে গঠিত হয়—আমরা সহজে চিন্তা করতে, ভালবাস্তে এবং কাজ করতে শিখি। সাহিত্যের এই ফলগুলি তেমন প্রত্যক্ষগোচর নয় বলে' অনেকে এ'কে শিক্ষার বিষয়ের মধ্যে নিকৃষ্ট আসন দিয়ে থাকেন কিন্তু আমার বিশ্বাস, সাধারণতঃ দেখ্লে, বিজ্ঞান দর্শন ব্যতীতও কেবল সাহিত্যে একজন মানুষ তৈরি হতে পারে কিন্তু সাহিত্য ব্যতিরেকে কেবল বিজ্ঞান দর্শনে মানুষ গঠিত হতে পারে না।

সূর্য্য অস্ত গেল। আকাশ এবং জলের উপর চমৎকার রং দেখা দিয়েচে। সমুদ্রের জলে একটি রেখামাত্র নেই। দিগন্ত-বিস্তৃত অটুট্ জলরাশি যৌবন-পরিপূর্ণ পরিস্ফুট দেহের মত একেবারে নিটোল এবং সুডোল। এই অপার অখণ্ড পরিপূর্ণতা আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত থম্‌থম্ করচে। বৃহৎ সমুদ্র হঠাৎ যেন এমন একটা জায়গায় এসে থেমেচে যার ঊর্দ্ধে আর গতি নেই, পরিবর্ত্তন নেই; যা' অনন্তকাল অবিশ্রাম চাঞ্চল্যের পরম পরিণতি, চরম নির্ব্বাণ। সূর্য্যাস্তের সময় চিল আকাশের নীলিমার যে একটি সর্ব্বোচ্চ সীমার কাছে গিয়ে সমস্ত বৃহৎ পাখা সমতলরেখায় বিস্তৃত করে' দিয়ে হঠাৎ গতি বন্ধ করে' দেয়, চিরচঞ্চল সমুদ্র ঠিক যেন সহসা সেইরকম একটা পরম প্রশান্তির শেষ সীমায় এসে ক্ষণেকের জন্যে পশ্চিম অস্তাচলের দিকে মুখ তুলে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েচে। জলের যে চমৎকার বর্ণবিকাশ হয়েচে সে আকাশের ছায়া কি সমুদ্রের আলো ঠিক বলা যায় না। যেন একটা মাহেন্দ্রক্ষণে আকাশের নীরব নির্নিমেষ নীল নেত্রের দৃষ্টিপাতে হঠাৎ সমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে থেকে একটা আকস্মিক প্রতিভার দীপ্তি স্ফূর্ত্তি পেয়ে তাকে অপূর্ব্ব মহিমান্বিত করে তুলেচে।

সমুদ্র এবং আকাশের অসীম স্তব্ধতার মধ্যে এই আশ্চর্য্য বর্ণের উদ্ভাস দেখে' আমার কেবলি মনে হচ্চে এইটেকে ঠিক ব্যক্ত কর্‌তে পারি এমন ভাষা আমার কোথায়! কিন্তু আবার ভাবি, আবশ্যক কি? এ চঞ্চলতা কেন? বৃহৎকে ছোটর মধ্যে বেঁধে সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হবে এ কি রকমের দুশ্চেষ্টা! এই দুর্গম দুর্লভ বাক্যহীন এবং অনির্ব্বচনীয় প্রকাণ্ড সুন্দরী

প্রকৃতির একটি পকেট-সাইজের সুলভ সংস্করণ জেবের মধ্যে পুরতে না পারলে মনের ক্ষোভ মেটে না; মাঝের থেকে এই ছট্‌ফটানির জ্বালায় যতটুকু সহজে পাওয়া যেতে পারত তাও হাত ছাড়া হয়!

কিন্তু, তবু—সমুদ্র এবং আকাশের মাঝখানটি থেকে এই দুর্লভ সন্ধ্যাটুকুকে পারিজাতপুষ্পটির মত তুলে নিয়ে যদি আর একজনের হাতে না দিতে পারি তা হলে মনে হয় যেন সমস্ত নিষ্ফল হল। এই আলো এই শান্তি কেবল একা বসে চেয়ে দেখ্‌বার এবং মুগ্ধ হবার জন্যে নয়, মানুষের উপর নিক্ষেপ করে তাকে আচ্ছন্ন করে তাকে সুন্দর করবার জন্যে। ঘরের মধ্যে আনবার জন্যে, লোকালয়ের উপরে বিস্তৃত করবার জন্যে, ভালবাসার লোকের মুখের উপরে ধরে তাকে নূতন এবং সুন্দর আলোকে দেখ্‌বার জন্যে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। ঢং ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বেজে গেল। সকলে বেশভূষা পরিবর্ত্তন করে সান্ধ্যভোজের জন্যে সুসজ্জিত হতে গেল। আধঘণ্টা পরে আবার ঘণ্টা বাজ্‌ল। নরনারীগণ দলে দলে ভোজনশালায় প্রবেশ কর্‌লে। আমরা তিন বাঙ্গালী একটি স্বতন্ত্র ছোট টেবিল অধিকার করে বস্‌লুম। আমাদের সাম্‌নে আর একটি টেবিলে দুটি মেয়ে একটি উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে খেতে বসেচেন।

চেয়ে দেখ্‌লুম, তাঁদের মধ্যে একটি যুবতী আপনার যৌবনশ্রী বহুল পরিমাণে উদ্ঘাটিত করে দিয়ে সহাস্য মুখে আহার এবং আলাপে নিযুক্ত আছেন। তাঁর শুভ্র সুগোল সুচিক্কণ গ্রীবাবক্ষবাহুর উপর সমস্ত বিদ্যুৎ-প্রদীপের অনিমেষ আলো এবং পুরুষমণ্ডলীর বিস্মিত সকৌতুক দৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল।

একটা অনাবৃত আলোক-শিখা দেখে দৃষ্টিগুলো যেন কালো কালো পতঙ্গের মত চারিদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লম্ফ দিয়ে পড়ছে। এমন কি অনেকে মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে তাঁকে নিরীক্ষণ করছে এবং তাই নিয়ে ঘরের সর্ব্বত্র একটা হাস্যকৌতুকের তরঙ্গ উঠেছে। অনেকেই সেই যুবতীর পরিচ্ছদটিকে "ইণ্ডেকোরাস্" বলে' উল্লেখ করচে। কিন্তু আমাদের মত বিদেশী লোকের পক্ষে তার বেআব্রু বেআদবীটা বোঝা একটু শক্ত। কারণ, নৃত্যশালায় এ রকম কিম্বা এর চেয়ে অনাবৃত বেশে গেলে কারো বিস্ময় উদ্রেক করে না। যেখানে সদ্যঃপরিচিত স্ত্রীপুরুষে পরস্পর আলিঙ্গন-পাশে নিবদ্ধ হয়ে উন্মত্তের মত নৃত্য করে' বেড়ায় সেখানে ভদ্র কুলস্ত্রীদের শরীর থেকে লজ্জা এবং বসন অনেকটা পরিমাণে উন্মুক্ত করে ফেলা যদি দোষের না হয় তবে এই ভোজন-সভাতে আপনার পূর্ণমঞ্জরিত দেহসৌন্দর্য্যের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়ে যাওয়া এম্নি কি দোষের!

কিন্তু বিদেশের সমাজনীতি সম্বন্ধে বেশি উৎসাহের সঙ্গে কিছু বলা ভাল নয়। আমাদের দেশে দেখা যায় বাসরঘরে এবং কোন কোন বিশেষ উপলক্ষে মেয়েরা যেমন অবাধে লজ্জাহীনতা প্রকাশ করে অন্য কোন সভায় তেমন করলে সাধারণের কাছে দুষ্য হত সন্দেহ নেই। সমাজে যেমন নিয়মের বাঁধাবাঁধি থাকে তেম্নি মাঝে মাঝে দুটো একটা ছুটিও থাকে; নইলে, পাছে চঞ্চল মানবস্বভাব সমাজভিত্তির মধ্যে শত শত গোপন ছিদ্রপথ খনন করে! ইংরাজিতে যাকে "ফ্লার্টেশন্" বলে আমাদের সমাজে তা প্রচলিত নেই সুতরাং তার কোন নামও নেই, কিন্তু গৃহের মধ্যে এমন অনেকগুলি পরিহাসের স্থল রাখা হয়েছে যেখানে অনেক পরিমাণে সমাজনিয়মের সমাজ-

সম্মত লঙ্ঘন চল্‌তে পারে। সেখানে যে রকম রসালাপপূর্ণ অভি-নয় চলে তা' যে সকল সময়ে সুসম্বৃত সুশোভন তা বলা যায় না।

কিন্তু য়ুরোপীয়েরা যতই চেষ্টা করুক আবরণহীনতা সম্বন্ধে কিছুতেই আমাদের ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। এ সম্বন্ধে মানবের যতদূর সাধ্য আমাদের দেশে তার ত্রুটি হয় নি। সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম অপূর্ব্ব কারুকৌশলে আমাদের স্ত্রীসমাজে বসন থেকে আবরণের অংশ যতদূর সম্ভব ছাড়িয়ে ফেলা যেতে পারে তা ফেলা হয়েচে। বস্ত্র পরিধানের দ্বারা অঙ্গকে অনাবৃত করা বঙ্গ অন্তঃপুরে আশ্চর্য্য পরিণতি লাভ করেচে। কিন্তু একটা কথা বলা আবশ্যক; ইংরেজমেয়েদের পক্ষে শরীরের উত্তরভাগ বিশেষরূপে অনাচ্ছন্ন করার মধ্যে একটা চেষ্টা চেতনা চাতুরী লক্ষিত হয়;—আমাদের মেয়েরা যে উলঙ্গতা পরিধান পূর্ব্বক অষ্টপ্রহর বিচরণ করে' থাকেন তার মধ্যে কোন উদ্দেশ্য, চেষ্টা কিম্বা চেতনা নেই এই জন্যে আমাদের চোখে সেটা সচরাচর বিবসনতা বলে ঠেকে না। অবশ্য, সময় বিশেষে তাঁরা, যে, দ্রুত হস্তক্ষেপে মস্তক বেষ্টন করে' প্রায় নাসিকার প্রান্তভাগপর্য্যন্ত ঘোমটা আকর্ষণ করে দেন না এ-রকম ঘোরতর নির্লজ্জতার অপবাদ তাঁদের কেউ দিতে পারে না।

সাময়িক সারসংগ্রহ।

আমেরিকানের রক্তপিপাসা।—বিখ্যাত আমেরিকান্ কবি লোয়েল তাঁহার কোন কবিতায় লিখিয়াছেন, আমেরিকার দক্ষিণ হইতে উত্তর সীমা পর্য্যন্ত এই সমগ্র বৃহৎজাতি রক্তের গন্ধ ভালবাসে। একজন ইংরাজ লেখক নবেম্বর মাসের "কণ্টেম্পোরারি রিভিয়ু" পত্রিকায় এই কথার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

তিনি বলেন, যাহারা কখন আমেরিকায় পদার্পণ করে নাই, বহি পড়িয়া আমেরিকান্ সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছে তাহারা কল্পনা করিতে পারে না আমেরিকায় জীবনের মূল্য কত যৎসামান্য, এবং সেখানকার লোকেরা খুন অপরাধকে কত তুচ্ছ মনে করে। প্রথমতঃ, সকল দেশেই যে সকল কারণে কম বেশি খুন হইয়া থাকে আমেরিকাতেও তাহা আছে। দ্বিতীয়তঃ সেখানে অধিকাংশ লোকেই অস্ত্র বহন করিয়া বেড়ায় এবং সামান্য কারণে তাহা ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। কালিফর্ণিয়া বিভাগের সুপ্রীমকোর্টের এক জজ্ রেলোয়ে ষ্টেশনের ভোজনশালায় খাইতে বসিয়াছেন, আদালতের আর একটি উচ্চ কর্ম্মচারী তাঁহার সঙ্গী ছিল। ইতিমধ্যে এক বারিষ্টার পূর্ব্বকৃত অপমান স্মরণ করিয়া জজের সহিত বিবাদ বাধাইয়া দেন, এমন কি, তাঁহার গায়েও হাত তোলেন। অন্য কর্ম্মচারীটি তৎক্ষণাৎ পিস্তল ছুঁড়িয়া বারিষ্টারকে বধ করিলেন, এমন কি, সে মরিয়া পড়িয়া গেলেও তাহাকে আর একগুলি মারিলেন। বারিষ্টারের স্ত্রী চীৎকার করিয়া গাড়িতে ফিরিয়া গেলেন। ইঁহারা তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার মাল অনুসন্ধান করিয়া একটি পিস্তল বাহির করিলেন। জুরিরা তাহাই দেখিয়া অপরাধীকে খালাস দিল; কারণ, এই পিস্তল দিয়া জজকে খুন করা নিতান্ত অসম্ভব ছিল না। সকলেই এই আইনের, এই বিচারের, এই কর্ম্মচারীর সতর্কতার বিস্তর প্রশংসা করিল। পুলিশের হাতেও সর্ব্বদা অস্ত্র থাকে, এবং তাহাদের দ্বারা শত শত অন্যায় খুন ঘটিয়া থাকে। নিউইয়র্ক্ সহরে একজন পুলিস্ম্যান্ খবর পাইল একজন চোর অমুক রাস্তা দিয়া পলাইতেছে। অনুসন্ধান করিতে গিয়া

দেখিল এক জন লোক কোন বাড়ির সিঁড়ির উপর ঘুমাই-তেছিল, গোলেমালে জাগিয়া উঠিয়া পলাইতে উদ্যত হইল। পুলিস্‌ম্যান্‌ তৎক্ষণাৎ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। গুলি দৈবাৎ তাহাকে না লাগিয়া পথের অপর প্রান্তে আর একজন পথিককে সাংঘাতিক রূপে আহত করিল। অবশেষে পলাতক ধরা পড়িলে জানা গেল তাহার কোন অপরাধ ছিল না; সে কেবল ভয়ে দৌড় দিয়াছিল। বিচারে স্থির হইল পুলিস্‌-ম্যান্‌ তাহার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিল। যে দেশের আইনে এইরূপ ব্যবস্থা, পুলিশের এইরূপ ব্যবহার, সে দেশের সাধারণ লোকেরাও যে অস্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনরূপ সংযম অভ্যাস করে না, তাহা বেশ অনুমান করা যায়। দেশের সর্ব্বত্রই পরি-বারগত বিদ্বেষ, ব্যক্তিগত বিবাদ, এমন কি, অপরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে সামান্য বচসাতেই খুনাখুনি ঘটিয়া থাকে। প্রায় মাঝে মাঝে এমন ঘটিয়া থাকে, পথে, কর্ম্মস্থানে অথবা সভাস্থলে দুই বিপক্ষে সাক্ষাৎ হইল, কেহ কোন কথা না বলিয়া পরস্পরের প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করিল, একজন অথবা দুই জনেই মারিয়া পড়িয়া গেল। কেবল ছোটলোকের মধ্যে নহে, শিক্ষিত এবং পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যেও এরূপ ঘটিয়া থাকে। অনেক ভদ্র খুনী সমাজের মধ্যে সম্মানের সহিত বাস করিতেছে; তাহারাও নিজের অপরাধের জন্য লজ্জিত নহে, তাহাদের বন্ধু এবং সমাজও তাহাদের জন্য লজ্জা অনুভব করে না।

আমেরিকায় বালকে, এমন কি, স্ত্রীলোকেও অনেক খুন করিয়া থাকে। লেখক রাস্তা দিয়া চলিতেছিলেন, দেখিলেন, একজন ভদ্রবেশধারিণী স্ত্রীলোকের সম্মুখে আর একজন ফিট্‌-ফাট্‌ কাপড় পরা ভদ্রলোক যেমন দাঁড়াইল, অমনি দুই এক

নের আঘাতের ফল মাত্র। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের চক্ষে যে পরিমাণে এই ঈথর-কম্পন আসিয়া পড়ে তাহার উপরই আলোকের বর্ণ নির্ভর করে। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ৩৯,২০০,০০০০০, ০০০০০ সংখ্যার কম কম্পন চক্ষে পড়িলে আমরা আর আলোক দেখিতে পাই না। তাহার ঊর্দ্ধে লাল দেখি এবং সংখ্যা যত বাড়িতে থাকে ক্রমে হল্‌দে, শবুজ এবং নীল দেখি; অবশেষে যখন ৭৫,৭০০,০০০০০,০০০০০ কম্পন আসিতে থাকে তখন বেগুনী রং দেখি এবং ইহার অধিক হইলে পুনশ্চ আর রং দেখিতে পাওয়া যায় না।

যে বস্তুর রং আমরা স্পেক্ট্রস্কোপ দিয়া নিরীক্ষণ করিতেছি সে যতই আমাদের দিকে অগ্রসর হইবে তাহার কম্পন-জাত ঈথর-তরঙ্গও ততই অধিক পরিমাণে আমাদের চখে পড়িবে। * এবং ঈথর-কম্পন যতই অধিক সংখ্যায় চখে পড়িবে ততই স্পেক্ট্রমের প্রত্যেক রং তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিয়া বেগুনীর দিকে অগ্রসর হইবে, ফলতঃ সমস্ত স্পেক্ট্রম একটু বেগুনীর দিকে সরিয়া যাইবে। অপরপক্ষে জ্বলন্ত বস্তু যতই দূরে সরিয়া যাইবে, সুতরাং তাহার ঈথর-তরঙ্গ যত অল্প পরিমাণে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের চখে পড়িবে ততই স্পেক্ট্রম রং বেগুনীর দিক হইতে লালের দিকে সরিয়া যাইবে। বস্তুর গতিবেগের পরিমাণ অনুসারে স্পেক্ট্রমের এই স্থান পরিবর্ত্তনের ন্যূনাধিক্য।

এইরূপ গতি নিরূপণ করিতে পারায় আমাদের কি কি সুবিধা হইয়াছে তাহা আল্‌গোল নামক একটি তারার বৃত্তান্ত অবলম্বন

* যথা—রাস্তায় সৈন্যদল চলিতেছে, সেই পথপ্রান্তে স্থির হইয়া দাড়াইয়া থাকিলে আমার পার্শ্ব দিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে যে পরিমাণ সৈন্য যাইবে, আমি তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যা যাইবে।

করিয়া সর্ রবর্ট্ বল্ আমাদের দেখাইয়াছেন। এই আল্‌গোল তারার বিশেষত্ব এই যে ইহার উজ্জ্বলতার নিয়মিত তারতম্য ঘটিয়া থাকে। দিন দুই ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর তারা বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহার পর ঘণ্টা কতকের মধ্যে ইহার জ্যোতি অর্দ্ধেকের অধিক কমিয়া গিয়া পুনর্বার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক পরিবর্ত্তন হওয়াতে এই তারাটি বহু দিন জ্যোতিষীদিগের নিকট বিশেষরূপে পরিচিত ছিল। অবশ্য এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনার কারণ অন্বেষণের ত্রুটি হয় নাই এবং বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে নানা প্রকার কারণ অনুমান করাও হইয়াছিল। এক দল বলিলেন যে উহা সূর্য্য গ্রহাদির ন্যায় নিজ অক্ষের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হইতেছে, এবং একদিকের জ্যোতি অপর দিক অপেক্ষা অল্প বলিয়া এইরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। অপর পক্ষ বলিলেন যে আল্‌গোল তারার একটি প্রদক্ষিণকারী গ্রহ আছে, এবং ইহা এক সময়ে আল্‌গোল এবং পৃথিবীর মাঝখানে আসিয়া কতক পরিমাণ আলোক আটক করিয়া রাখে। সকল অনুমানের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি না থাকিলেও পূর্ব্বে কোন বিশেষ অনুসারে প্রমাণের উপায় কেহ খুঁজিয়া পাইত না।

ভোগেল্ নামক জ্যোতির্ব্বিদ্ এই তারার প্রতি স্পেক্ট্রস্কোপ প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বকথিত উপায়ে বুঝিতে পারিলেন যে উহা মুহূর্ত্তে ২৬ মাইল বেগে আমাদের নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছে। কিয়ৎকাল পরে পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ করিতে গিয়া দেখিলেন যে এবার ২৬ মাইল বেগে উহা আমাদের নিকটে অগ্রসর হইতেছে। বলা বাহুল্য যে ইহার পরে যুরোপের সকল মানমন্দির হইতে এই তারাটির উপর স্পেক্ট্রস্কোপ এবং দুরবীক্ষণের দৃষ্টি বর্ষিত হইতে লাগিল।

শীঘ্রই এইরূপ অগ্রপশ্চাৎ গতির নিয়ম বাহির হইয়া পড়িল এবং সকলের কৌতূহলের সীমা রহিল না যখন দেখা গেল যে জ্যোতির হ্রাস এবং বৃদ্ধির সহিত আল্‌গোলের অগ্র পশ্চাৎ গতির বিশেষ সম্বন্ধ আছে। নিকটে আসিবার সময় জ্যোতির বৃদ্ধি হয় এবং দূরে যাইবার সময় কমিয়া যায়।

এইরূপ অবস্থায় সকলে যন্ত্র ছাড়িয়া কাগজ কলম ধরিল। প্রথমেই স্থির হইল যে সরল রেখায় অগ্র পশ্চাৎ গতি জ্ঞাত নিয়মানুসারে অসম্ভব। অতএব উহা নিশ্চয়ই চক্রাকার বা বৃত্তাভাসাকার পথে গমনাগমন করিতেছে। তাহা যদি হইল তবে উহার নিকটে নিশ্চয়ই কোন জ্যোতিষ্ক আছে যাহার আকর্ষণী শক্তির দ্বারা আল্‌গোল এইরূপ পথ অবলম্বনে বাধ্য হইতেছে। অবশেষে একে একে আল্‌গোলের এই সহচরের সকল গুণাগুণ প্রকাশ হইয়া পড়িল, যদিও উহার জ্যোতি না থাকাতে উহা আজ পর্য্যন্ত অদৃশ্য রহিয়াছে!

সর্ রবর্ট বল্ এই স্থানে আর উৎসাহ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না, তিনি আলগোল এবং তাহার গ্রহের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পাঠক দিগের বিরক্তি আশঙ্কায় আমরা ক্ষান্ত রহিলাম। এই টুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আল্‌গোলের, তাহার গ্রহের দ্বারা, কি পরিমাণে আলোক আটক হইতেছে দেখিয়া, উক্ত দুই তারার আপেক্ষিক আয়তন পাওয়া গেল। আয়তন এবং গতিবেগ হইতে গুরুত্ব সহজেই জানা যাইতে পারে এবং যখন দেখা গেল যে উহারা উভয়েই সূর্য্য অপেক্ষা আয়তনে অধিক অথচ ওজনে কম তখন উহাদের অধিকাংশ যে বাষ্পীয় অবস্থায় তাহার আর সন্দেহ রহিল না। ইহার মধ্যে আশ্চর্য্যের বিষয় শুধু এইটুকু যে, আল্‌গোলের সঙ্গীটি বাষ্পীয় অবস্থায়ও জ্যোতির্হীন।

কিন্তু অন্য তারার সহিত ইহাদের বিশেষ প্রভেদ না দৃষ্ট হইলেও সর্ রবর্ট বল্‌কে এই দীর্ঘ বর্ণনার জন্য দোষ দেওয়া যায় না— এত দিন পরে এই প্রথম একটি তারার গুরুত্ব আয়তন এবং গতিবেগ প্রকৃত রূপে জানা গেল অথচ উহার দূরত্ব সম্বন্ধে আমরা আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আল্‌গোলকে তবুও দেখিতে পাইতেছি। তাহার আলোকহীন সহচরকে না দেখিয়া শুনিয়াই তাহার ইতিবৃত্ত ভরসা করিয়া বলিতে পারা নিতান্ত কম কথা নহে!

সর্ রবর্ট বল্ মীজার নামক সপ্তর্ষি নক্ষত্রে স্থিত আর একটি তারার কথা বলিয়া এই প্রবন্ধটি শেষ করিতেছেন। যেরূপ আলগোল এবং তাহার সহচর সেইরূপ দুই নক্ষত্রের একত্র সম্বন্ধের অন্য অনেক দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু অনেক সময়ে দুইটাই জ্যোতির্বিশিষ্ট হইলেও এত নিকটে থাকে যে দূরবীক্ষণের সাহাযোও উহাদিগকে এক বলিয়া ভ্রম হয়। মীজার এইরূপ একটি জোড়া। স্পেক্ট্রস্কোপে উহাদের ভিন্নতা সহজেই ধরা পড়ে, কারণ, যখন এরূপ অবস্থা ঘটে যে একটা নিকটে আসিতেছে একটা দূরে সরিয়া যাইতেছে তখন উহাদের দুই স্পেক্ট্রম দুই পার্শ্বে সরিয়া গিয়া সকল রং এবং কালো রেখাগুলিকে ডবল করিয়া ফেলে। ইহা দেখিলেই উহাদের যুগলতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না।

এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র যে স্পেক্ট্রস্কোপের গুণের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নহে। য়ুরপীয় জ্যোতির্বিদগণ কি প্রকারে তাহাদের মানমন্দিরে কার্য্য করিয়া থাকেন, কত ছোটখাট খুঁটিনাটি (যাহা হয় ত সচরাচর লোকের চক্ষে পড়িতই না) হইতে কত বড় বড় তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ফেলে তাহারও

কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। উঁহাদের আশ্চর্য্য শ্রম-সহিষ্ণুতা, দৃষ্টি-সূক্ষ্মতা এবং যুক্তি-কৌশল দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা।

সাহিত্য। মাঘ।—লয়। এই প্রবন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বাবু পরব্রহ্মে বিলীন হইবার কামনা ও সাধনাই যে হিন্দুর হিন্দুত্ব তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং প্রবন্ধের উপসংহারে আক্ষেপ করিয়াছেন য়ুরোপের সংস্পর্শে আমাদের এই জাতীয়তা সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে, অতএব তাহা প্রাণপণে রক্ষা করা আমাদের সকলের একান্ত কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে আমাদের গুটি কতক কথা বলিবার আছে। ব্রহ্মে বিলীন হইবার সাধনা জাতীয়তা রক্ষার বিরোধী। কারণ সে সাধনার নিকট কোথায় গৃহবন্ধন, কোথায় সমাজবন্ধন, কোথায় জাতিবন্ধন! অতএব জাতীয়তা বিনাশচেষ্টাকেই যদি হিন্দুর জাতীয়তা বলা হয় তবে সে জাতীয়তা ধ্বংশ করাই, যে, আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য তাহা অস্বীকার করা যায় না। জগৎকে মায়া এবং চিত্তবৃত্তিকে মোহ বলিয়া স্থির করিলে বিজ্ঞানচর্চ্চা বিদ্যাচর্চ্চা সৌন্দর্য্যচর্চ্চা সমস্তই নিষ্ফল এবং অনিষ্টকর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আমি ছাড়া যতদিন আর কিছুকে দেখিতে পাইব অনুভব করিতে পারিব ততদিন আমি মায়াবদ্ধ; যখন আমি ছাড়া আর কেহ নাই কিছু নাই, অতএব যখন আমিও নাই (কারণ, অন্যের সহিত তুলনা করিয়াই আমির আমিত্ব) তখন সাধনার শেষ, মায়ামোহের বিনাশ। এমন সর্ব্বনাশিনী জাতীয়তা যদি হতভাগ্য হিন্দুর স্কন্ধে আবির্ভূত হইয়া থাকে তবে সেটাকে প্রাণপণে বিলুপ্ত করা আমাদের সক-

লের একান্ত কর্ত্তব্য। এই অসীম বৈরাগ্যতত্ত্ব আমাদের হিন্দু-সমাজের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে একথা সত্য; তাহার ফল হইয়াছে আমাদের এ কূল ও কূল দুই গেছে। প্রত্যেকে এক একটি সোঽহং ব্রহ্ম হইতেও পারি নাই অথচ মনুষ্যত্ব একেবারে নির্জ্জীব হইয়া আছে। মরণও হয় না, অথচ ষোল আনা বাঁচিয়াও নাই। প্রকৃতিনিহিত প্রীতিবৃত্তিকে দর্শনশাস্ত্রের বিরাট পাষাণ একেবারে পিষিয়া ফেলিতে পারে নাই অথচ তাহার কাজ করিবার বল ও উৎসাহ যথাসম্ভব অপহরণ করা হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে এরূপ বিরাট নাস্তিকতা মহামারীর মত সমস্ত বৃহৎ জাতিকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিতে পারে না। সেই জন্য আমাদের দেশে মুখেমুখে বৈরাগ্যের কথা প্রচলিত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মানুষের প্রতি, সংসারের প্রতি, সৌন্দর্য্যের প্রতি নিগূঢ় অনুরাগ চিরানন্দস্রোতে মনুষ্যত্বকে যথাসাধ্য সতেজ ও সফল করিয়া অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হইতেছে। বিরাট নিপীড়নে সেই প্রেমানন্দকে পরাহত করিতে পারে নাই বলিয়াই চৈতন্য আসিয়া যেমনি প্রেমের তান ধরিলেন অমনি "বিরাট" হিন্দুর "বিরাট" হৃদয়ের কঠোর পাষাণ ভেদ করিয়া প্রেমের স্রোত আনন্দধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আবার কি সেই বিরাট পাষাণখানাকে তিল তিল করিয়া গড়াইয়া জগতের অনন্ত জীবন-উৎসের মুখদ্বারে তুলিয়া বিরাট হিন্দুর বিরাট জাতীয়তা রক্ষা করিতে হইবে? কিন্তু হে বিরাট বিরাগী সম্প্রদায়, এ স্রোত তোমাদের দর্শন-শাস্ত্রের সাধ্য নহে রুদ্ধ করা; যদি বা কিছুকালের মত কিয়ৎপরিমাণে প্রতিহত থাকে আবার একদিন চতুর্গুণ বলে সমস্ত বাধা বিদীর্ণ করিয়া শাস্ত্রদগ্ধ শুষ্ক শূন্য বিরাট বৈরাগ্যমরুকে প্রাণ-স্রোতে প্লাবিত করিয়া কোমল করিয়া শ্যামল করিয়া সুন্দর করিয়া তুলিবে।

আমাদের আর একটি কথা বলিবার আছে। আজকাল আমরা যখন স্বজাতির গুণগরিমা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা অন্যজাতিকে খাট করিয়া আপনাদিগকে বড় করিতে চেষ্টা করি। তাহার একটা উপায়, স্বদেশে যে মহোচ্চ আদর্শ কেবল শাস্ত্রেই আছে সাধারণের মধ্যে নাই তাহার সহিত অন্য দেশের সাধারণ-প্রচলিত জীবনযাত্রার তুলনা করা। দুঃখের বিষয়, চন্দ্রনাথ বাবুর লেখাতেও সেই অন্যায় অনুদারতা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিতে চান হিন্দুরা কেবল ব্রহ্মত্ব লাভের জন্যেই নিযুক্ত, আর য়ুরোপীয়েরা কেবল আত্মসুখের জন্যই লালায়িত। তিনি এক-দিকে বিষ্ণুপুরাণ হইতে প্রহ্লাদচরিত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, অন্য-দিকে য়ুরোপীয়দের কথায় বলিয়াছেন "ক্ষুধায় অন্ন এক মুঠা কম পাইলে, তৃষ্ণায় জল এক গণ্ডূষ কম পাইলে, শীতে একখানি কম্বল কম হইলে, চায়ের বাটিতে এক ফোঁটা চিনির অভাব হইলে, স্নান করিয়া একখানি বুরুশ না পাইলে, বেশবিন্যাসে একটি আল্‌পিন্‌ কম হইলে তাহারা কাঁদিয়া রাগিয়া চেঁচাইয়া মহাপ্রলয় করিয়া তোলে।"

চন্দ্রনাথ বাবু যদি স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখেন ত দেখিতে পাইবেন, আমাদের দেশেও আদর্শের সহিত আচরণের অনেক প্রভেদ। নির্গুণ ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া যদি আমাদের আদর্শ হয় তবে ব্যবহারে তাহার অনেক বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। এত দেব এত দেবী এত কাষ্ঠ এত পাষাণ এত কাহিনী এত কল্প-নার দ্বারা ব্রহ্মের উচ্চ আদর্শ কোন্‌ দেশে আচ্ছন্ন করিয়াছে! আমাদের দেশের নরনারীগণ কি প্রতিদিন মৃন্মূর্ত্তির নিকট ধন পুত্র প্রভৃতি ঐহিক সুখসম্পত্তি প্রার্থনা করিতেছে না? মিথ্যা মকদ্দমায় জয়লাভ করিবার জন্য তাহারা দেবীকে কি বলির

প্রলোভন দেখাইতেছে না? নিরপরাধী বিপক্ষকে বিনাশ করিবার জন্য তাহারা কি দেবতাকে নিজপক্ষ অবলম্বন করিতে স্তুতিবাক্যে অনুরোধ করিতেছে না? তাহারা কি নিজের স্বাস্থ্যের জন্য স্বস্ত্যয়ন ও প্রতিযোগীর ধ্বংশের জন্য হোমযাগ করে না? রাগদ্বেষ হিংসা মিথ্যাব্যবহার এবং বিবিধ কলঙ্কমসি দ্বারা তাহারা কি আপনাদের দেবচরিত্র অঙ্কিত করে নাই? শাস্ত্রের মধ্যে নিরঞ্জন ব্রহ্ম এবং মন্দিরের মধ্যে বিকৃত কল্পনা এমন আর কোথায় আছে!

অতএব তুলনার স্থলে আমাদের দেশের আদর্শের সহিত য়ুরোপের আদর্শের তুলনাই ন্যায়সঙ্গত।

য়ুরোপায় সভ্যতার আদর্শ আত্মসুখ নহে, বিশ্বসুখ। মনুষ্যত্বের চরম পরিণতি সাধনই তাহার সাধনার বিষয়। জ্ঞান এবং প্রেম, "মাধুর্য্য এবং জ্যোতি" সমস্ত মানব-সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া তাহার উদ্দেশ্য। তাহাদের কবি সেই গান গাহিতেছে, তাহাদের মহাপুরুষ ও মহানারীগণ সেই উদ্দেশ্যে দেশদেশান্তরে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে। আবার এদিকে সাধারণের মধ্যে আত্মসুখান্বেষণও বড় কম নহে; এদিকে পরের ধনে লোভ দিতে, পরের অন্ন কাড়িয়া খাইতে, পরের সুখ ছারখার করিতে ইহারা সকল সময়ে বিমুখ নহে। এবং এক দিকে ইহারা হিংস্র বিদেশের মরুনির্ব্বাসনে একাকী ধর্ম্মপ্রচার করিতে ও তুষার-কঠিন দুর্গম উত্তর মেরুর নিষ্ঠুর শীতের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না অন্য দিকে স্নানের পর বুরুশ না পাইলে এবং বেশবিন্যাসে আল্‌পিন্‌টি কম হইলে বাস্তবিক অস্থির হইয়া পড়ে। মানুষ এম্‌নি মিশ্রিত, এম্‌নি অদ্ভুত অসম্পূর্ণ জীব।

সর্ব্বশেষে পাঠকদিগকে একটি কথা বলিয়া রাখি। আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার যে আদর্শভাব উপরে উল্লেখ করিয়াছি বঙ্কিম বাবু তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিয়াছেন আমাদের হিন্দুধর্ম্মেরও সেই আদর্শ—অর্থাৎ, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশসাধন। চন্দ্রনাথ বাবুর মতে হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ মনুষ্যত্বের পূর্ণ ধ্বংশসাধন। তিনি বলেন হিন্দুধর্ম্মের মূল মন্ত্র প্রলয়। এখন হিন্দুগণ বঙ্কিম বাবুর মতে বাঁচিবেন কি চন্দ্রনাথ বাবুর মতে মরিবেন সেই একটা সমস্যা উঠিতে পারে। আমরা এ বিষয়ে একটা মত স্থির করিয়াছি। আমরা জীবনের প্রয়াসী, এবং ভরসা করি, লয় ব্যাপারটা যতই "বিরাট" হৌক তাহার এখনো বিস্তর বিলম্ব আছে।

সাধনায় আমরা "শিক্ষিতা নারী" নামক প্রবন্ধের যে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলাম বর্ত্তমান সংখ্যায় তাহার উত্তর বাহির হইয়াছে। লেখিকা বলিয়াছেন আমরা তাঁহার প্রবন্ধের মর্ম্ম ভূল বুঝিয়াছিলাম। ভূল বুঝিবার কিঞ্চিৎ কারণ ছিল। তিনি আমেরিকার স্ত্রী-অ্যাটর্নি, স্ত্রী-বক্তা প্রভৃতি প্রবলা রমণীদের কথা এমন ভাবে লিখিয়াছিলেন যাহাতে সহজেই মনে হইতে পারে যে, তিনি উক্ত ধনোপার্জ্জনকারিণীদিগকে প্রধানতঃ শিক্ষিতা নারীর আদর্শস্থলরূপে খাড়া করিতে চাহেন। তাঁহার যদি এরূপ উদ্দেশ্য না থাকে তবে আমাদের সহিত তাঁহার মতান্তর দেখি না। কেবল এখনও তিনি "নারীজাতির অবরোধ ও অশিক্ষিত জীবনের মূলে যে পুরুষের স্বার্থপরতা বা উৎপীড়ন" এ অভিযোগ ছাড়েন নাই। লেখিকা ভাবিয়া দেখিবেন "মূল" বলিতে অনেকটা দূর বুঝায়। যদি আমরা বাঙ্গালীরা বলি ইংরাজের স্বার্থপরতাই বাঙ্গালীর জাতীয় অধীনতার মূল তাহা হইলে তাহাতে দুর্ব্বল প্রকৃতির বিবেচনাশূন্য কাঁদুনি প্রকাশ পায় মাত্র। ইংরাজ আপন স্বার্থপর প্রবৃত্তি আমাদের উপর খাটাইতেই পারিত না যদি আমরা গোড়ায় দুর্ব্বল না হইতাম। অতএব স্বার্থপরতাকে মূল না বলিয়া দুর্ব্বলতাকেই মূল বলিয়া ধরা আবশ্যক। সকলপ্রকার অধীনতারই মূলে দুর্ব্বলতা। লেখিকা বলিতে পারেন, যে, এই সুসভ্য উনবিংশ

শতাব্দীতে শারীরিক দুর্ব্বলতাকে দুর্ব্বলতা বলাই উচিত হয় না। কিন্তু বুদ্ধিচর্চ্চা এবং জ্ঞানোপার্জ্জনও বলসাধ্য। দুই জন লোকের যদি সমান বুদ্ধি থাকে এবং তাহাদের মধ্যে এক-জনের শারীরিক বল অধিক থাকে তবে বলিষ্ঠ ব্যক্তি বুদ্ধি-সংগ্রামেও অন্যটিকে পরাভূত করিবে, শরীর ও মনের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। তবে যদি প্রমাণ হয় স্ত্রীলোকের বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশি তবে কথাটা স্বতন্ত্র হয়। যাহা হউক্, প্রকৃতির পক্ষপাতের জন্য পুরুষকে অপ-রাধী করা উচিত হয় না। কারণ, পুরুষের পাপের বোঝা যথেষ্ট ভারি আছে। যেখানে ক্ষমতা সেখানে প্রায়ই ন্যূনাধিক অত্যাচার আছেই। ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ সংযত করিয়া চলা সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রত্যাশা করা যায় না; সেই কারণে, রমণীর প্রতি পুরুষের উপদ্রবের অপরাধ পর্ব্বত-প্রমাণ স্তূপা-কার হইয়া উঠিয়াছে; তাহার উপরে আবার একটা "ওরি-জিনাল্ সিন্" একটা মূল পাপ পুরুষের স্কন্ধে চাপান নিতান্ত অন্যায়। সেটা পুরুষের নহে প্রকৃতির। রমণীর কাছে পুরুষেরা সহস্র প্রেমের অপরাধে চির অপরাধী সে জন্য তাঁহারা সুমধুর অভিমানে আমাদিগকে দণ্ডিত করেন, সে সকল আইন ঘরে ঘরে প্রচলিত; এমন কি তাহার দণ্ডবিধি বঙ্গ সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আজ কাল নারীরা পুরুষের নামে এ কি এক নূতন অভিযোগ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন এবং আমাদিগকে নীরস ও নিষ্ঠুরভাবে ভর্ৎসনা করিতেছেন। এরূপ অশ্রুজলশূন্য শুষ্ক শাসনের জন্য আমরা কোন কালে প্রস্তুত ছিলাম না; এটা আমা-দের কাছে নিতান্ত বেআইনি রকম ঠেকিতেছে।—রমণী সৌন্দর্য্যে পুরুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (কেবল শারীরিক সৌন্দর্য্যে নহে)। দুর্ভাগ্যক্রমে মানবসমাজে সৌন্দর্য্যবোধ অনেক বিলম্বে পরি-ণতি লাভ করে। কিন্তু অনাদৃত সৌন্দর্য্যও প্রেমপরিপূর্ণ ধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতে জানে; অন্ধবল তাহার সম্মুখে দম্ভ প্রকাশ করে বলিয়া বলের প্রতি তাহার কোন ঈর্ষা নাই; সে সেই খেদে বলিষ্ঠ হইয়া বলকে অতিক্রম করিতে

চায় না, সুন্দর হইয়া অতি ধীরে ধীরে জয়লাভ করে। যিশু খৃষ্ট যেরূপ মৃত্যুর দ্বারা অমর হইয়াছেন সৌন্দর্য্য সেইরূপ উৎ-পীড়িত হইয়াই জয়ী হয়। অধৈর্য্য হইবার আবশ্যক নাই; নারীর আদর কালক্রমে আপনি বাড়িবে, সে জন্য নারী-দিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে না; বরঞ্চ আরো অধিক সুন্দর হইতে হইবে। রাবণের ঘরে সীতা অপমানিতা সেখানে কেবল পশুবল, সেখানে সীতা বন্দিনী। রামের ঘরে সীতা সম্মানিতা; সেখানে বলের সহিত ধর্ম্মের মিলন, সেখানে সীতা স্বাধীনা। ধৈর্য্যকঠিন প্রেমকোমল সৌন্দর্য্যের অলক্ষ্য প্রভাবে মনুষ্যত্ব বিকশিত হইতে থাকিবে এবং সেই মনুষ্যত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ পৌরুষ যখন পরিণত হইয়া উঠিবে, তখন এই উদারহৃদয় পৌরুষই অনাদরের হাত হইতে সৌন্দর্য্যকে উদ্ধার করিবে; এ জন্য নারীদিগকে লড়াই করিতে হইবে না।

সমালোচ্য প্রবন্ধের দুই একটা বাঙ্গলা কথা আমাদের কানে নিরতিশয় বিলাতী রকম ঠেকিয়াছে এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, মাননীয়া লেখিকা মার্জ্জনা করিবেন। "কর্ষিত বিচারশক্তি" "মানসিক কর্ষণ" শব্দগুলা বাঙ্গলা নহে। একস্থানে আছে "সংসারে যে গুরুতর কর্ত্তব্য তাহার উপর অর্পিত হয়, তজ্জন্য, সমভাবময় হৃদয়ের ন্যায়, কর্ষিত মস্তকেরও একান্ত আবশ্যক। "সমভাবময় হৃদয়" কোন্ ইংরাজি শব্দের তর্জ্জমা ঠাহর করিতে পারিলাম না সুতরাং উহার অর্থ নির্ণয় করিতে অক্ষম হইলাম; "কর্ষিত মস্তক" কথাটার ইংরাজি মনে পড়িতেছে কিন্তু বাঙ্গালাভাষার পক্ষে এ শব্দটা একেবারে গুরুপাক।

"সোম" নামক প্রবন্ধে বৈদিক সোমরস যে সুরা অর্থেই ব্যবহৃত হইত না লেখক তাহাই প্রমাণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। "সোম" বলিতে কি বুঝাইত ভবিষ্যৎসংখ্যক সাহিত্যে তাহার আলোচনা হইবে লেখক আশ্বাস দিয়াছেন। আমরা ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

"রায় মহাশয়" গল্পে বাঙ্গলার জমিদারী শাসনের

নিষ্ঠুর চিত্র বাহির হইতেছে। ক্ষমতাশালী লেখকের রচনা পড়িয়া সমস্তটা অত্যন্ত সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়; আশা করি, ইহার মধ্যে কিছু কিছু অত্যুক্তি আছে।

প্রাপ্ত গ্রন্থ।

লালা গোলোকচাঁদ। পারিবারিক নাটক। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু।—নাটকটি অসম্ভব আতিশয্যে পরিপূর্ণ। সমস্তটা একটা সামাজিক ভেঙ্কীর মত। কতকগুলি অদ্ভুত ভাল লোক এবং অদ্ভুত মন্দ লোক একটা অদ্ভুত সমাজে যথেচ্ছা অদ্ভুত কাজ করিয়া যাইতেছে, মাথার উপরে একটা বুদ্ধিমান অভিভাবক কেহ নাই। স্থানে স্থানে লেখকের পারিবারিক চিত্ররচনার ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। তীর্থযাত্রাকালে বৃদ্ধ কর্ত্তা গিন্নির গৃহত্যাগের দৃশ্য গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ।

দেহাত্মিক-তত্ত্ব। ডাক্তার সাহা প্রণীত।

এই গ্রন্থে শ্রীদর্শন রাজ চক্রবর্ত্তী নামক একব্যক্তি গুরুর আসনে উপবিষ্ট। ভোলানাথ দাস নামক এক ব্যক্তি তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য। উভয়ের মধ্যে কথোপকথন চলিতেছে। গুরুজি রূপক-চ্ছলে জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ দিতেছেন—শিষ্য সেই উপদেশ শুনিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। দেহ-মন ও জগতের শক্তি সকলকে দেব দেবী রূপে কল্পনা করিয়া জগৎ-ব্রহ্মবাদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "যোগাকর্ষণ-দেব" "মাধ্যাকর্ষণ-দেব," "রসায়ন-দেব" "মস্তিষ্কা-দেবী" প্রভৃতি দেব-দেবীর অবতারণা করা হইয়াছে। গ্রন্থের সার মর্ম্ম এই যে, ব্রহ্ম কতকটা দৈহিকভাবে ও কতকটা আত্মিক ভাবে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। এবং সকল ধর্ম্মের মধ্যেই কতকটা দৈহিক ও কতকটা আত্মিক ভাব বিদ্যমান। উপদেশের কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

"বলি, মস্তিষ্কা দেবি! আপনার কয়টি পুত্র ও কয়টি কন্যা, আমায় বলিবেন কি?"

"ভোলানাথ! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ প্রশ্ন করিতেছ? তোমার সাধ্য নয় যে, তুমি এ সকল বুঝিতে পার। এই দেখ, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা, ইহার নাম স্পর্শ সত্তা বা ত্বক্, এই আমার দ্বিতীয় কন্যা, রসনা। এই আমার প্রথম পুত্র নয়ন, দ্বিতীয় পুত্র শ্রবণ, এই আমার তৃতীয় কন্যা নাসিকা" ইত্যাদি। গ্রন্থের "ঐহিক ভাবটি" অতি পরিপাটী। গ্রন্থের আত্মিক ভাব বুঝিবার জন্য ভোলানাথের ন্যায় সমজদার ব্যক্তির আবশ্যক। যাহা হউক, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝিতে পারি, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে "মস্তিষ্কা দেবী"কে বিবিধ শৈত্য-উপচারে ঠাণ্ডা রাখা কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন।

১। বৃক্ষ গুল্মাদির পত্রে ও শাখায়, শ্বেত বর্ণ, থুথুর ন্যায় এক পদার্থ দৃষ্ট হয়—লোকে ইহাকে "ব্যাঙের থুথু" বলে। এ পদার্থটা কি? ভেকের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া বোধ হয় না—বৃক্ষাদির অত্যুচ্চ শাখার পত্রে, যেখানে ভেকসমাগমের কোন সম্ভাবনা নাই, সেখানেও এই পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী।
কৃষ্ণনগর।

২। মহাশয়, একজনকে হাই তুলিতে দেখিলে আর একজন প্রায়ই হাই তুলে কেন? আর হাই তুলিবার সময় তিনবার টুসী দিবার অর্থ কি?

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।
হাজিপুর।

৩। হিন্দুশাস্ত্র কখনও পড়ি নাই সুতরাং হিন্দুবিবাহের আধ্যাত্মিকতা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই, তবে শুনিতে পাই হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে, স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ, উভয়ের আত্মা এক, শরীর দুইটি মাত্র, পার্থিব শরীর ধ্বংসের পর মুক্তাত্মা যুক্ত হইয়া যায়, কিন্তু ইহাও শুনিতে পাই পূর্ব্বে পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মের কুলপাবন পুত্রগণ সময়ে সময়ে শতাধিক বিবাহ করিতেও আপত্তি করিতেন না, এখন জিজ্ঞাস্য—মৃত্যুর পর তাঁহাদের আত্মা না হয় তাঁহাদের প্রথমা স্ত্রীর আত্মার সহিত মিলিয়া 'একত্বে' পরিণত হইল, কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীর আত্মার কি

গতি হয়? স্বামী ও প্রথম স্ত্রী একাত্মা হইয়া গেলেন, অন্যান্য স্ত্রী-আত্মা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর ন্যায় কি সেই যুক্তাত্মার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকিবে? অথবা অন্য কোন অবস্থান্তর ঘটিবে? আমরা একজন শাস্ত্রপ্রকাশককে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি যাহা বলেন তাহাতে কিন্তু বড়ই নিরুৎসাহ হইতে হয়। তিনি প্রশান্ত মনে থপ্ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন "শাস্ত্র পড় সকলই জানিতে পারিবে।" কিন্তু তাঁহার পরামর্শমত কাজ করিতে গেলে আমাদের এই ক্ষুদ্র পরমায়ুতে আশাপূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, সেই জন্য আপনাদের নিকট আসিয়াছি ভরসা করি একটি সদুত্তর পাইব।

শ্রী দীনেন্দ্রকুমার রায়।
মহিষাদল।

৪। বাল্মীকির রামায়ণের টীকাকার রামানুজ ও বৈষ্ণবসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক রামানুজ এক ব্যক্তি কি না? "প্রপন্নামৃত" নামক গ্রন্থানুসারে রামানুজ ৯৩৯ শকাব্দে প্রাদুর্ভূত হন। এবং স্মৃতিকালতরঙ্গ মতে রামানুজের আবির্ভাব-কাল ১০৪৯ শকাব্দ। উক্ত রামানুজদ্বয় যদি এক ব্যক্তি না হন, তবে তাঁহাদের মধ্যে কোন্ রামানুজ রামায়ণের টীকাকার ও তিনি কোন সময়ের লোক? পুরা-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।
দেওঘর।

উত্তর।

১। পাঠিক উক্ত শ্বেত ফেনের ন্যায় পদার্থ দেখিলে যদি ধীরে ধীরে যত্নসহকারে উহা সরাইয়া ফেলেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে উহা এক প্রকার কীটের আবরণ। নিজ শরীর হইতে নির্গত এই ফেনরাশির মধ্যে বাস করিয়া উক্ত কীট রৌদ্রের তাপ এবং শত্রুর উপদ্রব দুই হইতেই অব্যাহতি পায়, এবং নিশ্চিন্তমনে পত্র হইতে রস শোষণ পূর্ব্বক প্রাণধারণ করিতে পারে। পাঠিকার বোধ করি অবিদিত নাই যে এই রূপ গুটিপোকাজাতীয় কীটের জীবনের চারিটি স্বতন্ত্র অবস্থা লক্ষিত হয়। ১। ডিম্বাবস্থা। ২। গুটি-পোকার ন্যায় পা-বিশিষ্ট লম্বাকৃতি কিল্‌বিলে অবস্থা। ৩। কোন প্রকার আবরণের মধ্যে থাকিয়া পরিবর্ত্তনের অবস্থা। ৪। প্রজাপতির ন্যায় পক্ষ-বিশিষ্ট অবস্থা। এই কীটের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থা ফেনের মধ্যে কাটিয়া যায়। কিয়ৎকালান্তে, ইহার পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে পর, ক্ষুদ্র ফড়িঙের আকার ধারণ করিয়া লাফাইয়া এবং উড়িয়া বেড়াইতে থাকে। বলা বাহুল্য

যে, এই অবস্থায় উক্ত ফেন দেখিতে গেলে তাহার মধ্যে কোন কীট দৃষ্ট হইবে না। ভেকের সহিত যে, ইহার কোন সম্বন্ধ নাই তাহা পাঠিকা ঠিকই অনুমান করিয়াছেন। বোধ করি ভেক এবং এই থুথুর ন্যায় পদার্থ উভয়ই ঘৃণার পাত্র বলিয়া উহাদের এইরূপ সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়াছে। আমাদের দেশের লোকেরা কি না কোন দুই বস্তুতে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ফস্ করিয়া স্থির করিয়া ফেলিতে ভালবাসে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইংরাজিতেও উহাকে সাধারণতঃ toad spit (ভেকের থুথু) বলিয়া থাকে।

সম্পাদক।

২। একজনকে হাই তুলিতে দেখিলে আর একজন যে প্রায়ই হাই তুলিয়া থাকে, ইহা ঠিক নহে। আমাদের কতকগুলি অবস্থা আছে যাহা অন্যের সেইরূপ অবস্থা দেখিলে সহসা অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে—যেমন দুঃখের অবস্থায় একজনকে কাঁদিতে দেখিলে কান্না আসে, কাশির অবস্থায় একজনকে কাশিতে দেখিলে কাশি পায়। হাই তোলাও সেইরূপ। আলস্যের অবস্থায় একজনকে হাই তুলিতে দেখিলে স্বভাবতই হাই উঠে। এই রূপ কেন হয় তাহা বলা বড় কঠিন। ইহা সংক্রামক রোগের মত এবং অনেকটা তৎকালীন অবস্থার উপর নির্ভর করে। ইংরাজিতে ইহাকে sympathetic বলে।

হাঁ করিয়া হাই তুলিতে গিয়া অনেকে আর মুখ বন্ধ করিতে পারে না। এই নিমিত্ত সাবধান করিবার জন্য বোধ হয় তিনবার টুসী দিবার নিয়ম আছে।

সম্পাদক।

গত সংখ্যক সাধনায় প্রকাশিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর :—

"চেদীরাজ" অর্থ "শিশুপাল" নহে। চেদীরাজ ভবাদি অষ্টবসুর অন্যতম নাম। চেদীরাজের পূজা হিন্দুশাস্ত্র মতে বিবাহাদি সংস্কারের একটী প্রধান অঙ্গ।

"নিছনি" শব্দের অর্থ "অনিচ্ছা"।

শ্রীজগদানন্দ রায়।
কৃষ্ণনগর।

তৃতীয় সংখ্যা সাধনায় 'পাঠক' মহাশয় লিখিয়াছেন যে তিনি শুনিয়াছেন রন্ধনকালে আদা কাঁচকলা সংযোগে গলে না এবং এই তত্ত্বের মীমাংসা কোন রন্ধন-নিপুণা পাঠিকার দ্বারা সম্পন্ন হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন; আমাদের বিবেচনায় এই ভারটি কোন উদরপরায়ণ পাঠক মহাশয়ের উপরও নিঃশঙ্কচিত্তে নিক্ষেপ করিতে পারা যায়, যেহেতু, রন্ধনের সহিত আহারের সম্বন্ধ অতি নিকট। আমাদের একজন ভোজন-পটু বন্ধু বলেন যে 'পাঠক' মহাশয়ের শ্রুত সংবাদটি সত্য, এজন্য রন্ধন-নিপুণা কোন পাঠিকার মতামতের অপেক্ষা নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয় সংখ্যা সাধনায় প্রকাশিত প্রথম প্রশ্নের যে উত্তর উলা হইতে

পাওয়া গিয়াছে তাহা সন্তোষজনক নহে। আমরা দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রের মধ্যে বাস করিয়া থাকি—আমাদের চতুর্দ্দিকেই শস্যক্ষেত্র, আমরা দেখিয়াছি ধান গম যব প্রভৃতি শস্যের শীষ পরিপক্ব অবস্থায় বাস্তবিকই স্বভাবতঃ উত্তর-দিকে হেলিয়া থাকে, উত্তরদাতা ও তাঁহার কৃষকদিগের লব্ধ পরীক্ষাফল বিশেষ অভিনিবেশপ্রসূত নহে; উত্তরদাতা বলেন "শস্য পরিপক্ব হইলে যেদিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহার বিপরীত দিকেই শীষগুলি হেলিয়া থাকে;" তাহাত থাকিবেই। বাতাস যদি আরও জোরে বহে ত শীষগুলি 'হেলানর' চরমোৎকর্ষ লাভ করে অর্থাৎ ভূমিসাৎ হয়, কিন্তু বাতাস বহিয়া শীষগুলি হেলিয়া পড়িবার পূর্ব্বে তাহারা কোন অবস্থায় থাকে তাহাই জ্ঞাতব্য বিষয়। আমাদের অভিজ্ঞতা নিম্নে প্রকাশ করিলাম—

যতদিন পর্য্যন্ত শস্যের শীষে দুগ্ধ সমাবেশ না হয়, ততদিন, শীষগুলি ঠিক সোজা থাকে, এমন কি অর্দ্ধপরিপক্ব অবস্থাতেও সামান্য বাতাসে তাহারা কোন দিকে হেলিয়া পড়ে না, ক্রমে শীষগুলি যত পাকিয়া উঠে তত-তাহারা উত্তর দিকে একটু ঢলিয়া পড়ে, কিন্তু তা এত অল্প যে বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিলেই তাহা ধরিতে পারা যায়। এই অবস্থার পর যদি একটু বাতাস বহে তবে শীষগুলি আর সে ভাবে থাকিতে পারে না; বায়ুর বিভিন্ন গতিতে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দিকে ঢলিয়া পড়ে। উলার উত্তরদাতা বোধ হয় এই শেষ অবস্থা দেখিয়া আপনাদের লিখিয়া থাকিবেন।

কিন্তু এই উত্তরাভিমুখের ব্যাখ্যা দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। তবে আমরা আজকাল কথায় কথায় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া বসি, বিজ্ঞান জ্ঞান থাক বা না থাক (অধিকাংশ স্থলে না থাকাতেই) হাঁচি টিকটিকি হইতে নারদের ঢেঁকি পর্য্যন্ত সকল অন্ধবৎ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়া তাহাদিগকে অভূত-পূর্ব্ব লোমাঞ্চকর ও আর্য্যোচিত করিয়া তুলি—আমরা আশ্চর্য্য হই সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদিগকেও আশ্চর্য্য করি; সুতরাং আমার বিবেচনা হয় এই তত্ত্বের মধ্যে কিছু বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে এবং তাহা ইলেক্‌ট্রিসিটি ঘটিত। ইলেক্‌ট্রিসিটি-করেণ্ট যাহা প্রতিনিয়ত উত্তর কেন্দ্রাভিমুখে চালিত হইতেছে তাহারই বলে ধান্যাদির শীষে এ পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে কিনা, তাহা বিজ্ঞানবিদ্ মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

শ্রী দীনেন্দ্রকুমার রায়।
মহিষাদল।

নূতন ডল্‌সেটিনা (হারমোনিয়ম)।

নগদ মূল্য ৬৫৲ হইতে ৭৫৲।

প্যারিস প্রদর্শনীতে সর্ব্বোচ্চ স্বর্ণমেডেলধারী বিখ্যাত ফরাসী-দেশীয় হারমোনিয়ম আবিষ্কারক রডল্‌ফিল্‌স্ এণ্ড ডিবেন কর্ত্তৃক সলিড্ এবনাইজ্‌ড্ কাষ্ঠে প্রস্তুত। হাপর ভিতরে থাকাতে ঠাণ্ডা লাগে না পোকায় কাটে না। তিন গ্রাম, পাঁচ ষ্টপ্, দুই সেট্ রীড্ আছে। চাবিগুলি গজদন্তনির্ম্মিত ও চওড়া। স্বর প্রবল সুমিষ্ট ও দেশীয় সঙ্গীতোপযোগী। মজবুত বাক্সসমেত ওজনে ১২ সের, পরিমাণে ২৫ × ১৪ × ৮ ইঞ্চি। টেবিল ও বাক্স উভয় হারমোনিয়মই হয়। শিখিবার একখানি পুস্তকও দেওয়া হয়। দুই বৎসরের গ্যারাণ্টি।

চ্যালেঞ্জ মিউজিক্যাল বক্স বা আর্গিন যন্ত্র।

প্রত্যেকের নগদ মূল্য ৭৫৲।

বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী রাগরাগিণীযুক্ত এরূপ প্রবল ও সুমধুর স্বরবিশিষ্ট যন্ত্র এদেশে কখনও আসে নাই। ইহার কল অতিশয় মজবুত এবং দুইটি স্প্রিং থাকাতে একবার চাবি দিলে কুড়ি মিনিট বাজে। মাপ ১৮ × ১০ × ৭ ইঞ্চি।

১ নং	২ নং	৩ নং	৪ নং
১ বিদ্যাসুন্দর	১ কাফি সিন্ধু	১ ভৈরবী	১ সিন্ধু ভৈরবী
২ সারঙ্গ	২ গৌড় সারঙ্গ	২ বারোঁয়া	২ সিন্দুড়া
৩ দেশ	৩ পিলু জংলা	৩ কালাংড়া	৩ জয়জয়ন্তী
৪ ধানশ্রী পুরবী	৪ সোহিনী বাহার	৪ খাম্বাজ	৪ মূলতান
৫ আড়ানা বাহার	৫ বাউলের সুর	৫ বেহাগ	৫ ভূপালী
৬ ঝিঁঝিট	৬ বাগেশ্রী	৬ ঝিঁঝিট	৬ রামপ্রসাদী

ভারতবর্ষে একমাত্র এজেণ্ট ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্।

লালবাজার পুলিষ আদালতের পূর্ব্ব, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

রাজা ও রাণী	(নাটক)	এক টাকা
বিসর্জ্জন	(নাটক)	এক টাকা।
রাজর্ষি	(উপন্যাস)	পাঁচ সিকা।
মানসী	(কবিতা)	দুই টাকা।
য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী	(ভূমিকা)	আট আনা।

উক্ত গ্রন্থকারের নিম্নলিখিত গ্রন্থ কলেজ ষ্ট্রীট্ পীপ্‌ল্ লাই-ব্রেরীতে পাওয়া যায়।

কড়ি ও কোমল	(কবিতা)	এক টাকা।
সমালোচনা		এক টাকা।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

আর্য্যামি এবং সাহেবিয়ানা	দুই আনা।
সোনার কাটি ও রূপার কাটি	দুই আনা।
সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা	দুই আনা।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

সরোজিনী নাটক (পঞ্চম সংস্করণ)	এক টাকা।

সাধনা।

সন্ধ্যার পথিক।

চারিদিকে চেয়ে দেখি
ধূধূ করে মাঠ ;
ঘরে যায় বনের পাখী
নিয়ে কুটকাট।

ডুবে যায় লাল রবি
আকাশের গায় ;
দূরেতে গ্রামের ছবি
মিলে কিবা যায় !

পথিক চলেছে মাঠে
ধীরে ধীরে যায় ;
দু'একটি তারা ফোটে
তার পানে চায়।

চারিদিকে নীলাকাশ
গাছপালা নাই ;
দূরে ওড়ে বালহাঁস
দূরে চরে গাই।

জোনাকিরা এলো জেগে
মাঠের হাওয়ায় ;
একটুকু রঙ লেগে
মেঘের ছায়ায়।

জগতের খেলা যত
ফুরাইল রাতে ;
চন্দ্র তারা মিলে কত
খেলে শূন্য ছাতে।

বিজন এ মাঠ দিয়ে
একা যায় পারে ;
কোথায় যায় কেন যায়
কে বলিতে পারে ?

কাব্য।

আজকাল যাঁহারা সমালোচনা করিতে বসেন তাঁহারা কাব্য হইতে একটা কিছু নূতন কথা বাহির করিতে চেষ্টা করেন। কবির ভাবের সহিত আপনার মনকে মিশাইবার চেষ্টা না করিয়া কোমর বাঁধিয়া থানাতল্লাসী করিতে উদ্যত হন। অনেক বাজে জিনিষ হাতে ঠেকে কিন্তু অনেক সময়েই আসল জিনিষটা পাওয়া যায় না।

কিন্তু তর্কই তাই। কে কোন্‌টাকে আসল জিনিষ মনে করে। একটা প্রস্তরমূর্ত্তির মধ্যে কেহ বা প্রস্তরটাকে আসল জিনিষ মনে

করিতে পারে কেহ বা মূর্ত্তিটাকে। সে স্থলে মীমাংসা করিতে হইলে বলিতে হয়, প্রস্তর তুমি নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে পার, তাহার জন্য মূর্ত্তি ভাঙ্গিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু এ মূর্ত্তি আর কোথাও মিলিবে না। তেমনি কবিতা হইতে তত্ত্ব বাহির না করিয়া যাহারা সন্তুষ্ট না হয় তাহাদিগকে বলা যাইতে পারে তত্ত্ব তুমি দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে পার কিন্তু কাব্যরসই কবিতার বিশেষত্ব।

এই কাব্যরস কি তাহা বলা শক্ত। কারণ তাহা তত্ত্বের ন্যায় প্রমাণযোগ্য নহে, অনুভবযোগ্য। যাহা প্রমাণ করা যায় তাহা প্রতিপন্ন করা সহজ, কিন্তু যাহা অনুভব করা যায় তাহা অনুভূত করাইবার সহজ পথ নাই। কেবল মাত্র ভাষার সাহায্যে একটা সংবাদ জ্ঞাপন করা যায় মাত্র। কেবল যদি বলা যায় সুখ হইল তবে একটা খবর দেওয়া হয়, সুখ দেওয়া হয় না।

যে সকল কথা সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে অথচ যাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত তাহা লইয়াই মানবের প্রধান ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা পিঞ্জররুদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় যেন সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে চঞ্চলভাবে পক্ষ আন্দোলন করিতেছে। তত্ত্ব-প্রচার করিয়া মানবের সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি নাই, আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য তাহার হৃদয় সর্ব্বদা ব্যগ্র হইয়া আছে। কাব্যের মধ্যে মানবের সেই আত্মপ্রকাশের চেষ্টা কথঞ্চিৎ সফলতা লাভ করে; কাব্যের মর্য্যাদাই তাই। একটি ক্ষুদ্র প্রেমের কবিতার মধ্যে কোন তত্ত্বই নাই কিন্তু চিরকালীন মানবপ্রকৃতির আত্ম-প্রকাশ রহিয়া গেছে। এই জন্য মানব চিরকালই তাহার সমাদর করিবে। ছবি গান কাব্যে মানব ক্রমাগতই আপনার সেই চিরান্ধকারশায়ী আপনাকে গোপনতা হইতে উদ্ধার করিবার

চেষ্টা করিতেছে। এই জন্যই একটা ভাল ছবি, ভাল গান, ভাল কাব্য পাইলে আমরা বাঁচিয়া যাই।

আত্মপ্রকাশের অর্থই এই, আমার কোন্‌টা কেমন লাগে তাহা প্রকাশ করা। কোন্‌টা কি, তাহার দ্বারা বাহিরের বস্তু নিরূপিত হয়, আমার কোন্‌টা কেমন লাগে তাহার দ্বারা আমি নির্দ্দিষ্ট হই। নক্ষত্র যে অগ্নিময় জ্যোতিষ্ক তাহা নক্ষত্রের বিশেষত্ব, কিন্তু নক্ষত্র যে রহস্যময় সুন্দর তাহা আমার আত্মার বিশেষত্ববশতঃ। যখন আমি নক্ষত্রকে জ্যোতিষ্ক বলিয়া জানি তখন নক্ষত্রকেই জানি কিন্তু যখন আমি নক্ষত্রকে সুন্দর বলিয়া জানি তখন নক্ষত্র-লোকের মধ্যে আমার আপনার হৃদয়কেই অনুভব করি।

এইরূপে কাব্যে আমরা আমাদের বিকাশ উপলব্ধি করি। তাহার সহিত নূতন তত্ত্বের কোন যোগ নাই। বাল্মীকি যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বাল্মীকির সময়েও একান্ত পুরাতন ছিল। রামের গুণ বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন ভাল লোককে আমরা ভালবাসি। কেবলমাত্র এই মান্ধাতার আমলের তত্ত্ব-প্রচার করিবার জন্য সাতকাণ্ড রামায়ণ লিখিবার কোন আব-শ্যক ছিল না। কিন্তু ভাল যে কত ভাল, অর্থাৎ ভালকে যে কত ভাল লাগে তাহা সাতকাণ্ড রামায়ণেই প্রকাশ করা যায়, দর্শনে, বিজ্ঞানে কিম্বা সুচতুর সমালোচনায় প্রকাশ করা যায় না।

হে বিষয়ী, হে সুবুদ্ধি, ক্ষুদ্র প্রেমের কবিতা দেখিয়া তুমি যে বিজ্ঞভাবে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছ, বলিতেছ উহার মধ্যে নূতন জ্ঞান কি আছে—তোমাকে অনুরোধ করি, তুমি তোমার সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান লইয়া মানবের এই পুরাতন প্রেমকে এমনি উজ্জ্বল মধুরভাবে ব্যক্ত কর দেখি। যাহা কিছুতে ধরা দিতে চায় না সে মন্ত্রবলে ইহার মধ্যে ধরা দিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিজ্ঞানে দর্শনে আমরা জগৎকে জানি, কাব্যে আমরা আপনাকে জানি। অতএব যদি কোন কবিতায় আমরা কেবল মাত্র এইটুকু জানি যে, ফুল আমরা ভালবাসি, আকাশের তারা আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করে, যে আমার প্রিয়জন সে আমার না-জানি কি; যদি তাহাতে জগতের ক্রম-বিকাশ বা কোন ধর্ম্মমতের ঔৎকর্ষ্য সম্বন্ধে কোন কথা নাও থাকে তথাপি তাহাকে অসম্মান করা যায় না।

যদি বল ইহার উপকার কি? ইহার উপকারও আছে। আমরা যতক্ষণ আপনাকে আপনার মধ্যে বদ্ধ করিয়া দেখি ততক্ষণ আপনাকে পূরা জানি না। যখন সেই অঙ্গনের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় তখনি আপন অধিকারের বিস্তার জানিতে পারি। যখনি একটি ক্ষুদ্র ফুল বাহিরে 'আমাকে টানিয়া লইয়া যায় তখনি আমি অসীমের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হই। আমার প্রিয় মুখ যখন আমাকে আহ্বান করে তখন সে আমাকে আমার ক্ষুদ্রতা হইতে আহ্বান করে;—যতই অধিক ভালবাসি ততই আমার ভালবাসার প্রাবল্যের মধ্যে আপনার বিপুলতা বুঝিতে পারি। প্রেমের মধ্যে সৌন্দর্য্যের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধনমুক্তি হয়।

কিন্তু কাব্যপ্রসঙ্গে উপকারিতার কথা এই জন্য উত্থাপন করা যায় না যে, কাব্যের আনুষঙ্গিক ফল যাহাই হৌক কাব্যের উদ্দেশ্য উপকার করিতে বসা নহে। যাহা সত্য যাহা সুন্দর তাহাতে উপকার হইবারই কথা কিন্তু সেই উপকারিতার পরিমাণের উপর তাহার সত্যতা ও সৌন্দর্য্যের পরিমাণ নির্ভর করে না। সৌন্দর্য্য আমাদের উপকার করে বলিয়া সুন্দর নহে, সুন্দর বলিয়াই উপকার করে। উপকারিতাপ্রসঙ্গে কবিতাকে বিচার করিতে বসিলে সর্ব্বদাই ভ্রমের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়।

কারণ, উপকার নানা উপায়ে হয়;—কবিতার মধ্যে উপকার অন্বেষণ যাহাদের স্বভাব তাহারা কাব্যের মধ্যে যে কোন উপকার পাইলেই চরিতার্থ হয়, বিচার করে না তাহা যথার্থ কাব্যের প্রকৃতিগত কি না। এমন অনেক পাঠক দেখা গিয়াছে যাহারা ছন্দোবন্ধে অদৃষ্টবাদ অথবা অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে কোন কথা পাইলেই আনন্দে ব্যাকুল হইয়া উঠে, মনে করে ইহাতে মানবের পরম উপকার হইতেছে। এবং তাহারা কোন বিশেষ কবিতার সৌন্দর্য্য স্বীকার করিয়াও তাহার উপকারিতার অভাব লইয়া অপ্রসন্নতা প্রকাশ করিয়া থাকে। যেমন ব্যবসায়ী লোক আক্ষেপ করে পৃথিবীর সমস্ত ফুলবাগান তাহার মূলার ক্ষেত হইল না কেন! সে স্বীকার করিবে ফুল সুন্দর বটে কিন্তু কিছুতে বুঝিতে পারিবে না তাহাতে ফল কি আছে।

মুক্তির উপায়।

১

ফকিরচাঁদ বাল্যকাল হইতেই গম্ভীরপ্রকৃতি। বৃদ্ধসমাজে তাহাকে কথনই বেমানান্ দেখাইত না। ঠাণ্ডা জল, হিম, এবং হাস্য পরিহাস তাহার একেবারে সহ্য হইত না। একে গম্ভীর তাহাতে বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই মুখমণ্ডলের চারিদিকে কালো পশমের গলাবন্ধ জড়াইয়া থাকাতে তাহাকে ভয়ঙ্কর উঁচুদরের লোক বলিয়া বোধ হইত। ইহার উপরে, অতি অল্প বয়সেই তাহার ওষ্ঠাধর এবং গণ্ডস্থল প্রচুর গোঁফ দাড়িতে আচ্ছন্ন হওয়াতে সমস্ত মুখের মধ্যে হাস্যবিকাশের স্থান আর তিল মাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

স্ত্রী হৈমবতীর বয়স অল্প এবং তাহার মন পার্থিব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট। সে বঙ্কিম বাবুর নভেল পড়িতে চায় এবং স্বামীকে ঠিক দেবতার ভাবে পূজা করিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না। সে একটুখানি হাসিখুসি ভালবাসে; এবং বিকচোন্মুখ পুষ্প যেমন বায়ুর আন্দোলন এবং প্রভাতের আলোকের জন্য ব্যাকুল হয়, সেও তেমনি এই নব যৌবনের সময় স্বামীর নিকট হইতে আদর এবং হাস্যামোদ যথাপরিমাণে প্রত্যাশা করিয়া থাকে। কিন্তু স্বামী তাহাকে অবসর পাইলেই ভাগবত পড়ায়, সন্ধ্যা-বেলায় ভগবদ্গীতা শুনায়, এবং তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশে মাঝে মাঝে শারীরিক শাসন করিতেও ক্রটি করে না। যে দিন হৈমবতীর বালিশের নীচে হইতে "কৃষ্ণকান্তের উইল" বাহির হয় সে দিন উক্ত লঘুপ্রকৃতি যুবতীকে সমস্ত রাত্রি অশ্রু-পাত করাইয়া তবে ফকির ক্ষান্ত হন। একে নভেল পাঠ তাহাতে আবার পতিদেবকে প্রতারণা! যাহা হউক্ অবি-শ্রাম আদেশ অনুদেশ উপদেশ ধর্ম্মনীতি এবং দণ্ডনীতির দ্বারা অবশেষে হৈমবতীর মুখের হাসি, মনের সুখ এবং যৌবনের আবেগ একেবারে নিষ্কর্ষণ করিয়া ফেলিতে স্বামীদেবতা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু, অনাসক্ত লোকের পক্ষে সংসারে বিস্তর বিঘ্ন। পরে পরে ফকিরের এক ছেলে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার-বন্ধন বাড়িয়া গেল। পিতার তাড়নায় এত বড় গম্ভীরপ্রকৃতি ফকিরকেও আপিসে আপিসে কর্ম্মের উমেদারীতে বাহির হইতে হইল, কিন্তু কর্ম্ম জুটিবার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তখন তিনি মনে করিলেন বুদ্ধদেবের মত আমি সংসার ত্যাগ

করিব। এই ভাবিয়া একদিন গভীর রাত্রে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

২

মধ্যে আর একটি ইতিহাস বলা আবশ্যক।

নবগ্রামবাসী ষষ্ঠিচরণের এক ছেলে। নাম মাখনলাল। বিবাহের অনতিবিলম্বে সন্তানাদি না হওয়াতে পিতার অনুরোধে এবং নূতনত্বের প্রলোভনে আর একটি বিবাহ করেন। এই বিবাহের পর হইতে যথাক্রমে তাঁহার উভয় স্ত্রীর গর্ভে সাতটি কন্যা এবং একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। মাখন লোকটা নিতান্ত সোখীন এবং চপল প্রকৃতি, কোন প্রকার গুরুতর কর্ত্তব্যের দ্বারা আবদ্ধ হইতে নিতান্ত নারাজ। একে ত ছেলেপুলের ভার, তাহার পরে যখন দুই কর্ণধার দুই কর্ণে ঝিঁকা মারিতে লাগিল তখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া সেও একদিন গভীর রাত্রে ডুব মারিল। বহুকাল তাহার আর দেখা সাক্ষাৎ নাই। কখন কখন শুনা যায়, এক বিবাহে কিরূপ সুখ তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য সে কাশীতে গিয়া গোপনে আর একটি বিবাহ করিয়াছে; শুনা যায়, হতভাগ্য কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়াছে। কেবল দেশের কাছাকাছি আসিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার মন উতলা হয়, ধরা পড়িবার ভয়ে আসিতে পারে না।

৩

কিছু দিন ঘুরিতে ঘুরিতে ফকিরচাঁদ নবগ্রামে আসিয়া উপস্থিত। পথপার্শ্ববর্ত্তী এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "আহা, বৈরাগ্যমেবাভয়ং। দারা পুত্র ধন জন কেউ কারো নয়। কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ।" বলিয়া এক গান জুড়িয়া দিলেন।

শোন্‌রে শোন্‌, অবোধ মন!
শোন্‌ সাধুর উক্তি কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর্‌ গ্রহণ!
ভবের শুক্তি ভেঙ্গে মুক্তি-মুক্তা কর অন্বেষণ!
ওরে ও ভোলা মন, ভোলা মন রে!

সহসা গান বন্ধ হইয়া গেল। "ও কে ও! বাবা দেখ্‌চি! সন্ধান পেয়েচেন বুঝি! তবেই ত সর্ব্বনাশ! আবার ত সংসারের অন্ধকূপে টেনে নিয়ে যাবেন! পালাতে হল।"

৪

ফকির তাড়াতাড়ি নিকটবর্ত্তী এক গৃহে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ গৃহস্বামী চুপচাপ্‌ বসিয়া তামাক টানিতেছিল। ফকিরকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেহে তুমি?"

ফকির। বাবা, আমি সন্ন্যাসী।

বৃদ্ধ। সন্ন্যাসী! দেখি দেখি বাবা, আলোতে এস দেখি! এই বলিয়া আলোতে টানিয়া লইয়া ফকিরের মুখের পরে ঝুঁকিয়া বুড়া মানুষ বহু কষ্টে যেমন করিয়া পুঁথি পড়ে তেমনি করিয়া ফকিরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বকিতে লাগিল। "এই ত আমার সেই মাখনলাল দেখ্‌চি! সেই নাক, সেই চোখ, কেবল কপালটা বদ্‌লেচে, আর সেই চাঁদমুখ গোঁফে দাড়িতে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেচে!" বলিয়া বৃদ্ধ সস্নেহে ফকিরের শ্মশ্রুল মুখে দুই একবার হাত বুলাইয়া লইল, এবং প্রকাশ্যে কহিল "বাবা, মাখন!" বলা বাহুল্য বৃদ্ধের নাম ষষ্ঠিচরণ।

ফকির। (সবিস্ময়ে) মাখন! আমার নাম ত মাখন নয়! পূর্ব্বে আমার নাম যাই থাক্‌, এখন আমার নাম চিদানন্দ স্বামী। ইচ্ছা হয় ত পরমানন্দও বল্‌তে পার।

ষষ্ঠি। বাবা, তা এখন আপনাকে চিঁড়েই বল আর পরমান্নই বল, তুই যে আমার মাখন, বাবা সে ত আমি ভুল্‌তে পারব না!—বাবা, তুই কোন্ দুঃখে সংসার ছেড়ে গেলি! তোর কিসের অভাব! দুই স্ত্রী; বড়টিকে না ভাল বাসিস্ ছোটটি আছে। ছেলে পিলের দুঃখও নেই। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সাতটি কন্যে, একটি ছেলে। আর আমি বুড়ো বাপ ক'দিনই বা বাঁচব, তোর সংসার তোরই থাক্‌বে!

ফকির একেবারে আঁৎকিয়া উঠিয়া কহিল "কি সর্ব্বনাশ! শুন্‌লেও যে ভয় হয়!" এতক্ষণে প্রকৃত ব্যাপারটা বোধগম্য হইল। ভাবিল, মন্দ কি, দিন দুই বৃদ্ধের পুত্রভাবেই এখানে লুকাইয়া থাকা যাক্, তাহার পরে সন্ধানে অকৃতকার্য্য হইয়া বাপ চলিয়া গেলেই এখান হইতে পলায়ন করিব।

ফকিরকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধের মনে আর সংশয় রহিল না। কেষ্টা চাকরকে ডাকিয়া বলিল "ওরে ও কেষ্টা, তুই সকলকে খবর দিয়ে আয়গে, আমার মাখন ফিরে এসেছে।"

৫

দেখিতে দেখিতে লোকে লোকারণ্য। পাড়ার লোকে অধিকাংশই বলিল সেই বটে, কেহ বা সন্দেহ প্রকাশ করিল। কিন্তু বিশ্বাস করিবার জন্যই লোকে এত ব্যগ্র, যে, সন্দিগ্ধ লোকদের উপরে সকলে হাড়ে চটিয়া গেল। যেন তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক কেবল রসভঙ্গ করিতে আসিয়াছে; যেন তাহারা পাড়ার চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারকে সতেরো অক্ষর করিয়া বসিয়া আছে, কোন মতে তাহাদিগকে সংক্ষেপ করিতে পারিলেই তবে পাড়াশুদ্ধ লোক আরাম পায়; তাহারা ভূতও বিশ্বাস করে না, ওঝাও বিশ্বাস করে না, আশ্চর্য্য গল্প শুনিয়া যখন সকলের তাক্ লাগিয়া

গিয়াছে তখন তাহারা প্রশ্ন উত্থাপন করে। একপ্রকার নাস্তিক বলিলেই হয়। কিন্তু ভূত অবিশ্বাস করিলে ততটা ক্ষতি নাই, তাই বলিয়া বুড়া বাপের হারা ছেলেকে অবিশ্বাস করা যে নিতান্ত হৃদয়-হীনতার কাজ। যাহা হউক্, সকলের নিকট হইতে তাড়না খাইয়া সংশয়ীর দল থামিয়া গেল। ফকিরের অতি ভীষণ অটল গাম্ভীর্য্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া পাড়ার লোকেরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল—"আরে আরে, আমাদের সেই মাখন আজ ঋষি হয়েচেন, তপিস্বি হয়েচেন! চিরটা কাল ইয়ার্কি দিয়ে কাটালে আজ হঠাৎ মহামুনি জামদগ্নি হয়ে বসেচেন।"

কথাটা উন্নতচেতা ফকিরের অত্যন্ত খারাপ লাগিল, কিন্তু নিরুপায়ে সহ্য করিতে হইল। একজন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল "ওরে মাখন, তুই কুচ্‌কুচে কালো ছিলি রংটা এমন ফর্সা করলি কি করে'?" ফকির উত্তর দিল "যোগ-অভ্যাস করে'।"

সকলেই বলিল "যোগের কি আশ্চর্য্য প্রভাব!"

একজন উত্তর করিল "আশ্চর্য্য আর কি! শাস্ত্রে আছে, ভীম যখন হনুমানের লেজ ধরে তুল্‌তে গেলেন কিছুতেই তুল্‌তে পারলেন না। সে কি করে' হ'ল? সে ত যোগ-বলে!"

এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইল।

হেনকালে ষষ্ঠিচরণ আসিয়া ফকিরকে বলিল "বাবা একবার বাড়ির ভিতরে যেতে হচ্চে।" এ সম্ভাবনাটা ফকিরের মাথায় উদয় হয় নাই—হঠাৎ বজ্রাঘাতের মত মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া, পাড়ার লোকের বিস্তর অন্যায় পরিহাস

পরিপাক করিয়া অবশেষে বলিল "বাবা, আমি সন্ন্যাসী হয়েচি আমি অন্তঃপুরে ঢুকতে পারব না।"

ষষ্ঠিচরণ পাড়ার লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিল "তা হ'লে আপনাদের একবার গা তুল্‌তে হচ্চে। বৌমাদের এইখানেই নিয়ে আসি। তাঁরা বড় ব্যাকুল হয়ে আছেন।"

সকলে উঠিয়া গেল। ফকির ভাবিল এইবেলা এখান হইতে এক দৌড় মারি। কিন্তু রাস্তায় বাহির হইলেই পাড়ার লোক কুক্কুরের মত তাহার পশ্চাতে ছুটিবে ইহাই কল্পনা করিয়া তাহাকে নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিতে হইল।

যেম্‌নি মাখনলালের দুই স্ত্রী প্রবেশ করিল ফকির অম্‌নি নতশিরে তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিল "মা, আমি তোমাদের সন্তান!"

অম্‌নি ফকিরের নাকের সম্মুখে একটা বালা-পরা হাত খড়্গের মত খেলিয়া গেল এবং একটি কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল "ওরে ও পোড়াকপালে মিন্সে, তুই মা বল্লি কা'কে!"

অম্‌নি আর একটি কণ্ঠ আরো দুই সুর উচ্চে পাড়া কাঁপাইয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল "চোখের মাথা খেয়ে বসেছিস্‌ তোর মরণ হয় না!"

নিজের স্ত্রীর নিকট হইতে এরূপ চলিত বাঙ্গলা শোনা অভ্যাস ছিল না সুতরাং একান্ত কাতর হইয়া ফকির যোড়হস্তে কহিল "আপনারা ভুল বুঝ্‌চেন! আমি এই আলোতে দাঁড়াচ্চি আমাকে একটু ঠাউরে দেখুন্‌!"

প্রথমা ও দ্বিতীয়া পরে পরে কহিল "ঢের দেখেছি! দেখে দেখে চোখ্‌ ক্ষয়ে' গেছে। তুমি কচি খোকা নও, আজ নতুন জন্মাও নি। তোমার দুধের দাঁত অনেক দিন ভেঙ্গেছে। তোমার

কি বয়সের গাছপাথর আছে। তোমায় যম ভুলেচে বলে কি আমরা ভুল্‌ব!”

এরূপ একতরফা দাম্পত্য আলাপ কতক্ষণ চলিত বলা যায় না—কারণ ফকির একেবারে বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া ছিল। এমন সময় অত্যন্ত কোলাহল শুনিয়া এবং পথে লোক জমিতে দেখিয়া ষষ্ঠিচরণ প্রবেশ করিল। বলিল “এত দিন আমার ঘর নিস্তব্ধ ছিল, একেবারে টুঁ শব্দ ছিল না! আজ মনে হচ্চে বটে আবার মাখন ফিরে এসেচে!”

ফকির করযোড়ে কহিল “মশায়, আপনার পুত্রবধূদের হাত থেকে আমাকে রক্ষে করুন!”

ষষ্ঠি। বাবা, অনেক দিন পরে এসেছ তাই প্রথমটা একটু অসহ্য বোধ হচ্চে। তা, মা, তোমরা এখন যাও! বাবা মাখন ত এখন এখানেই রইলেন, ওঁকে আর কিছুতেই যেতে দিচ্চি নে।

ললনাদ্বয় বিদায় হইলে ফকির ষষ্ঠিচরণকে বলিল “মশায়, আপনার পুত্র কেন যে সংসার ত্যাগ করে’ গেছেন তা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারচি। মশায় আমার প্রণাম জান্‌বেন, আমি চল্লেম।”

বৃদ্ধ এম্‌নি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন উত্থাপন করিল যে, পাড়ার লোক মনে করিল মাখন তাহার বাপকে মারিয়াছে। তাহারা হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। সকলে আসিয়া ফকিরকে জানাইয়া দিল এমন ভণ্ডতপস্বিগিরি এখানে খাটিবে না। ভালমানুষের ছেলের মত কাল কাটাইতে হইবে। একজন বলিল “ইনি ত পরমহংস নন্ পরম বক।” গাম্ভীর্য্য গোঁফদাড়ি এবং গলাবন্ধের জোরে ফকিরকে এমন সকল কুৎসিৎ কথা কখন শুনিতে হয় নাই। যাহা হউক্ লোকটা পাছে আবার পালায়

পাড়ার লোকেরা অত্যন্ত সতর্ক রহিল। স্বয়ং জমিদার ষষ্ঠিচরণের পক্ষ অবলম্বন করিল।

ফকির দেখিল এম্‌নি কড়া পাহারা যে, মৃত্যু না হইলে ইহারা ঘরের বাহির করিবে না। একাকী ঘরে বসিয়া গান গাহিতে লাগিল—

শোন্ সাধুর উক্তি কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ।

বলা বাহুল্য, গানটার আধ্যাত্মিক অর্থ অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।

এমন করিয়াও কোনমতে দিন কাটিত। কিন্তু মাখনের আগমন সংবাদ পাইয়া দুই স্ত্রীর সম্পর্কের এক ঝাঁক শ্যালা ও শ্যালী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা আসিয়াই প্রথমতঃ ফকিরের গোঁফ দাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল—তাহারা বলিল এ ত সত্যকার গোঁফ দাড়ি নয়, ছদ্মবেশ করিবার জন্য আঠা দিয়া জুড়িয়া আসিয়াছে। নাসিকার নিম্নবর্ত্তী গুম্ফ ধরিয়া টানাটানি করিলে ফকিরের ন্যায় অত্যন্ত মহৎ লোকেরও মাহাত্ম্য রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া কানের উপর উপদ্রবও ছিল; প্রথমতঃ মলিয়া, দ্বিতীয়তঃ এমন সকল ভাষাপ্রয়োগ করিয়া যাহাতে কান না মলিলেও, কান লাল হইয়া উঠে। ইহার পর ফকিরকে তাহারা এমন সকল গান ফর্‌মায়েস্ করিতে লাগিল, আধুনিক বড় বড় নূতন পণ্ডিতেরা যাহার কোনরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে হার মানেন। আবার নিদ্রাকালে তাহারা ফকিরের স্বল্পাবশিষ্ট গণ্ডস্থলে চুনকালী মাখাইয়া দিল, আহারকালে কেসুরের পরিবর্ত্তে কচু, ডাবের জলের পরিবর্ত্তে হুঁকার জল,

দুধের পরিবর্ত্তে পিঠালি গোলার আয়োজন করিল, পিঁড়ার নীচে সুপারি রাখিয়া তাহাকে আছাড় খাওয়াইল, লেজ বানাইল এবং সহস্র প্রচলিত উপায়ে ফকিরের অভ্রভেদী গাম্ভীর্য্য ভূমিসাৎ করিয়া দিল। ফকির রাগিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ঝাঁকিয়া হাঁকিয়া কিছুতেই উপদ্রবকারীদের মনে ভীতির সঞ্চার করিতে পারিল না। কেবল সর্ব্বসাধারণের নিকট অধিকতর হাস্যাস্পদ হইতে লাগিল। ইহার উপরে আবার অন্তরাল হইতে একটি মিষ্ট কণ্ঠের উচ্চহাস্য মাঝে মাঝে কর্ণগোচর হইত; সেটা যেন পরিচিত বলিয়া ঠেকিত এবং মন দ্বিগুণ অধৈর্য্য হইয়া উঠিত।

পরিচিত কণ্ঠ পাঠকের অপরিচিত নহে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ষষ্ঠিচরণ কোন এক সম্পর্কে হৈমবতীর মামা। বিবাহের পর শাশুড়ির দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পিতৃমাতৃহীনা হৈমবতী মাঝে মাঝে কোন-না-কোন কুটুম্ব বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিত। অনেক দিন পরে সে মামার বাড়ি আসিয়া নেপথ্য হইতে এক পরম কৌতুকাবহ অভিনয় নিরীক্ষণ করিতেছে। তৎকালে হৈমবতীর স্বাভাবিক রঙ্গপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছিল কি না চরিত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্থির করিবেন, আমরা বলিতে অক্ষম।

ঠাট্টার সম্পর্কীয় লোকেরা মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিত কিন্তু স্নেহের সম্পর্কীয় লোকদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। সাত মেয়ে এবং এক ছেলে তাঁহাকে একদণ্ড ছাড়ে না। বাপের স্নেহ অধিকার করিবার জন্য তাহাদের মা তাহাদিগকে অনুক্ষণ নিযুক্ত রাখিয়াছিল। দুই মাতার মধ্যে আবার রেষারেষি ছিল উভয়েরই চেষ্টা যাহাতে নিজের সন্তানই অধিক আদর পায়। উভয়েই নিজ নিজ সন্তানদিগকে সর্ব্বদাই উত্তেজিত করিতে

লাগিল—দুই দলে মিলিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরা, কোলে বসা, মুখ চুম্বন করা প্রভৃতি প্রবল স্নেহব্যক্তি কার্য্যে পরস্পরকে জিতিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য ফকির লোকটা অত্যন্ত নির্লিপ্ত স্বভাব, নহিলে নিজের সন্তানদের অকাতরে ফেলিয়া আসিতে পারিত না; শিশুরা ভক্তি করিতে জানে না, তাহারা সাধুত্বের নিকট অভিভূত হইতে শিখে নাই, এই জন্য ফকির শিশুজাতির প্রতি তিলমাত্র অনুরক্ত ছিল না, তাহাদিগকে তিনি কীট পতঙ্গের ন্যায় দেহ হইতে দূরে রাখিতে ইচ্ছা করিতেন। সম্প্রতি তিনি অহরহ শিশুপঙ্গপালে আচ্ছন্ন হইয়া বর্জ্জইস্ অক্ষরের ছোটবড় নোটের দ্বারা আদ্যোপান্ত সমাকীর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ন্যায় শোভমান হইলেন। তাহাদের মধ্যে বয়সের বিস্তর তারতম্য ছিল, এবং তাহারা সকলেই কিছু তাঁহার সহিত বয়ঃপ্রাপ্ত সভ্যজনোচিত ব্যবহার করিত না; শুদ্ধশুচি ফকিরের চক্ষে অনেক সময় অশ্রুর সঞ্চার হইত এবং তাহা আনন্দাশ্রু নহে। পরের ছেলেরা যখন নানা সুরে তাঁহাকে বাবা বাবা করিয়া ডাকিয়া আদর করিত, তখন তাঁহার সাংঘাতিক পাশবশক্তি প্রয়োগ করিবার একান্ত ইচ্ছা হইত কিন্তু ভয়ে পারিতেন না। মুখ চক্ষু বিকৃত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

৭

অবশেষে ফকির মহা চেঁচামেচি করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি যাবই, দেখি আমাকে কে আটক করিতে পারে!" তখন গ্রামের লোক এক উকীল আনিয়া উপস্থিত করিল। উকীল আসিয়া কহিল "জানেন আপনার দুই স্ত্রী।"

ফকির। আজ্ঞে এখানে এসে প্রথম জান্‌লুম।

উকীল। আর আপনার সাত মেয়ে এক ছেলে, তার মধ্যে দুটি মেয়ে বিবাহযোগ্যা।

ফকির। আজ্ঞে, আপনি ঢের বেশি জানেন, কারণ, আমার অন্যরূপ ধারণা ছিল।

উকীল। আপনার এই বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের ভার আপনি যদি না নেন্ তবে আপনার অনাথিনী দুই স্ত্রী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করবেন, পূর্ব্বে হ'তে বলে' রাখ্‌লুম।

ফকির সব চেয়ে আদালতকে ভয় করিত। তাহার জানা ছিল উকীলরা জেরা করিবার সময় মহাপুরুষদিগের মানমর্য্যাদা গাম্ভীর্য্যকে খাতির করে না—প্রকাশ্যে অপমান করে এবং খবরের কাগজে তাহার রিপোর্ট্ বাহির হয়; ফকির অশ্রুসিক্ত লোচনে উকীলকে বিস্তারিত আত্মপরিচয় দিতে চেষ্টা করিল—উকীল তাহার চাতুরীর, তাহার উপস্থিত বুদ্ধির, তাহার মিথ্যা গল্প রচনার অসাধারণ ক্ষমতার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল। শুনিয়া ফকিরের আপন হস্ত পদ দংশন করিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

ষষ্ঠিচরণ ফকিরকে পুনশ্চ পলায়নোদ্যত দেখিয়া শোকে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল। পাড়ার লোকে তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া অজস্র গালি দিতে লাগিল, এবং উকীল তাহাকে এমন শাসাইল যে তাহার মুখে আর কথা রহিল না। ইহার উপর যখন আটজন বালক বালিকা গাঢ় স্নেহে তাহাকে চারিদিকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া তাহার শ্বাস রোধ করিবার উপক্রম করিল তখন অন্তরালস্থিত হৈমবতী হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না।

ফকির অন্য উপায় না দেখিয়া ইতিমধ্যে নিজের পিতাকে

একখানা চিঠি লিখিয়া সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিয়াছিল। সেই পত্র পাইয়া ফকিরের পিতা হরিচরণ বাবু আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু, পাড়ার লোক, জমিদার এবং উকীল কিছুতেই দখল ছাড়ে না। এ লোকটি যে ফকির নহে মাখন, তাহারা তাহার সহস্র অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করিল—এমন কি, যে ধাত্রী মাখনকে মানুষ করিয়াছিল সেই বুড়িকে আনিয়া হাজির করিল। সে কম্পিত হস্তে ফকিরের চিবুক তুলিয়া ধরিয়া মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার দাড়ির উপরে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

যখন দেখিল, তাহাতেও ফকির রাশ মানে না, তখন ঘোমটা টানিয়া দুই স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। পাড়ার লোকেরা শশ-ব্যস্ত হইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। কেবল দুই বাপ, ফকির, এবং শিশুরা ঘরে রহিল। দুই স্ত্রী হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিল "কোন্ চুলোয়, যমের কোন্ দুয়োরে যাবার ইচ্ছে হয়েচে?" ফকির তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না সুতরাং নিরুত্তর হইয়া রহিল। কিন্তু ভাবে যেরূপ প্রকাশ পাইল তাহাতে যমের কোন বিশেষ দ্বারের প্রতি তাহার যে পক্ষপাত আছে এরূপ বোধ হইল না; আপাতত যে কোন একটা দ্বার পাইলেই সে বাঁচে, কেবল একবার বাহিরিতে পারি-লেই হয়।

তখন আর একটি রমণীমূর্ত্তি গৃহে প্রবেশ করিয়া ফকিরকে প্রণাম করিল। ফকির প্রথমে অবাক্ তাহার পরে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিল "এ যে হৈমবতী!" স্ত্রীকে দেখিয়া এত প্রেম তাহার চক্ষে ইতিপূর্ব্বে কখন প্রকাশ পায় নাই। মনে হইল মূর্ত্তিমতী মুক্তি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

সৌন্দর্য্য চলচল করিতেছে। শ্যামের সহিত দেখা হয় এবং চারিদিকে একটা যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হাসি, খানিকটা ছলনা, খানিকটা আড়চক্ষে দৃষ্টি। একটু ব্যাকুলতা, একটু আশানৈরাশ্যের আন্দোলনও আছে। কিন্তু তাহা নিতান্ত মর্ম্মঘাতী নহে। চণ্ডিদাসের যেমন

"নয়ন চকোর মোর পিতে করে উতরোল,
নিমিখে নিমিখ নাহি হয়"

বিদ্যাপতিতে সেরূপ উতরোল ভাব নয়—কতকটা উতলা বটে। কেবল আপনাকে আধখানা প্রকাশ এবং আধখানা গোপন; কেবল হঠাৎ উদ্দাম বাতাসের একটা আন্দোলনে অম্‌নি খানিকটা উন্মেষিত হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতির রাধা নবীনা নবস্ফুটা। আপনাকে এবং পরকে ভাল করিয়া জানে না। দূরে সহাস্য, সতৃষ্ণ, লীলাময়ী; নিকটে কম্পিত, শঙ্কিত, বিহ্বল। কেবল একবার কৌতূহলে চম্পক অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সাবধানে অপরিচিত প্রেমকে একটুমাত্র স্পর্শ করিয়া অমনি পলায়নপর হইতেছে। যেমন একটি ভীরু বালিকা স্বাভাবিক পশুস্নেহে আকৃষ্ট হইয়া অজ্ঞাতস্বভাব মৃগকে একবার সচকিতে স্পর্শ করে, একবার পালায়, ক্রমে ক্রমে ভয় ভাঙ্গে, সেইরূপ।

যৌবন, সেও সবে আরম্ভ হইতেছে, তখন সকলি রহস্য-পরিপূর্ণ। সদ্য-বিকচ হৃদয় সহসা আপনার সৌরভ আপনি অনুভব করিতেছে; আপনার সম্বন্ধে আপনি সবে মাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে; তাই লজ্জায় ভয়ে আনন্দে সংশয়ে আপনাকে গোপন করিবে কি প্রকাশ করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না;—

কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি।

হৃদয়ের নবীন বাসনা সকল পাখা মেলিয়া উড়িতে চায় কিন্তু এখনো পথ জানে নাই। কৌতূহল এবং অনভিজ্ঞতায় সে এক-বার ঈষৎ অগ্রসর হয় আবার জড়সড় অঞ্চলটির অন্তরালে, আপনার নিভৃত কোমল কুলায়ের মধ্যে ফিরিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

এখন প্রেমে বেদনা অপেক্ষা বিলাস বেশি। ইহাতে গভী-রতার অটল স্থৈর্য্য নাই কেবল নবানুরাগের উদ্ভ্রান্ত লীলা-চাঞ্চল্য। বিদ্যাপতির এই পদগুলি পড়িতে পড়িতে একটি সমীরচঞ্চল সমুদ্রের উপরিভাগ চক্ষে পড়ে। ঢেউ খেলিতেছে; ফেণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে; মেঘের ছায়া পড়িতেছে; সূর্য্যের আলোক শত শত অংশে প্রতিস্ফুরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে; তরঙ্গে তরঙ্গে স্পর্শ এবং পলায়ন, কলরব, কলহাস্য, করতালি; কেবল নৃত্য এবং গীত, আভাস এবং আন্দোলন, আলোক এবং বর্ণবৈচিত্র্য। এই নবীন চঞ্চল প্রেম-হিল্লোলের উপর সৌন্দর্য্য যে কত ছন্দে কত ভঙ্গীতে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে, বিদ্যাপতির গানে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রের অন্তর্দ্দেশে যে গভীরতা, নিস্তব্ধতা, যে বিশ্ববিস্মৃত ধ্যান-লীনতা আছে তাহা বিদ্যাপতির গীতিতরঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না।

কদাচ কখনো দেখা হয়, যমুনার জলে অথবা স্নান করিয়া ফিরিবার সময়। কিন্তু ভাল করিয়া দেখা হয় না। একে অল্প-ক্ষণের দেখা, তাহাতে অধৈর্য্য-চঞ্চল দোদুল্যমান হৃদয়ে সৌন্দ-র্য্যের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া যায়—মনকে শান্ত করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া দেখিবার অবসর পাওয়া যায় না—যে-টুকু দেখা গেল সে কেবল

"আধ আঁচর খসি আধবদনে হাসি,
আধ হি নয়ান তরঙ্গ।"

কিন্তু "ভাল করি পেখিল না ভেল।"

তাহার পর কত আসা যাওয়া, কত বলা কওয়া, কত ছলে কত ভাব প্রকাশ, কত ভয়, কত ভাবনা—অবশেষে এক দিন মধুর বসন্তে নবীন মিলন; কিন্তু তাহাও নিবিড় নিগূঢ় নিরতিশয় মিলন নহে। তাহার মধ্যে কত আশঙ্কা, কত আশ্বাস, কত কৌতুক, কত ছদ্মলীলা, কত মান অভিমান সাধ্যসাধনা। আবার সখীর সহিত পরামর্শ; সখীকে ডাকিয়া গৃহ-কোণে নিভৃতে বসিয়া নানা ছলে এবং কথার কৌশলে আপনার সুখস্মৃতি লইয়া আলোচনা। নবীনার নব প্রেম যেমন মুগ্ধ যেমন মিশ্রিত বিচিত্র কৌতুককৌতূহলপরিপূর্ণ হইয়া থাকে, ইহাতে তাহার কিছুই কম নাই।

চণ্ডিদাস গভীর এবং ব্যাকুল, বিদ্যাপতি নবীন এবং মধুর।

"নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ,
নব নব বিকশিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল।
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দী পুলিন কুঞ্জ নব শোভন,
নব নব প্রেম বিভোর॥
নবীন রসাল-মুকুল-মধুমাতিয়া
নব কোকিলকুল গায়।
নব যুবতীগণ চিত উমতায়ই
নব রসে কাননে ধায়॥

নব যুবরাজ নবীন নব নাগরী
মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি ॥”

ইহার সহিত আর একটি গীত যোগ না করিলে ইহা সম্পূর্ণ হয় না।

“মধু ঋতু ; মধুকর পাঁতি
মধুর-কুসুম-মধু-মাতি।
মধুর বৃন্দাবন মাঝ,
মধুর মধুর রসরাজ।
মধুর-যুবতীগণ-সঙ্গ
মধুর মধুর রস রঙ্গ।
মধুর যন্ত্র সুরসাল,
মধুর মধুর করতাল।
মধুর নটন-গতিভঙ্গ,
মধুর নটনী-নট-রঙ্গ।
মধুর মধুর রস গান,
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ ॥”

এই খানেই শেষ করা যাইত। কিন্তু এখানে শেষ করিলে বড় অসমাপ্ত থাকে। ঠিক সমে আসিয়া থামে না। এই জন্য বিদ্যাপতি একটি শেষ কথা বলিয়া রাখিয়াছেন। তাহাকে শেষ কথা বলা যাইতে পারে অশেষ কথাও বলা যাইতে পারে। এত লীলাখেলা নব নব রসোল্লাসের পরিণাম কথা এই যে,

“জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।”

নবীন প্রেম একেবারে লক্ষ লক্ষ যুগের পুরাতন হইয়া গেল। ইহার পরে ছন্দ এবং রাগিণী পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। চিরনবীন প্রেমের ভূমিকা সমাপ্ত হইয়াছে। চণ্ডিদাস আসিয়া চিরপুরাতন প্রেমের গান আরম্ভ করিয়া দিলেন।

সাময়িক সারসংগ্রহ।

উন্নতি।

দিনেমার দার্শনিক হারাল্‌ড্ হফ্‌ডিঙ্গ্ জুলাই মাসের মনিষ্ট্ পত্রিকায় মঙ্গলের মূলতত্ত্ব নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার যে অংশ ভারতবর্ষীয় পাঠকদের পক্ষে বিশেষ অবধানের যোগ্য আমরা সংকলিত করিয়া দিলাম।

যে সকল জীবের চিত্তবৃত্তি নিতান্ত আদিম অবস্থায় আছে তাহাদের পরিবর্ত্তন সহজে ঘটে না। তাহাদের জীবনধারণের সামান্য অভাবগুলি যতদিন পূরণ হইতে থাকে ততদিন তাহারা একভাবেই থাকে। ইন্‌ফ্যুসোরিয়া, রিজোপড্ প্রভৃতি নিম্নতম শ্রেণীর জন্তুগণের আজও যে দশা, যুগযুগান্তর পূর্ব্বেও অবিকল সেই দশা ছিল। তাহাদের আভ্যন্তরিক অবস্থার সহিত বাহ্য অবস্থার এমনি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য, যে, কোনরূপ পরিবর্ত্তনের কোন কারণ ঘটে না। মনুষ্যের মধ্যেও ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। যাহাদের অভাববোধ অল্প, যাহারা আপনার চারিদিকের অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ বনিবনাও করিয়া থাকিতে পারে তাহা-

দিগকে পরিবর্ত্তন এবং উন্নতির দিকে প্রবর্ত্তিত করিবার কোনরূপ উত্তেজনা থাকে না। সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি লইয়া তাহারা নিশ্চিন্তে কালযাপন করিতে থাকে। জটিল এবং বিচিত্র অবস্থাপন্ন মানবদের অপেক্ষা ইহাদের সুখ সন্তোষ অনেকটা সম্পূর্ণ এবং অবিমিশ্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ছোট পাত্র বড় পাত্র অপেক্ষা ঢের কম জলে ঢের বেশি পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে।

তবে ত সেই ছোট পাত্র হওয়াই সুবিধা। জীবনের কেবল কতকগুলি একান্ত আবশ্যক পূরণ করিয়া হৃদয়ের কেবল কতক-গুলি আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া নির্ব্বিকার শান্তি লাভ করাই ত ভাল। ফ্যুজিদ্বীপবাসীরা ত বেশ আছে,—দক্ষিণ আমেরিকার আদিম নিবাসীরা কদলীবনের মধ্যে ত চিরকাল সমভাবেই কাটাইয়াছিল, সভ্যতার নব নব অশান্তি এবং বিপ্লবের কোন ধার তাহারা ধারে না।

কিন্তু সে আক্ষেপ এখন করা বৃথা। সভ্য জাতিদের পক্ষে এরূপ জীবনযাত্রা নিতান্ত অসহ্য। তাহার কারণ, সভ্যতা-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন মনোবৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার নাম কাজ করিবার ইচ্ছা, উন্নতির ইচ্ছা। এক কথায়, তাহাকে অসন্তোষ বলা যাইতে পারে। এ মনোবৃত্তি সকল জাতির সকল অবস্থায় থাকে না।

প্রথম প্রথম বাহিরের তাড়ায় মানুষ দায়ে পড়িয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ক্রমে, কাজ করিতে করিতে অন্তরের মধ্যে কর্ম্মানুরাগ নামক একটা স্বতন্ত্র শক্তির সঞ্চার হয়; তখন বাহিরের উত্তেজনার অভাব সত্ত্বেও সে ভিতর হইতে আমাদিগকে অহর্নিশি কাজে প্রবৃত্ত করাইতে থাকে। তখন

মানুষ বাহিরের শাসন হইতে অনেকটা মুক্তি লাভ করে; বাহ্য অভাব মোচন হইলেও অন্তরের সেই নবজাগ্রত শক্তি বিশ্রাম করিতে চাহে না, তখন নব নব উন্নত আদর্শের সৃষ্টি হইতে থাকে; তখন হইতে আমাদের পক্ষে নির্জ্জীব নিস্পন্দ-ভাবে থাকা অসাধ্য হইয়া উঠে, এবং তাহাতে আমরা যথার্থ সুখও পাই না।

জাতীয় আত্মরক্ষার পক্ষে এই প্রবৃত্তির একটা উপযোগিতা আছে, তাহা বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ স্থায়িত্ব কোথাও নাই। তোমার অব্যবহিত চতুস্পার্শ্বে যদি বা পরিবর্ত্তন তেমন খরস্রোতে প্রবাহিত না হয় তথাপি অনতিদূরে কোন না কোন জাতির মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছেই, সুতরাং কোন না কোন সময়ে তাহাদের সহিত জীবিকাযুদ্ধের সংঘর্ষ অনিবার্য্য। সে সময়ে, যাহারা বহুকাল স্থিরভাবে সন্তুষ্টচিত্তে আছে তাহাদের পক্ষে নূতন আপৎপাতের বিরুদ্ধে নূতন পরি-বর্ত্তন সহজসাধ্য হয় না; যাহারা কর্ম্মানুরাগী উদ্যোগী জাতি তাহারাই পরিবর্ত্তনে অভ্যস্ত এবং সকল সময়েই প্রস্তুত, সুতরাং এই চঞ্চল সংসারে টিঁকিবার সম্ভাবনা তাহাদেরই সব চেয়ে বেশি।

কেবল জাতি নহে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ নিহিত করিয়া সুখী হওয়ার অনেক বিপদ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখা যায়, ঘরের আদুরে ছেলে হইয়া চিরকাল খোকা হইয়া থাকার অনেক সুবিধা থাকিতে পারে; কিন্তু চিরদিন ঘরের মধ্যে কাটাইয়া চলে না, এক সময়ে কঠিন সংসারের সংশ্রবে আসিতে হয় তখন নিতান্ত নিঃসহায় হইয়া পড়িতে হয়। সঙ্কীর্ণ সম্পূর্ণতা লাভ অপেক্ষা বৃহৎ বিকাশের উদ্যম ভাল।

উন্নতি বলিতে সর্ব্বকামনার পর্য্যবসানরূপিণী একটা নির্ব্বিকার নিরুদ্যম অবস্থা বুঝায় না। ভবিষ্যতের নব নব মঙ্গল সম্ভাবনার জন্য নব নব শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলাই উন্নতি। সেই সমস্ত শক্তির উত্তেজনায় ক্রমাগত নূতন নূতন উদ্দেশ্যের পশ্চাতে নূতন নূতন চেষ্টা ধাবিত হইতে থাকে। সেই সঙ্গে কেবল উদ্যমেই কার্য্যে বিকাশেই একটা সুখ জাগ্রত হইয়া উঠে, সমগ্র প্রকৃতির পরিচালনাতেই একটা গভীর আনন্দ লাভ হয়। সেই আনন্দে সভ্য জাতিরা এমন সকল দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিতে পারে যাহার পেষণে অসভ্য জাতিরা মারা পড়ে। এই যে একটি স্বতন্ত্র উন্নতির প্রবৃত্তি, এই যে কর্ম্মের প্রতিই একটা স্বতন্ত্র অনুরাগ, ইহা লইয়াই সভ্য ও অসভ্য জাতির মধ্যে প্রধান প্রভেদ।

সুখ দুঃখ।

যাহারা রীতিমত বাঁচিতে চাহে, মুমূর্ষুভাবে কালযাপন করিতে চাহে না, তাহারা দুঃখ দিয়াও সুখ কেনে। হফ্‌ডিঙ্গ্ বলেন ভালবাসা ইহার একটি দৃষ্টান্তস্থল। ভালবাসাকে সুখ বলিবে না দুঃখ বলিবে? গেটে তাঁহার কোন নাটকের নায়িকাকে বলাইয়াছেন, যে, ভালবাসায়

কভু স্বর্গে তোলে, কভু হানে মৃত্যুবাণ।

অতএব সহজেই মনে হইতে পারে এ ল্যাঠায় আবশ্যক কি? কিন্তু এখনো গানটা শেষ হয় নাই। সুখ দুঃখ সমস্ত হিসাব করিয়া শেষ কথাটা এইরূপ বলা হইয়াছে—

সেই শুধু সুখী, ভালবাসে যার প্রাণ।

ইহার মর্ম্ম কথাটা এই যে, ভালবাসায় হৃদয় মন যে একটা

। ঞা ঞা ধা । পা পা -া । ধা পা -ধপা । মা গা -া।
। হে সে — । হে সে — । বে ড়া — । বে, সে —।

। গা -া -মা। পা -র্সা র্সা। মা -া -া । না -ধা -না।
। দে — —। খি — ব। তা — —। — — য়।

। র্সা র্সা -া । র্সা র্সা -না। র্সা নর্সা -র্গা। র্রা র্সা -র্রর্সা।
। হে সে —। হে সে — । বে ড়া —। বে, সে — ।

। মা -ধা -না। র্সা -নর্রা র্সনা। ধনা -া -া। -পা -ধঞা -র্সা।
। দে — —। খি — ব। তা — —। — — য়।

। র্সা র্সা -ঞা। ঞা ঞা -ধা। পধা পা -ধপা । মা গা -া।
। হে সে —। হে সে —। বে ড়া — । বে সে—।

। গা -া -মা। পা -র্সা র্সা। গা -া গা} ॥ ' ' সা।
। দে — —। খি — ব। তা য় (স)} ॥ আ :

। পা পা -া। পা পা -ধা। ঞা ঞা -ধা। পধা -ঞা ঞা।
। কা শে —। তা রা — । ফু টে — । ছে, — দ ।

। ধা পা -া। মা মা -া। মা গমা -পা। মা -া মা।
। খি নে —। বা তা স্। ছু টে — । ছে — পা।

। মা মা -পমা। গা গা -া। রা সা -ন্া। সা সা -গা।
। খি টি — । ঘু ম —। ঘো রে —। গে য়ে —।

। গরা গা -া। মা -া -া। মা -পা -র্সা। না -া না।
। উ ঠে —। ছে— —। আ — য় । লো, — আ।

। র্সা -না -র্রা। র্সনা সা -া। -া -া ধর্সা। ঞা ধপা ধা।
। ন — ন্দ । ম য়ী —। — — ম । ধু র, ব।

। ধঞা -র্সা ঞা। ধা পা -া। -পা -গা মা। ধা -া ধা
। স — ন্ত। ল য়ে —। — — লা। ব — ণ্য

। র্সা ঞসা ঞা। ধা পা -া। সা -া গা। মা পা -ধপা
। ফু টা —। বি লো —। ত — —। কু ল —।

। মা -া গা} ॥ ॥
। তা য় (স)} ॥ ॥

(ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইতে)

নিসাসাগ—ঝাঁপতাল।

দেহি হৃদয়ে সদা শান্তি-রস প্রভু হে,
তব অমৃত কর-পরশে দুঃখ-যাতনা কর দূর;
সুখ বিমলতর বিতর প্রভু হে।
দেহি প্রভু প্রেম-ধন, দারিদ্র্য কর হরণ,
তব চরণে দেহি শরণ, এই ভিক্ষা করি হে।

২—৩+৩

।২ ।৩।০।১।

॥ গা -া। সা সা সা। গা -া। ঋা সা -া ।সা -া । গা গা গা।
॥ দে —। হি, হৃ দ। য়ে —। স দা — ।শা —। স্তি, র স।

। মা পা। মা -া -গা। সা সা। গা গা মা। পা পা। পা পা মা।
। প্র ভু। হে — —। ত ব। অ মৃ ত। ক র। প র শে।

। পা -া। ঞা -ধা -ঞা। র্সা -া। ধা পা -া। গা গা। গা -মা ঋা।
। দু —। খ — —। যা —। ত না —। ক র। দূ — র।

। পা পা । ঞা ধা না । র্সা র্সা । ধা ধা পা । ধা পা । ধা -মা -া ॥
। সু খ । বি ম ল । ত র । বি ত র । প্র ভু । হে — — ॥

॥ পা -া । না না না । র্সা -া । র্সা না না । র্সা -া । না -া না ।
॥ দে — । হি, প্র ভু । প্রে — । ম ধ ন । দা — । রি — দ্র্য ।

। র্সা না । ধা পা পা । গা গা । গা গা গা । মা রা । পা ঞা ধা ।
। ক র । হ র ণ । ত ব । চ র ণে । দে হি । শ র ণ ।

। র্সা র্সা । ধা -া ঞা । ধা পা । ধা -মা -া ॥ ॥
। এ ই । ভি — ক্ষা । ক রি । হে — — ॥ ॥ *

ইংলণ্ডে অপরাধীর সংশোধন-পদ্ধতি।

ইংলণ্ডে নির্ব্বাসন-দণ্ড উঠিয়া গিয়া তাহার পরিবর্ত্তে দাসত্ব-দণ্ডের বিধান হইয়াছে। পাঁচ বৎসর কিম্বা ততোধিক কাহারও কারাদণ্ড হইলে তাহা দাসত্ব-দণ্ড বলিয়া গৃহীত হয়। দাসত্ব-দণ্ড তিন ধাপে বিভক্ত। প্রথম ধাপে, অপরাধী তাহার কারাদণ্ডের প্রথম নয় মাস কাল কোন স্থানীয় কারাগারে নিঃসঙ্গভাবে আবদ্ধ থাকে। দ্বিতীয় ধাপে, তাহাকে অন্য কয়েদীর সহিত একত্রে কাজ করিতে দেওয়া হয়; এবং শেষ ধাপে, তাহার দণ্ডকাল অতিবাহিত না হইতে হইতেই তাহাকে মুক্ত করা হয়। যদি কোন কয়েদী ভাল ব্যবহার করে, তাহাকে যদি পরিশ্রমী বলিয়া বোধ হয়, তবে তাহার মেয়াদের বার আনা কাল অতিবাহিত হইলেই তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তদ্বিপরীতে কয়েদীকে সমস্ত মেয়াদকাল দণ্ডভোগ করিতে হয়।

---

* গত সংখ্যায় ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপিতে দ্বিতীয় লাইনের প্রথম পদ-বিভাগে "গমা"র পরিবর্ত্তে "পমা" হইবে। এবং পঞ্চম লাইনের দ্বিতীয় পদ-বিভাগে "ঞর্সা"র পরিবর্ত্তে "রর্সা" হইবে।

সহজ কারাদণ্ডার্হ ব্যক্তির প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হয়, দাসত্ব-দণ্ডার্হ ব্যক্তির প্রতি প্রথম নয় মাস সেই রূপই ব্যবহার করা হয়—প্রভেদ এই মাত্র যে দাসত্বদণ্ডার্হ ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত একটু ভাল খাইতে পায়। সরকারি নির্ম্মাণবিভাগ সংক্রান্ত কারাগারে যখন কোন কয়েদী আবদ্ধ থাকে তখন তাহাকে পাঁচটি উচ্চ হইতে উচ্চতর ধাপ অতিক্রম করিতে হয়। যত উচ্চতর ধাপে উঠিতে থাকে তদনুসারে তাহার অধিকার বৃদ্ধি হয়।

প্রথম ধাপটির নাম "পরীক্ষাধীন শ্রেণী"। এই শ্রেণীর ও অন্যান্য শ্রেণীর কয়েদীদিগের খাটুনির পরিমাণ সংখ্যা-চিহ্নের দ্বারা নির্দ্দেশিত হয়। প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের পরীক্ষার সময় পরীক্ষকেরা যেরূপ সংখ্যা-চিহ্নের দ্বারা ছাত্রদিগের আপেক্ষিক যোগ্যতা সূচিত করেন ইহাও তদ্রূপ। কারাগারে যে কয়েদী ৮ সংখ্যা দিনের মধ্যে প্রাপ্ত হয়, সেই ভাল কয়েদীর মধ্যে গণ্য। গড়ে দিনের কাজটা একরূপ সাবাড় করিতে পারিলে, যে-সে কয়েদী এই ৮ সংখ্যার চিহ্ন সহজে লাভ করিতে পারে। তিন মাস ধরিয়া যদি কোন কয়েদী প্রতিদিন এই সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা লাভ করে তাহা হইলে সে "পরীক্ষাধীন শ্রেণী" হইতে "তৃতীয় শ্রেণীতে" উন্নীত হয়। এই তৃতীয় শ্রেণীতে তাহাকে অন্ততঃ এক বৎসর কাল থাকিতে হয়। এই তৃতীয় শ্রেণীতে অবস্থিতি কালে ছয় মাস অন্তর সে চিঠিপত্র লেখালেখি করিতে পারে ও কারাগারের মধ্যে আত্মীয় বন্ধুর সহিত দেখা করিবার অধিকার পায়। তা-ছাড়া, প্রতি ২০ সংখ্যা-চিহ্নের উপর এক পেনি করিয়া পুরস্কার পায়—এইরূপে বৎসরে ১২ শিলিং করিয়া তাহার লাভ হয়। তৃতীয় শ্রেণীতে এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইলে, যদি সেই কয়েদী রীতিমত

ঘটিত বৃত্তান্তটি অতি প্রাচীন। রামায়ণেও এই বৃত্তান্তের উল্লেখ থাকায়, ডাঃ ভাণ্ডারকরের অনুমান যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। মহাভারতীয় বনপর্ব্বে লিখিত আছে—যে সমস্ত প্রাণীর যে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, অগস্ত্য মুনি সেই সকল সংগ্রহ করিয়া একটি অপূর্ব্ব স্ত্রীরত্ন নির্ম্মাণ করতঃ অপত্যার্থে দুরূহ তপস্যায় প্রবৃত্ত বিদর্ভরাজকে আত্মার্থে নির্ম্মিতা সেই কন্যা প্রদান করিলেন। কন্যা বিদর্ভরাজগৃহে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। এই কন্যার নাম লোপামুদ্রা। পরে, যথাসময়ে অগস্ত্য লোপামুদ্রার পাণিগ্রহণ করিলেন। (ম, ভা, বনপর্ব্ব ৯৬ অঃ)। এই আখ্যায়িকাটিও তাঁহার উক্ত মতের পরিপোষক বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

মহাভারতীয় বনপর্ব্বের তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায় অনুসারে সূর্য্যের গতিরোধকরণ মানসে বিন্ধ্যাগিরি অতিশয় বর্দ্ধিত হইলে দেবগণের অনুরোধে মহাত্মা অগস্ত্য উক্ত পর্ব্বতের সমীপস্থ হইয়া তাহাকে বলিলেন, "হে নগেন্দ্র! আমি কোন বিশেষ কার্য্যবশতঃ দক্ষিণ দিকে গমন করিব অতএব অভিলাষ করি, তুমি পথ প্রদান কর। আমি যাবৎ দক্ষিণ দিক্ হইতে ফিরিয়া না আসি, তাবৎ আমার প্রতীক্ষায় এইরূপ স্বাভাবিক অবস্থায় থাক; আমি ফিরিয়া আসিলে পর তুমি পুনরায় ইচ্ছামত বর্দ্ধিত হইও।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার অনুরোধ রক্ষার জন্য বিন্ধ্য স্বীয় দেহ সঙ্কোচন করিল। মহাত্মা অগস্ত্য দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিয়া আর ফিরিয়া আসিলেন না। আমাদের পূর্ব্বপ্রস্তাবালোচিত উপাখ্যান অপেক্ষা এই উপাখ্যানটি কিছু অধিক সঙ্গত, এই নিমিত্ত এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

অগস্ত্য কোন্ সময়ের লোক তাহা স্থির করিতে গেলে বিষম

গোলে পড়িতে হয়। রামায়ণানুসারে তিনি রামচন্দ্রের সমসাময়িক। আবার মহাভারতে তিনি যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। স্থানান্তরে (ম, ভা, বনপর্ব্ব ১৮১ অঃ) তাঁহাকে, রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির উভয়েরই বহু পূর্ব্ববর্ত্তী নহুষের সমসাময়িক বলা হইয়াছে (১)। এদিকে আবার ঋগ্বেদে অগস্ত্যের জন্ম (২) ও কার্য্যকলাপের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদেও অগস্ত্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (৩)। এই সকল আলোচনা করিলে মনে হয়, অগস্ত্য নামধারী বহু ঋষি ছিলেন; অথবা অগস্ত্য একটি বংশের নাম ছিল। এ কথা স্বীকার না করিলে এই গোলমালের মীমাংসা হয় না। এই অনুমান সত্য হইলে বিন্ধ্যোল্লঙ্ঘনকারী অগস্ত্য, রামচন্দ্রের সমসাময়িক অগস্ত্যের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন স্বীকার করিতে হয়। অগস্ত্য যে একটি বংশের নাম ছিল বা অগস্ত্য নামধারী বহু ঋষি ছিলেন এরূপ অনুমানের আরও একটি কারণ আছে। মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণানুসারে অগস্ত্য দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া আর ফিরিলেন না। রামায়ণের সময় অগস্ত্যাশ্রম (অগস্ত্য নামধারী তদ্বংশীয় কোন ঋষির আশ্রম) দণ্ডকারণ্যে ছিল। কিন্তু মহাভারতের সময় অগস্ত্যাশ্রম গয়ার নিকটে ছিল। যিনি দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া আর ফিরিলেন না, তিনি আবার গয়ার

১। নহুষ—চন্দ্রবংশীয় পঞ্চম নৃপতি। মহারাজ পুরূরবার পৌত্র।

২। ঋগ্বেদ ৭।৩৩।১৩ দেখ। বিগত ফাল্গুন মাসের 'সাধনা'র ৩০১ পৃঃ পাদটীকায় আমরা যে "বৃহৎ সংহিতা"র উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ডাঃ ম্যুয়ারের মতে "বৃহদ্দেবতা" নামক গ্রন্থ হইবে।

৩। অথর্ব্ববেদ ৪ কাণ্ড, ২৯ সূক্ত, ৬ ও ৫ ঋক দেখ Quoted in Muir's Sanskrit Texts. Vol. I p. 330.

নিকট আশ্রম স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন কিরূপে? আমাদের বোধ হয়, গয়ার নিকটস্থ মহাভারতীয় অগস্ত্যাশ্রম, অগস্ত্যবংশীয় কোন ঋষির হইতে পারে। অথবা এমনও হইতে পারে, যেমন শঙ্করাচার্য্যের মঠধারী শিষ্যগণ পরম্পরাক্রমে সকলেই শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ অগস্ত্যের শিষ্যগণও অগস্ত্য নামে পরিচিত হইতেন। এই শেষোক্ত অনুমানই আমাদের অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

রামায়ণে উক্ত হইয়াছে যে, তৎকালে দণ্ডকারণ্যে মহাত্মা অগস্ত্যের আশ্রম ছিল। ভগবান্ রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে বহুদিন ও অগস্ত্যাশ্রমের দুই যোজন দূরে পঞ্চবটী নামক স্থানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। রামানুজের মতে বর্ত্তমান মহারাষ্ট্র দেশ পুরাকালে দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিত ছিল। রামায়ণবর্ণিত দণ্ডকারণ্যের ভৌগোলিক অবস্থান পর্য্যালোচনা করিলে, রামানুজের সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয় না। হিন্দুগণের সংস্কার-পদ্ধতি অনুসারে, উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কারের অন্তর্গত কোন সংস্কার করিতে হইলে, প্রথমে 'সংকল্প' করিতে হয়। সংকল্প করিবার সময় 'দেশকালাদি'র উল্লেখ অর্থাৎ যে দেশে ও যে সময়ে ঐ সংস্কার অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক। মহারাষ্ট্র দেশীয় ব্রাহ্মণগণ এই সংকল্প করিবার সময় "মহারাষ্ট্র দেশে" এইরূপ উল্লেখ না করিয়া "দণ্ডকারণ্য দেশে" এইরূপ উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারাও দণ্ডকারণ্য ও মহারাষ্ট্র দেশের অভিন্নতা প্রতিপন্ন হইতেছে। হেমাদ্রি (খৃঃ ১২শ শতাব্দীর শেষ ভাগে) স্বকৃত ব্রতখণ্ড নামক গ্রন্থের ভূমিকায় মহারাষ্ট্র দেশের তাৎকালিক রাজধানী দেবগিরি বা দৌলতা-

বাদকে দণ্ডকারণ্যের সীমান্তবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফল কথা, বর্ত্তমান মহারাষ্ট্র দেশই প্রাচীনকালে দণ্ডকারণ্য নামে অভিহিত হইত। (১)

পঞ্চবটী কোথায়? সাধারণের বিশ্বাস অনুসারে বর্ত্তমান নাসিকই রামায়ণোক্ত পঞ্চবটী। ভারত-ভ্রমণ লেখক বলেন "গোদাবরীর উত্তরতীরে পঞ্চবটী। সীতাহরণ এই স্থানেই হয়। ... ... দেখিলাম, একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত বাটীর কিয়দংশ ভূগর্ভস্থিত এবং তাহার একপার্শ্বে কয়েকটি প্রাচীন বৃক্ষ। এই স্থানটিকে পাণ্ডা পঞ্চবটী বলিয়া উল্লেখ করিল এবং কহিল, এই গৃহই রামচন্দ্রের আবাস ছিল। কিন্তু আমার বোধ হইল, বাটীটি ততকালের নহে এবং বৃক্ষগুলিও তত প্রাচীন নয়। নাসিকের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিবার জন্য পাণ্ডাগণ এই শ্লোকটি আবৃত্তি করে—

"আদৌ হি পদ্মনগরং ত্রেতাযুগে জনস্থানং।
দ্বাপরে তু ত্রিকণ্টকং কলৌ নাসিকমুচ্যতে ॥"

... ... কিন্তু পঞ্চবটীর অদূরেই যে চম্পক সরোবর, প্রস্রবণ নামে গিরি ও মাল্যবান্ নামে গিরি ছিল বলিয়া বর্ণনা দেখা যায়, তাহার কোন নিদর্শন দেখিতে পাইলাম না।" (নবজীবন ১ম খণ্ড ৬৬২।৩ পৃঃ) বাল্মীকীয় রামায়ণ ও ভবভূতির উত্তররামচরিতের বর্ণনানুসারে পঞ্চবটীর নিকটে গোদাবরী অতি বিস্তৃত ছিল। কিন্তু নাসিকের নিকটে গোদাবরী অতি সঙ্কীর্ণ। এই সকল কারণে রামায়ণোক্ত পঞ্চবটী ও বর্ত্তমান নাসিকের অভিন্নতা সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

১। Vide Dr. Bhandarkar's Early History of the Dekkan etc. Part II.

ডাঃ ভাণ্ডারকর বলেন, মার্কণ্ডেয় (৫৭ অঃ) বায়ু (৪৫ অঃ) ও মৎস্য (১১২ অঃ) পুরাণে এ সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—সহ্যাদ্রির উত্তরাংশে যে প্রদেশ আছে এবং যাহার মধ্য-দিয়া গোদাবরী নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই প্রদেশে "গো-বর্দ্ধন" নামক এক পর্ব্বত আছে। ঐ পার্ব্বত্য প্রদেশের মত রমণীয় স্থান পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। রামচন্দ্রকে সন্তুষ্ট ও সীতাদেবীকে সুখী করিবার জন্য ভরদ্বাজ মুনি সেই প্রদেশে স্বর্গীয় বৃক্ষ লতাদি উৎপাদন করিয়াছিলেন; তাহাতে উহা এক অতি রমণীয় উদ্যানের ন্যায় হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণে গোবর্দ্ধনকে 'পুর' অর্থাৎ নগর বলা হইয়াছে। সে যাহা হউক, গোবর্দ্ধনের অবস্থান যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে উহার সহিত নাসিকের, বিশেষতঃ নাসিকের নিকটস্থ 'গোবর্দ্ধন নামক স্থানের (পল্লিগ্রামের) অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়। (১)

পরলোকগত মহাত্মা স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সংকলিত "শব্দকল্পদ্রুম"-এর দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত সংস্করণের 'ভারতবর্ষ' শব্দের বিবরণে মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৫৭ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত অংশে উল্লিখিত গোবর্দ্ধনপুরের যে বর্ণনা আছে, তাহার সহিত ডাঃ ভাণ্ডারকরের উদ্ধৃত বিবরণের ঐক্য দেখিতে পাইলাম না। শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত মার্কণ্ডেয় পুরাণের বচনটি এই—

"সহ্যস্যচোত্তরেণৈব যত্র গোদাবরী নদী।
পৃথিব্যামপি কৃৎস্নায়াং স প্রদেশো মনোরমঃ।
গোবর্দ্ধনপুরং রম্যং ভার্গবস্য মহাত্মনঃ॥"

মার্কণ্ডেয় পুঃ ৫৭ অঃ।

১। Vide Dr. Bhandarkar's Early Hist. of Dekkan etc. part II.

এখানে রামচন্দ্রের বা ভরদ্বাজের কোনও উল্লেখ নাই। বরং গোবর্দ্ধনপুরকে "মহাত্মা ভার্গবের" বলা হইয়াছে। ডাঃ ভাণ্ডারকরের অবলম্বিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের সহিত শব্দকল্পদ্রুমের অবলম্বিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের এই অংশের এরূপ অনৈক্য থাকা কিছুই বিচিত্র নহে। অন্যান্য পুরাণেও এইরূপ অনেক পাঠভেদ দৃষ্ট হয়।

ভগবান্ রামচন্দ্রের পূর্ব্বে বুন্দেলখণ্ড ও দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ অরণ্যময় ও অনার্য্যনিবাস ছিল। তৎপরে রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থে বনগমন করিলে, ঐ সকল প্রদেশস্থ অনার্য্যগণের অধিকাংশকে নিহত ও বশীভূত করিয়া উক্ত প্রদেশসমূহ বিঘ্নহীন করেন। রামচন্দ্রের ইহলোক পরিত্যাগের পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাত্মা কুশ বিন্ধ্য পর্ব্বতের প্রান্তদেশে "কুশাবতী" নামে একটি রাজ্য স্থাপন করিলেন। (১)

চোল (২) তাঞ্জোর ও পাণ্ড্য (মদুরা ও তিনাবল্লী) মণ্ডলের রাজকুল-চরিত্রে এই উপাখ্যান লিপিবদ্ধ আছে যে, উক্ত প্রদেশসমূহ পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যের (দক্ষিণাপথস্থ অরণ্যময় প্রদেশের) অন্তর্গত ছিল। পরে তীর্থযাত্রীরা আর্য্যাবর্ত্ত হইতে রামেশ্বর তীর্থে আগমন পূর্ব্বক বন পরিষ্কার করিয়া বসতি করিলেন। তন্মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তবাসী 'মথুর নায়ক পাণ্ড্য' নামক জনৈক বৈশ্য বৈজী নদীতীরস্থ বন জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিয়া মধুর (মদুরা) নগর পত্তন করিলেন এবং 'তয়মন চোল' নামক এক ব্যক্তি অযোধ্যা হইতে আসিয়া কাবেরী নদীর সন্নিহিত ত্রিশিরপল্লী (Trichino-

---

১। রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড ১০৮ সর্গ দেখ।

২। "দ্রবিড়তৈলঙ্গয়োর্মধ্যে চোলদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে ৭ম পটল।

poli) নামক স্থানে এক নগর সংস্থাপিত করিলেন। ইহাতেই চোল রাজ্যের পত্তন হইল। (১)

মহাভারতীয় সভাপর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেব দক্ষিণ দিগ্বিজয় কালে, কিষ্কিন্ধ্যা, (২) মাহিষ্মতী (নর্ম্মদাতীরে অবস্থিত) সুরাষ্ট্র, শূর্পারক, তালাকট, দণ্ডক,(৩) করহাটক, (৪) পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, কেরল, অন্ধ্র ও কলিঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। (৫) ভীষ্মপর্ব্বের ৯ম অধ্যায়ে দ্রাবিড়, কেরল, মূষিক, বনবাসিক, কর্ণাটক, মাহিষক, কুন্তল, চোল, কোঙ্কণ, দণ্ডক, বিদর্ভ, প্রভৃতি জনপদকে দক্ষিণ দেশীয় বলা হইয়াছে। আশ্বমেধিক অশ্বের অনুসরণকালে মহাবীর অর্জ্জুন দ্রাবিড়, অন্ধ্র, মাহিষক, ও সুরাষ্ট্র প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। (৬) আদিপর্ব্বের বৈবাহিক পর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, পাণ্ড্য দেশের অধিপতি দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণাভিলাষে লক্ষ্যভেদ করিতে উত্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে অনার্য্য নৃপতি ছিলেন, এ কথা কোনও ক্রমে বলা যায় না। উদ্যোগপর্ব্বের সপ্তপঞ্চাশদধিক অধ্যায়ে ভোজরাজ রুক্মীকে দাক্ষিণাত্যপতি

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ২য় কল্প ১ম ভাগ ১৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। মৎস্য ও মার্কণ্ডেয়াদি পুরাণানুসারে "কিষ্কিন্ধ্যা" বিন্ধ্যগিরির পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণের বর্ণনানুসারে গোদাবরীর দক্ষিণে কিষ্কিন্ধ্যা প্রদেশ।

৩। রামায়ণোক্ত দণ্ডকারণ্য ও মহাভারতীয় এই দণ্ডক অভিন্ন। কেবল প্রভেদ এই যে, মহাভারতে কোন স্থলেই ইহাকে অরণ্য বলা হয় নাই। কারণ সে সময় ইহা আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হইয়াছিল।

৪। করহাটক—কৃষ্ণা ও কোয়না নদীর সঙ্গমস্থলের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ। ইহা কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম "কহ্লাড়"। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক এই কহ্লাড় প্রদেশীয় ব্রাহ্মণ।

৫। সভাপর্ব্ব ৩১ অধ্যায়।

৬। আশ্বমেধিক পর্ব্ব ৮৩ অধ্যায়।

বলা হইয়াছে। ভীষ্মপর্ব্বের উল্লেখ মহাভারতের মৌলিক স্তরের অন্তর্গত কি না, সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। কিন্তু সে-টুকু বাদ দিলেও মহাভারতের সময় যে দাক্ষিণাত্য অনার্য্যনিবাস ছিল না, রামায়ণের সময়াপেক্ষা মহাভারতের সময় দাক্ষিণাত্যের অবস্থা যে সমধিক উন্নত হইয়াছিল, তাহা মহাভারত আলোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হয়।

আদিপর্ব্বের অর্জ্জুনবনবাস পর্ব্বাধ্যায়ানুসারে মহাবীর অর্জ্জুন গোকর্ণতীর্থে (কোঙ্কনে), অপরান্ত প্রদেশস্থ সমস্ত তীর্থ ও পবিত্র আয়তনে গমন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলে যে সকল তীর্থ ও পুণ্যায়তন আছে, সেই সমস্ত স্থানও পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে প্রভাস তীর্থে উপনীত হইলেন। বনপর্ব্বেও (৯১ অঃ) দক্ষিণদিকস্থ তীর্থ ও পবিত্র আশ্রম সকলের নামোল্লেখকালে গোকর্ণ ও শূর্পারকের নামোল্লেখ আছে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ রামায়ণকে, এমন কি, রামায়ণবর্ণিত ঘটনাকেও মহাভারতের অপেক্ষা আধুনিক বলিতে চাহেন। কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণের ভাষা, ছন্দঃ, রচনাপ্রণালী ও "তদুক্ত 'আর্য্যকুলের বাস সীমা," এই কয়টি বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, রামায়ণকে কখনই মহাভারতের পরবর্ত্তী বলিতে পারা যায় না। * রামায়ণে দাক্ষিণাত্যের অবস্থা যেরূপ বর্ণিত হই-য়াছে, তাহাতেও রামায়ণের প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হয়। সে সময় দাক্ষিণাত্য অনার্য্যনিবাস ছিল। রামায়ণের সময়েই আমরা আর্য্যগণকে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাই। কিন্তু তখনও "আর্য্যগণ বিন্ধ্যাচল লঙ্ঘন করিয়া দক্ষিণাবর্ত্ত করতলস্থ

---

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগ উপক্রমণিকা ৮২ পৃঃ দেখ।

করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। বিন্ধ্যাচল তখনও তাঁহাদের যাতায়াতের নিমিত্ত অগস্ত্য সমীপে কেবল প্রণত হইয়া উন্নত দেহ সঙ্কোচ করিতেছে মাত্র। ব্রাহ্মণ প্রচারকগণ সেই বনস্থল ভেদ করিয়া ধর্ম্মকিরণ বিকীর্ণ করণার্থে স্থানে স্থানে প্রেরিত হইতেছেন। এ দিকে পশুবৎ অসভ্য আদিম অধিবাসিগণ তাহাদের অধিকারে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক দর্শন করিয়া, ঈর্ষাপরবশ হইয়া অনধিকার প্রবেশক আর্য্যদিগের উচ্ছেদ সাধনে ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে।" (১)

কিন্তু মহাভারতে এরূপ ভাব কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। মহাভারতের বর্ণনা পাঠ করিলে, তৎকালে দক্ষিণাপথে আর্য্যগণের শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। মহাভারতে যতই অত্যুক্তি, যতই প্রক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত থাকুক না কেন, আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্য অধিকার করিয়া যে সে সময়ে তথায় স্থায়ীরূপে বসতি করিতে ছিলেন, তাহা মহাভারত পাঠে সহজেই অনুমিত হয়। রামায়ণে আর্য্যগণ সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইয়া বহুযুদ্ধে দস্যু বা রাক্ষসাদি অনার্য্যজাতিগণকে জয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এবং বাহুবলে বহুদেশ অধিকার করত শিল্পাদির উন্নতিকল্পে চেষ্টিত হইয়া, সভ্যতার প্রথম সোপানে উঠিয়া, কাশী, অযোধ্যা, মিথিলাদি নগর সংস্থাপন করিতেছিলেন। মহাভারতে আর্য্য সভ্যতা ও আর্য্য পৌরুষ চরম সীমায় উঠিয়াছিল। ভারতবর্ষ এখন আর্য্যগণের করতলস্থ, অনার্য্যগণ বিজিত, পদানত ও দেশপ্রান্তবাসী। আর্য্যগণ এখন ভারতে আভ্যন্তরিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনে সচেষ্ট, বিজয়লব্ধ সম্পত্তির (অনন্ত ধনরত্ন পরি-

---

১। বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত ৩০ পৃষ্ঠা।

পূর্ণ্যভারতভূমির) অংশীকরণে ব্যস্ত। সকলের সমবেত চেষ্টায় যাহা লাভ করা হইয়াছে, তাহা ভোগ করিবে কে ? এই প্রশ্নের ফলে আভ্যন্তরিক বিবাদের উৎপত্তি। মহাভারতে এই আভ্যন্তরিক বিবাদের আমূল ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। (১)

বাল্মীকির রামায়ণে আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণস্থিত দেশসমূহের মধ্যে উৎকল (বর্ত্তমান গঞ্জাম) কলিঙ্গ (বর্ত্তমান উত্তর সরকার) দশার্ণ (২) অবন্তি, বিদর্ভ, সৌবীর (রাজপুতানার দক্ষিণাংশ ; পরবর্ত্তী নাম বদরিকাশ্রম) ও সৌরাষ্ট্র, এই কয়টি দেশের নাম উক্ত হইয়াছে। এই সকল দেশের ও ভারতের অতি দক্ষিণে স্থিত পাণ্ড্য, চোল, ও কেরল প্রভৃতি দেশের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ রামায়ণের সময় অরণ্যময় ও অনার্য্যনিবাস ছিল। কিন্তু মহাভারতীয় সভাপর্ব্বের বর্ণনা দৃষ্টে বোধ হয় যে, উক্ত অরণ্যময় প্রদেশ তৎকালে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক পরিস্কৃত ও অধ্যুষিত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি উক্ত কাব্যে "মহারাষ্ট্র" প্রভৃতি আধুনিক প্রদেশ সমূহের নাম দৃষ্ট হয় না।

কিন্তু মার্কণ্ডেয়াদি মহাভারতের পরবর্ত্তী ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ সমূহে মহারাষ্ট্রাদি প্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—

"সেতুকা মুষিকাশ্চৈব কুমারাবানবাসিকাঃ।
মহারাষ্ট্রা মাহিষকাঃ কলিঙ্গাশ্চৈব সর্ব্বশঃ॥"

শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত মার্কণ্ডেয় পুরাণ (৫৭ অঃ) বচন।

১। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত "দ্রৌপদী" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২। দশার্ণ—ইহার রাজধানী বিদিশা। মেঘদূতের বর্ণনানুসারে বিদিশা বেত্রবতী (বেটওয়া) নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বিদিশার আধুনিক নাম 'ভিলসা'।

মৎস্যপুরাণে এই শ্লোকটি একটু রূপান্তরিত হইয়াছে—

সেতুকা মূষিকাশ্চৈব কুপথাচারবাসিকাঃ।
নবরাষ্ট্রা মাহিষকাঃ কলিঙ্গাশ্চৈব সর্ব্বশঃ॥"

শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত মৎস্য পুরাণ বচন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের পাঠই বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। "কুমারা-বানবাসিকাঃ" স্থানে লিপিকরপ্রমাদ বশতঃ "কুপথাচারবাসিকাঃ" ও "মহারাষ্ট্রাঃ" স্থানে "নবরাষ্ট্রাঃ" হওয়া খুব সম্ভব। "কুমারা" কি, তাহা জানা যায় না। "বনবাসী" (১) প্রদেশের অধিবাসি-দিগকে "বানবাসিকাঃ" বলে।

"নাসিকাদ্যাশ্চ যে চান্যে যে চৈবান্তর নর্ম্মদাঃ।
ভারুকচ্ছাঃ সমাহেয়াঃ সর্ব্বে সারস্বতৈঃ সহ॥"

শ, ক, দ্রু, উদ্ধৃত মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৫৭ অং।

তথাচ মাৎস্যে—

নাসিকাদ্যাশ্চ যে চান্যে যে চৈবান্তর নর্ম্মদাঃ।
ভানুকচ্ছাঃ সমাহেয়াঃ সহ সারস্বতৈস্তথা॥"

শ, ক, দ্রু, উদ্ধৃত মৎস্য পু, বচন।

এস্থলে লিপিকরপ্রমাদ বশতঃ "ভারুকচ্ছ" স্থানে "ভানুকচ্ছ" হইয়াছে। ভরুকচ্ছের অধিবাসিগণ "ভারুকচ্ছাঃ" নামে পরিচিত। ভরুকচ্ছের (২) বর্ত্তমান নাম বরোচ শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে তৈলঙ্গ ও মহারাষ্ট্রের সহিত কোলাপুরেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—

১। অশোকের রাজ্যকালে "মহারাষ্ট্র" (মহারাষ্ঠ), "অপরান্ত" ও "বনবাসী, এই প্রদেশত্রয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণ গমন করিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন।

২। খৃঃ ১ম শতাব্দীর প্রস্তরলিপিতে ও পেরিপ্লুসের গ্রন্থে "ভরুকচ্ছ" বা ভরোচের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তৎকালে ভরোচ বাণিজ্যের জন্য অতি প্রসিদ্ধ ছিল।

"মার্জ্জারতীর্থং রাজেন্দ্র ! কোলাপুরনিবাসিনী।
তাবদ্দেশো মহারাষ্ট্রং কর্ণাট স্বামিগোচরঃ॥"
"শ্রীশৈলস্তু সমারভ্য চোলেশান্ মধ্যভাগতঃ।
তৈলঙ্গ দেশো দেবেশি ! ধ্যানাধ্যয়নতৎপরঃ॥"

কঙ্কণের উল্লেখও আছে।

"সমুদ্রপ্রান্তদেশোহি কঙ্কণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

শ, ক, দ্রু, উদ্ধৃত শ, স তন্ত্র বচন ৭ম পটল।

অন্যান্য পুরাণ হইতেও এইরূপ বিবিধ বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু পুরাণ ও তন্ত্রাদি গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়; এই নিমিত্ত সে সকল গ্রন্থ হইতে আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করা আবশ্যক বিবেচনা করে না। (১)

ভূমধ্য সাগরে।

(য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী।)

৩১ আগষ্ট। আজ রবিবার। প্রাতঃকালে উঠে উপরের ডেকে চৌকিতে বসে' সমুদ্রের বায়ু সেবন করচি, এমন সময় নীচের ডেকে খৃষ্টানদের উপাসনা আরম্ভ হল। যদিও জানি এদের মধ্যে অনেকেই শুষ্কভাবে অভ্যস্ত মন্ত্র আউড়ে কলটেপা

১। ভ্রম সংশোধন—সাধনা ৩০৫ পৃঃ "অগস্ত্য বরগার" স্থলে "অগস্ত্য বরলার" হইবে। ৩১০ পৃঃ পাদটীকার ৩ পং পর "রঘুবংশ ৪।৫৮" হইবে। ৩১২ পৃঃ পাদটীকার ৫পং পর "ত, বো, প, ২য় কল্প ১ম ভাগ ৫৬ সংখ্যা দেখ।" হইবে। ২২৯পৃঃ ১পং "অধিবাসিত" স্থলে "অধ্যুষিত" হইবে।

লেখক।

আর্গিনের মত গান গেয়ে যাচ্ছিল—কিন্তু তবু এই যে দৃশ্য—এই যে গুটিকতক চঞ্চল ছোট ছোট মনুষ্য অপার সমুদ্রের মাঝখানে স্থির বিনম্রভাবে দাঁড়িয়ে গম্ভীর সমবেত কণ্ঠে এক চির-অজ্ঞাত অনন্ত রহস্যের প্রতি ক্ষুদ্র মানবহৃদয়ের ভক্তি উপহার প্রেরণ করচে, এ অতি আশ্চর্য্য।

কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ এক একবার অট্টহাস্য শোনা যাচ্চে। গতরাত্রের সেই ডিনার টেবিলের নায়িকাটি উপাসনায় যোগ না দিয়ে উপরের ডেকে বসে' তাঁরি একটি উপাসক যুবকের সঙ্গে কৌতুকালাপে নিমগ্ন আছেন। মাঝে মাঝে উচ্চ হাস্য করে' উঠ্‌চেন, আবার মাঝে মাঝে গুন্‌গুন্‌ স্বরে ধর্ম্মসঙ্গীতেও যোগ দিচ্চেন। আমার মনে হ'ল সরল ভক্তমণ্ডলীর মাঝখানে সয়তান পেটিকোট পরে' এসে মানবের উপাসনাকে পরিহাস করচে।

আজ আহারের সময় একটি নূতন সংবাদের সৃষ্টি করা গেছে। ছোট টেবিলটিতে আমরা তিন জনে ব্রেক্‌ফাষ্ট খেতে বসেছি। একটা শক্ত গোলাকার রুটির উপরে ছুরি চালনা কর্‌তে গিয়ে ছুরিটা সবলে পিছ্‌লে আমার বাম হাতের দুই আঙুলের উপর এসে পড়্‌ল। রক্ত চারদিকে ছিট্‌কে পড়ে' গেল। তৎক্ষণাৎ আহারে ভঙ্গ দিয়ে ক্যাবিনে পলায়ন করলুম। মনে এই আক্ষেপ হ'তে লাগল, এতখানি রক্তের অনর্থক অপব্যয় হল, অথচ স্বদেশ যেমন ছিল তেম্‌নি রইল, সাধারণ মানবেরও অবস্থার কোন উন্নতি হ'ল না, মাঝের থেকে এই ঘটনাটা যদি বাড়িতে ঘট্‌ত তা' হ'লে যে পরিমাণ স্নেহ শুশ্রূষা এবং ছিন্ন অঞ্চলখণ্ড আহত অঙ্গুলির চতুর্দ্দিকে আকৃষ্ট হ'ত অদৃষ্টে তাও জুট্‌ল না। ইতিহাসে অনেক রক্তপাত লিপিবদ্ধ হয়েচে—আমার ডায়ারিতে আমার এই রক্তপাত লিখে রাখ্‌লুম;—ভাবী বঙ্গবীরদের কাছে গৌরবের

প্রার্থী নই, বর্ত্তমান বঙ্গাঙ্গনাদের মধ্যে কেউ যদি একবার "আহা" বলেন!

১ সেপ্টেম্বর। সন্ধ্যার পর আহারান্তে উপরের ডেকে আমাদের যথাস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল। মৃদু শীতল বায়ুতে আমার বন্ধু ঘুমিয়ে পড়েচেন এবং দাদা অলসভাবে ধূমসেবন করচেন, এমন সময়ে নীচের ডেকে নাচের বাজনা বেজে উঠল। সকলে মিলে জুড়ি জুড়ি ঘূর্ণনৃত্য আরম্ভ হল।

তখন পূর্ব্বদিকে নব কৃষ্ণপক্ষের পূর্ণপ্রায় চন্দ্র ধীরে ধীরে উদয় হচ্চে। এই তীররেখাশূন্য জলময় মহামরুর পূর্ব্বসীমান্তে চন্দ্রের পাণ্ডুর কিরণ পড়ে' একটা অনাদি অনন্ত বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে' উঠেছে। চাঁদের উদয়পথের ঠিক নীচে থেকে আমাদের জাহাজ পর্য্যন্ত অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে প্রশস্ত দীর্ঘ আলোকপথ ঝিক্‌ঝিক্ করচে। জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যা কোন এক অলৌকিক বৃন্তের উপরে অপূর্ব্ব শুভ্র রজনীগন্ধার মত আপন প্রশান্ত সৌন্দর্য্যে নিঃশব্দে চতুর্দ্দিকে প্রস্ফুটিত হয়ে' উঠ্‌চে। আর মানুষগুলো পরস্পরকে জড়াজড়ি করে' ধরে' পাগলের মত তীব্র আমোদে ঘুরপাক্ খাচ্চে, হাঁপাচ্চে, উত্তপ্ত হয়ে' উঠচে, সর্ব্বাঙ্গের রক্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে' মাথার মধ্যে ঘুরচে, বিশ্বজগৎ আদি সৃষ্টিকালের বাষ্পচক্রের মত চারিদিকে প্রবল বেগে আবর্ত্তিত হচ্চে। আশ্চর্য্য কাণ্ড! লোক-লোকান্তরের নক্ষত্র স্থিরভাবে চেয়ে রয়েচে এবং দূরদূরান্তরের তরঙ্গ ম্লান চন্দ্রালোকে গম্ভীর সমস্বরে অনন্তকালের পুরাতন সামগাথা গান করচে। এই রজনীতে, এই আকাশের নীচে এবং এই সমুদ্রের উপরে কতকগুলি পরিচিত অপরিচিত নরনারী জুড়িজুড়ি জড়াজড়ি করে' লাঠিমের মত অর্থহীন অন্ধবেগে ঘুর খাওয়াকে খুব একটা সুখ মনে করচে। একটু লজ্জা

নেই, সংযম নেই, চিন্তা নেই, পরস্পরের মধ্যে একটা শোভন অন্তরাল নেই। আমার কাছে এই উন্মত্ত বর্ব্বরতা লেশমাত্র সুন্দর ঠেকে না। লজ্জা কি কেবলমাত্র কৃত্রিম নিয়ম! অনাত্মীয় স্ত্রীপুরুষ অকস্মাৎ ঘনিষ্ঠ বাহুবন্ধনে মুখে মুখে বক্ষে বক্ষে সম্বদ্ধ হ'তে কি একটা স্বাভাবিক আন্তরিক সুগভীর সঙ্কোচ অনুভব করে না! এমন কি, যে দেশে অসভ্যেরা বস্ত্রমাত্র পরে না সে দেশেও কি এই আদিম লজ্জাটুকু, প্রেমনীতির এই প্রথম অঙ্কুর-টুকুও নেই!

২ সেপ্টেম্বর। সকালে ডেকে বেড়াবার সময় একটি ইংরাজ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বহুক্ষণ আলাপ হ'ল। ইনি ভারত রাজ-মন্ত্রণার একটি প্রধান আসন অধিকার করেন। প্রথমে য়ুরোপের সমাজসমস্যা সম্বন্ধে আমি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলুম, তার কতক কতক আমার ভূমিকাতে ব্যক্ত করা গেছে। সাহেব জনসংখ্যাবৃদ্ধি বশতঃ বেহার প্রভৃতি দরিদ্র দেশের ভাবী আশঙ্কা এবং কুলীচালান সম্বন্ধে বাঙ্গালী কাগজের অনভিজ্ঞ চীৎকারের কথা বল্লেন; এবং দেশের ঐতিহাসিক প্রকৃতি আলোচনা করে' ভারতবর্ষে প্রতিনিধিতন্ত্র প্রচার সম্বন্ধে দৃঢ় আপত্তি প্রকাশ করলেন। আমি বল্লুম, দেখ সাহেব, প্রতিনিধিতন্ত্রের জন্য যে আমরা আন্তরিক লালায়িত এরূপ কোন লক্ষণ দেখা যায় না; আসল কথা তোমরা সর্ব্বদা আমাদের প্রতি প্রকাশ্য ঔদ্ধত্য এবং অবজ্ঞা দেখিয়ে থাক সেইটেই আমাদের শিক্ষিত লোকদের পক্ষে অসহ্য। অন্তরের মধ্যে সেই অপমান অনুভব করি ব'লেই আমরা জাতীয় আত্মসম্মান রক্ষা করবার জন্যে আজ এত চেষ্টা করচি। নইলে, তোমাদের জাতের স্বভাবটা যদি একটু নরম হ'ত, আমরা যদি তোমাদের কাছ থেকে যথার্থ

ভদ্রতা, কথঞ্চিৎ সম্মান ও মনুষ্যোচিত সদয় ব্যবহার পেতুম তা হলে আমাদের শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে থেকে এরকম বেদনার স্বর শুন্‌তে পেতে না। আমাদের দেশের বর্ত্তমান প্রধান দুর্দ্দশা হচ্চে এই যে, যারা আমাদের আন্তরিক ঘৃণা করে তারাই আমাদের বলপূর্ব্বক উপকার করতে আসে। যারা আমাদের মানুষ জ্ঞান করে না, তারাই আমাদের শান্তি রক্ষা করে, লেখাপড়া শেখায়, সুবিচার করবার চেষ্টা করে। প্রতিদিন এরকম অবজ্ঞার দান গ্রহণ করতে বাধ্য হলে আমাদের আত্মসম্মান আর থাকে না। স্নেহের দানে হীনতা নেই। স্নেহের সম্পর্কে সহস্র অবিচার থাক্‌তে পারে কিন্তু অপমান নেই। ধনীগৃহের একটি অনাদৃত উপেক্ষিত আশ্রিতের মত আমরা পাকা কোঠায় থাকি, উদ্বৃত্ত পরমান্ন খাই, সুখ বিস্তর আছে কিন্তু হীনতার আর সীমা নেই; সে কেবলমাত্র আন্তরিক প্রীতিবন্ধনের অভাবে।

৩ সেপ্টেম্বর। আজ সকালেও সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার অনেক কথা হল। তিনি লর্ড ডাফারিনের বিদায়কালে তাঁর প্রতি বাঙ্গালী দেশহিতৈষীদের রূঢ় আচরণের অনেক নিন্দাবাদ করলেন।

বেলা দশটার সময় সুয়েজখালের প্রবেশমুখে এসে জাহাজ থাম্‌ল। চারিদিকে চমৎকার রঙের খেলা। পাহাড়ের উপর রৌদ্র, ছায়া এবং নীল বাষ্প। ঘননীল সমুদ্রের প্রান্তে বালুকাতীরের রৌদ্রদুঃসহ গাঢ় পীত রেখা।

খালের মধ্যে দিয়ে জাহাজ সমস্ত দিন অতি ধীরগতিতে চল্‌চে। দু'ধারে তরুহীন বালি। কেবল মাঝে মাঝে এক একটি ছোট ছোট কোটাঘর বহুযত্নবর্দ্ধিত গুটিকতক গাছেপালায় বেষ্টিত হয়ে বড় আরামজনক দেখাচ্চে।

অনেক রাতে আধখানা চাঁদ উঠ্‌ল। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে দুই তীর অস্পষ্ট ধূধূ করচে।—রাত দুটো তিনটের সময় জাহাজ পোর্ট্‌ সৈয়েদে নোঙর করলে।

৪ সেপ্টেম্বর। এখন আমরা ভূমধ্যসাগরে, য়ুরোপের অধিকারের মধ্যে। বাতাসও শীতল হয়ে' এসেচে, সমুদ্রও গাঢ়তর নীল। আজ রাত্রে আর ডেকের উপর শোওয়া হল না।

৫ সেপ্টেম্বর। বিকালের দিকে ক্রীট্‌ দ্বীপের তটপর্ব্বত দেখা দিয়েছিল। ডেকের উপর একটা ষ্টেজ্‌ বাঁধা হচ্চে। জাহাজে একদল নাট্যব্যবসায়ী যাত্রী আছে তারা অভিনয় করবে। অন্যদিনের চেয়ে সকাল সকাল ডিনার খেয়ে নিয়ে তামাসা আরম্ভ হ'ল। প্রথমে জাহাজে অব্যবসায়ী যাত্রীর মধ্যে যাঁরা গানবাজনা কিঞ্চিৎ জানেন এবং জানেন না, তাঁদের কারো বা দুর্ব্বল পিয়ানো টিংটিং কারো বা মৃদু ক্ষীণকণ্ঠে গান হল। তার পরে যবনিকা উদ্‌ঘাটন করে' নট নটী কর্তৃক "ব্যালে" নাচ, সং নিগ্রোর গান, যাদু, প্রহসন অভিনয় প্রভৃতি বিবধ কৌতুক হয়েছিল। মধ্যে নাবিকাশ্রমের জন্যে দর্শকদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ হল।

৬ সেপ্টম্বর। খাবার ঘরে খোলা জান্‌লার কাছে বসে' বাড়িতে চিঠি লিখ্‌চি। একবার মুখ তুলে বামে চেয়ে দেখ্‌লুম "আয়োনিয়ান্‌" দ্বীপ দেখা দিয়েচে। পাহাড়ের কোলের মধ্যে সমুদ্রের ঠিক ধারেই মনুষ্যরচিত ঘনসন্নিবিষ্ট একটি শ্বেত মৌচাকের মত দেখা যাচ্চে। এইটি হচ্চে জান্তিসহর (Zanthe)। দূর থেকে মনে হচ্চে যেন পর্ব্বতটা তার প্রকাণ্ড করপুটে কতকগুলো শ্বেত পুষ্প নিয়ে সমুদ্রকে অঞ্জলি দেবার উপক্রম করচে।

ডেকের উপর উঠে দেখি আমরা দুই শৈলশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে সঙ্কীর্ণ সমুদ্রপথে চলেছি। আকাশে মেঘ করে' এসেছে,

বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, ঝড়ের সম্ভাবনা। আমাদের সর্ব্বোচ্চ ডেকের চাঁদোয়া খুলে ফেলে দিলে। পর্ব্বতের উপর অত্যন্ত নিবিড় মেঘ নেমে এসেছে; কেবল দূরে এক্‌টিমাত্র পাহাড়ের উপর মেঘছিদ্রমুক্ত সন্ধ্যালোকের একটি দীর্ঘ রক্তবর্ণ ইঙ্গিত-অঙ্গুলি এসে স্পর্শ করেছে, অন্য সবগুলো আসন্ন ঝটিকার ছায়ায় আচ্ছন্ন। কিন্তু ঝড় এল না। একটু প্রবল বাতাস এবং সবেগ বৃষ্টির উপর দিয়েই সমস্ত কেটে গেল। ভূমধ্যসাগরে আকাশের অবস্থা অত্যন্ত অনিশ্চিত। শুন্‌লুম, আমরা যে পথ দিয়ে যাচ্চি এখান দিয়ে জাহাজ সচরাচর যায় না। জায়গাটা নাকি ভারি ঝোড়ো।

রাত্রে ডিনারের পর যাত্রীরা কাপ্তেনের স্বাস্থ্যপান এবং গুণগান করলে। কাল ব্রিন্দিশি পৌঁছব। জিনিষপত্র বাঁধ্‌তে হবে।

সাহিত্যের সত্য।

(পত্রোত্তর)

তুমি দেখ্‌ছি সাহিত্যকে লেখকের দিক থেকে দেখ্‌ছ। তোমার মতে সাহিত্য হচ্চে লেখকের আত্মপ্রকাশ। তা হলে শেক্সপিয়রের নাটক কি সাহিত্য নয়? শেক্সপিয়রের নাটকে শেক্সপিয়রের নিজত্ব কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না; হ্যাম্‌লেট্‌ পড়ে' আমরা শেক্সপিয়রকে দেখতে পাই না—খালি হ্যাম্‌লেট্‌কেই সম্পূর্ণ রকমে দেখতে পাই। আমি বলি সাহিত্য পাঠকের আত্ম-উপলব্ধির একটা উপায়—লেখকের আত্মপ্রকাশ তাতে থাক্

বা নাই থাক্। যে পরিমাণে আমরা আপনার মধ্যে হ্যাম্‌লেটের হ্যাম্‌লেটত্ব অনুভব করতে পারি, আর হ্যাম্‌লেটের মধ্যে আপনাকে স্থাপন করতে পারি, সেই পরিমাণে হ্যাম্‌লেট-নাটক সাহিত্য। এ কথাটা খালি নাট্য-কাব্য সম্বন্ধে নয়, গীতি-কাব্য সম্বন্ধেও সম্পূর্ণভাবে সত্য। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতি-কাব্যে আমাদের নিজের নিজত্ব জেগে ওঠে—আমরা নিজের হৃদয়ের কথা শুনি, আর সেই জন্যই ভাল লাগে।

যারা কবিতাতে নিজের নিজত্ব অনুভব করে না, যারা নিজের কথা শুনতে পায় না, খালি কবির কথাই শোনে, তাদের কবিতা যথার্থ কতদূর ভাল লাগে সে বিষয়ে আমার খুবই সন্দেহ।

কবি লেখ্‌বার সময় তাঁর লেখাতে খানিকটা আত্মপ্রকাশ করলেও করতে পারেন বটে—কিন্তু পাঠক সেই কবিতাতে নিজেরই নিজত্ব দেখে—কবির নিজত্ব দেখে না। কবি নিজের নিজত্ব না দিলে হয়ত এ ফল হ'ত না, কিন্তু সে কবিতা গড়বার একটা প্রণালী মাত্র;—পাঠকের নিজত্ব উদ্রেক করবার সহজ উপায় মাত্র। যদি কোন কবি নিজে কিছুমাত্র অনুভব না ক'রে খালি কলের মতন এমন লিখতে পারতেন যে, পাঠক তাঁর গানে নিজের হৃদয়ের কথা শুন্‌তে পেত, তাহলে কবির নিজত্ব তাতে প্রকাশ না পেলেও সে কবিতার কবিত্ব কিছু কম্‌ত না, আর আপনার নিজত্ব সমস্ত ঢেলে দিয়েও যদি আমি অন্যের কাছে তার নিজের কথা শোনাতে না পারি তা হলে আমার কবিতা কবিতাই নয়।

যেমন আত্মপ্রকাশ কবিতা গড়বার একটা প্রণালী মাত্র, সত্য সেই রকম সাহিত্য গড়বার উপাদান মাত্র। যে কোন উপায়ে হোক্ না কেন সাহিত্যের কাজ হচ্ছে আমাদের হৃদয়ের

আবেগ—সুখ দুঃখ, ভালবাসা, ভয়, বিস্ময় ইত্যাদি উদ্রেক করা। অবশ্য সব উপায়ের মধ্যে সত্যকে উপাদান করা একটি প্রধান উপায়। সত্যকে প্রকাশ করা সাহিত্যের কাজের মধ্যে নয়; মিথ্যার দ্বারা যদি সাহিত্য তার কাজ ভাল করতে পারত তাহলে মিথ্যাকে উপাদান করতে অথবা মিথ্যা প্রকাশ করতে সাহিত্যের কোন আপত্তি থাকবার কথা নেই। তবে মিথ্যার দ্বারা কাজ চলে না। সাহিত্য সহানুভূতি দ্বারা আমাদের হৃদয়ের আবেগ উদ্রেক করে; একেবারে মিথ্যার দ্বারা সহানুভূতির উদ্রেক হয় না। সাহিত্য অনেক মিথ্যা (অর্থাৎ কল্পিত ঘটনাবলী) অবলম্বন করে' থাকে বটে, কিন্তু তার মধ্যে কতকগুলি মূল সত্য চাই; নাটকের পাত্রগণকে মানুষের মতন না করলে মনুষ্যস্বভাবের সহিত আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক হয় না। তা ছাড়া একেবারে মিথ্যা কিছুই হতে পারে না—মিথ্যাকেও সত্যের উপর নির্ভর করতে হয়। কল্পনাও আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর স্থাপিত। যা একেবারে মিথ্যা তার কোন প্রকার অস্তিত্বই নেই, সেটা কিছুই নয়। যার কোনপ্রকার অস্তিত্ব নাই তার দ্বারা সাহিত্য কেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও কিছুই করতে পারেন না। যেমন সব জিনিষ তেমনি সাহিত্যেরও সত্যের ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়া চাই।

এ ছাড়া সাহিত্যের সঙ্গে সত্যের অন্য কোন সম্বন্ধ থাকার দরকার নেই। সত্যকে কিম্বা সত্যের কোন আকারকে (মিথ্যা কিম্বা কল্পনা সত্যের একটি আকার মাত্র) এ রকম ভাবে উপস্থিত করা আবশ্যক যাতে করে' মনুষ্যহৃদয়ে সুখ, দুঃখ, ভালবাসা ইত্যাদি ভাবের উদয় হয়। সাহিত্যের কাজই হচ্ছে হাতের কাছে যাই থাকনা কেন—সত্যই হোক আর কল্পনাই হোক—তাকে এমন

করে' সাজান যাতে আমাদের মনে কতকগুলি বিশেষ ভাব জেগে ওঠে। সাহিত্য জগতের দর্জ্জি আর স্বর্ণকার।

তবে সব জিনিষকে এরকম ভাবে সাজান যায় না। পৃথিবীতে কোন কোন এমন কুৎসিৎ স্ত্রীলোক আছে যারা সহস্র সাজসজ্জা সত্বেও স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ত্তব্য—সৌন্দর্য্যভাবের উদ্রেক—সাধন করতে পারে না। প্যারিসের বড় দর্জি ওয়ার্থ্ কোন কোন মহিলাকে এই বলে' ফিরিয়ে দেয়—"তোমার শরীরের গঠন ভাল নয়, আমি তোমার জন্য কাপড় তৈরি করতে পারব না।" সাহিত্যও সেই রকম বেছে নেয়, কাকে সাজসজ্জা করিয়ে মনুষ্য-হৃদয়ের সম্মুখে উপস্থিত করবে আর কাকেই বা সাজসজ্জার অনুপযোগী বলে' ফিরিয়ে দেবে।

সত্যকে কিন্তু কি রকম করে' যে "নিজের" করবে, "নিজের জীবন দিয়ে মণ্ডিত করে' প্রকাশ করবে" আমি বুঝতে পারছিনে। একটা বিশেষ সত্য বুঝতে পারি কিন্তু অ্যাব্‌ষ্ট্রাক্ট্ সত্যের মানে বুঝতে পারিনে। একটা কোন বিশেষ সত্যের মধ্যে নিজের নিজত্ব দেওয়ার মানে কি? একটা ত্রিকোণের দুই বাহু সমান হলে তার দুই কোণও সমান হবে এই সত্য "নিজের" করা কিম্বা "নিজের জীবন দিয়ে মণ্ডিত করা" অর্থ-হীন। সত্য আত্মবহির্ভূত—"তাকে এমন করে' ধরা যাতে লোকে অবিলম্বে জানতে পারবে যে আমারই বিশেষ মন থেকে দেখা দিচ্ছে" অসম্ভব; আর যদিই বা পারতুম ত তাতে কোনই লাভ দেখিনে। নিজের মন থেকেই দেখা দিক্ আর "স্বয়ম্ভূ"ই হোক্ তার যা কাজ তাই করলেই হোল।

বিজ্ঞানে আর সাহিত্যে প্রভেদ এই যে, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সত্য প্রচার করা, আর সাহিত্যের উদ্দেশ্য হৃদয়ের আবেগ

উদ্রেক করা। এক হিসাবে বিজ্ঞানের সঙ্গে ম্যাপের আর সাহিত্যের সঙ্গে ছবির তুলনা দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু ভেবে দেখ ম্যাপও সম্পূর্ণ সত্য নয়, ছবিও সম্পূর্ণ সত্য নয়; দুই আংশিক সত্য মাত্র। প্রত্যেক জিনিষের নানান্ দিক আছে—একেবারে সমস্ত দিক দেখা অসম্ভব বলে' বিজ্ঞান তাকে খণ্ড খণ্ড করে' এক এক অংশ আলাদা আলাদা করে' দেখে। এই হিসাবে বিজ্ঞান ম্যাপ্। ছবিও সম্পূর্ণ সত্য নয়। ছবি হচ্ছে খালি বাহ্য আকৃতি চোখে যা দেখা যায়; তা সব সময়ে সত্য নয়, অনেক সময়ে মিথ্যা, আর কোনও সময়ে সম্পূর্ণ সত্য নয়। তবে ছবিতে আমাদের হৃদয়ের আবেগ উদ্রেক করে বলেই ছবির সঙ্গে সাহিত্যের তুলনা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যখন ছবির উদ্দেশ্য সত্য প্রচার করা—হৃদয়ের আবেগ উদ্রেক করা নয়, তখন ছবিকে সাহিত্য না বলে' বিজ্ঞানই বলা উচিত। যখন আমরা জ্ঞানলাভের জন্য ডাক্তারি বইয়ে ডাক্তারি ছবি দেখি তখন সে ছবি সাহিত্যের নয় বিজ্ঞানের।

অন্যান্য আর্টেরও যা কাজ সাহিত্যের তাই কাজ, কেন না সাহিত্য আর্টের মধ্যে গণ্য। সঙ্গীত শব্দ দ্বারা চিত্রবিদ্যা রঙের দ্বারা আর ভাস্কর বিদ্যা প্রস্তর দ্বারা যা করে সাহিত্য ভাষা দ্বারা তাই করে। আমরা সঙ্গীতের মধ্যে সত্যকে জোর করে' স্থাপন করতে চেষ্টা করিনে—আর চেষ্টা করার কোন মানে নেই।

ভাষা দ্বারা আমরা অনেক অন্য কাজ করে' থাকি বলেই সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করা এক এক সময়ে কঠিন হয়ে ওঠে। আমরা যদি সা রে গা মা দিয়ে অঙ্ক কষতুম তাহলে সঙ্গীতের আর অঙ্কবিদ্যার মধ্যে সীমা নির্ণয় করবার জন্য কমিশন বসাতে হ'ত।

ভাষা সাহিত্যের বাহন বলে, ভাষার দ্বারা আমরা আর যা কিছু করি তার মধ্যে একএক সময়ে সাহিত্যের আভাস ফেল্‌তে পারি। ইতিহাস বিজ্ঞানেও অনেক সময়ে আমরা সাহিত্য মেশাই। ইংরাজি ম্যাগাজিন্‌ সম্বন্ধে তুমি যে আপত্তি করেছ তা কেবল ম্যাগাজিনের লেখাগুলোকে সাহিত্য হিসাবে দেখলেই খাটে। ইংরাজি ম্যাগাজিনের আর্টিকেলগুলো কিন্তু অমিশ্র সাহিত্য নয়। তাদের ম্যাগাজিন্‌গুলো তাদের জীবনের দৈনিক কাজের জন্য। তাদের এক একটা কথা বলা চাই, তারই মধ্যে যতটুকু সাহিত্যভাব মেশাতে পারে ততটুকুই লাভ। আমাদের ম্যাগাজিনে সাহিত্যভাবটা বেশি ফুটিয়ে তোলা দরকার, কেননা প্রথমতঃ আমাদের বলবার কথা কম আর দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেশে সাহিত্যচ্ছলে বিজ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক, যেমন ছেলেদের মিষ্টান্নের ভিতর ওষুধ পুরে খাওয়ান।

... ...

সংগ্রহ।

শেরিডান কোন সময়ে এক ভাড়াগাড়ী করিয়া কোথাও যাইতেছিলেন। তিন চারি ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়াছে, গাড়ীর ভাড়াও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এমন সময়ে দেখিলেন যে তাঁহার বন্ধু রিচার্ডসন্‌ রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছেন। শেরিডান সাদর আহ্বানে তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া এমন এক বিষয়ে তর্ক আরম্ভ করিয়া দিলেন যে বিষয়ে উভয়ের গুরুতর মতভেদ। তর্কের আগুন যখন খুব জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখন শেরিডান কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "বাস্তবিক

তোমার এ সব কথা আমার সহ্য হয় না—যাও তোমার সঙ্গে আমি আর তর্ক করতে চাইনে।” এই বলিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। গাড়ী চলিতেছে, রিচার্ডসন্ আপনাকে জয়ী ভাবিয়া সানন্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন “কেমন হেরে গেলে, কেমন হেরে গেলে।” কিয়ৎক্ষণ পরে রিচার্ডসনের উষ্ণ মস্তিষ্ক যখন একটু শীতল হইয়া আসিল এবং শেরিডানের চারি ঘণ্টার ভাড়া শুদ্ধ তাঁহাকে দিতে হইল, তখন কে কাহাকে হারাইয়াছে তিনি বেশ অনুভব করিতে পারিলেন।

পার্থশায়ারের একজন দরিদ্র কৃষকপত্নী তাহার স্বামী ও তাহার একটি গরুর এক সময়ে অসুখ হওয়াতে ডাক্তারের নিকট হইতে দুইটি ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লইয়া কোন এক ঔষধালয়ে গমন করে। ঔষধদাতা দেখিল যে, তাহার নিকটে যে টাকা আছে তাহাতে সে কেবল একটি মাত্র ঔষধ কিনিতে পারে। এই কথা কৃষকপত্নীকে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এখন তুমি তোমার স্বামীর জন্য ঔষধ চাও না তোমার গরুর জন্য?” কৃষকপত্নী উত্তর করিল “আমি আমার গরুর জন্য ঔষধ চাই, কারণ, স্বামী মরিলে শীঘ্রই আর একটা স্বামী পাইব কিন্তু গরু মরিলে আর একটা গরু শীঘ্র মিলিবে না।”

পিতামাতাকে হত্যা করার অপরাধে কোন লোকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। দণ্ডের অনতিপূর্ব্বে তাহার যাহা বক্তব্য আছে তাহা বলিবার অনুমতি পাইলে সে বলিল “আমার পিতামাতা কেহ নাই, আমি অনাথ; আমার বিষয়ে আপনারা একটু দয়া করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন।”

এক বৃদ্ধের একটি ভৃত্যের আবশ্যক হয়। অনেক অনুসন্ধানের পর কোথাও ভৃত্য না পাইয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের একটি ভৃত্য ছিল তাহাকেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। যে দিন নূতন ভৃত্যটি বৃদ্ধের নিকটে আসিল সে দিন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অনুক্রম সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞান আছে কি না। ভৃত্যটি এই মস্ত কথা শুনিয়া একটু ভীত হইয়া বলিল "মশায়, অনুক্রম জিনিষটা কি বুঝাইয়া দিলে, তার পর যা হয় একটা উত্তর দিতে পারি।" বৃদ্ধ বলিলেন 'অনুক্রম জিনিষটা বিশেষ কিছু নয়। এই মনে কর তোমাকে যদি টেবিলে চাদর পাততে বলি তাহ'লে আনুক্রমিক কাঁটা ছুরি চামচ প্লেট সব ঠিক ক'রে রাখতে হবে।" ভৃত্য বলিল "এই বই ত নয়—এ আমি বেশ পারব।"

এক দিন বৃদ্ধের অসুখ করিয়াছে। প্রাতঃকালে ভৃত্যকে যথাসত্বর একজন সেবিকাকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। সমস্ত দিন ভৃত্যের আর দেখা নাই। রাত্রি যখন অর্দ্ধেক তখন সে বাড়ী ফিরিল। বৃদ্ধের নিকটে আসিলে পর বৃদ্ধ অকথ্য উচ্চারণে তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। ভৃত্য চুপ করিয়া সব শুনিল, পরে যখন বৃদ্ধের রাগ পড়িয়া গেল তখন সে বলিতে আরম্ভ করিল "অনেক কষ্টে একজন সেবিকা যোগাড় করিয়াছি, সে নীচে আছে এবং আনুক্রমিক একজন ডাক্তার, একজন অস্ত্রচিকিৎসক ও একজন মুদ্দফরাসকেও ডাকিয়া আনিয়াছি। তাহারা ব্যগ্র হইয়া আপনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। ভৃত্যের বুদ্ধির বেগ দেখিয়া বৃদ্ধ একজন উকিল ডাকিয়া দানপত্রে তাহার নামে প্রভূত সম্পত্তি লিখিয়া দিলেন।

মিল্টন যখন অন্ধ হন তখন তিনি একটি মুখরা রমণীকে বিবাহ করেন। ডিউক অব বকিংহাম একদিন গোলাপফুলের সঙ্গে এই স্ত্রীলোকটির তুলনা করেন। মিল্টন শুনিয়া বলিলেন "আমি অন্ধ, আমার স্ত্রী গোলাপফুল কি না ঠিক বল্‌তে পারিনে; তবে হতেও পারে, কারণ, কাঁটার জ্বালাটা আমাকে রোজই ভোগ করতে হয়।"

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। মাঘ। "আলোক কি অন্ধকার?" সম্পূর্ণ অন্ধকার। এবং এরূপ লেখায় সে অন্ধকার দূর হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কি করিলে ভারতবর্ষে জাতীয় জীবন সংঘটন হইতে পারিবে লেখক তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় আর ধর্ম্ম নাই, এমন কল্পবৃক্ষ আর জন্মিবে না—যাঁহার যে প্রকার ধ্যান ধারণার শক্তি তিনি সেই প্রকারেই সাধনা করিতে পারেন; এমন ধর্ম্ম আর কোথায়? ছিন্ন ভিন্ন ভারতকে আবার যদি কেহ এক করিতে পারে, আবার যদি কেহ ভারতকে উন্নত করিয়া তাহার শরীরে হৈমমুকুট পরাইতে পারে, তবে সে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম।" লেখক মনে করিতেছেন কথাটা সমস্ত পরিষ্কার হইয়া গেল এবং আজ হইতে তাঁহার পাঠকেরা কেবল কল্পবৃক্ষের হাওয়া খাইয়া ভারতের "শরীরে হৈমমুকুট" পরাইতে থাকিবে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। হিন্দুধর্ম্ম কি? তাহা কবে ভারতবর্ষে ছিল না? তাহা কবেই বা ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেল? তাহাকে

আবার কোথা হইতে আনিতে হইবে এবং কোন্ "অবতার" আনিবেন? যাঁহার যেরূপ শক্তি তিনি তদনুসারেই সাধনা করিতে পারিবেন এমন বহুরূপী ধর্ম্মের মধ্যে ঐক্যবন্ধন কোন্ খানে? এবং এই হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবে আদিম বৈদিক সময়ের পরে কোন্ কালে ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্য ছিল?

"সাঁওতালের শ্রাদ্ধ প্রণালী" লেখাটি কৌতূহল-জনক। "জাতীয় একতা" প্রবন্ধে লেখক কৌতুক করিতে-ছেন কি জ্ঞান দান করিতেছেন সহসা বুঝা দুঃসাধ্য; এই পর্য্যন্ত বলা যায় দুইটির মধ্যে কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় নাই।

"দোকানদারী।" বঙ্গসাহিত্যে এই ধরণের অশ্রু-গদ্‌গদ সানুনাসিক প্রলাপোক্তি উত্তরোত্তর অসহ্য হইয়া উঠি-তেছে। কোন উচ্চ শ্রেণীর সাময়িক পত্রে এরূপ গদ্যপ্রবন্ধ কেন স্থান প্রাপ্ত হয় বুঝা কঠিন।

সাহিত্য। ফাল্গুন। "সোম।" এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে লেখক মহাশয় বেদ হইতে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতেছেন বেদে সোম বলিতে ঈশ্বরপ্রেম বুঝায়। সোম বলিতে ঈশ্বরপ্রেম রূপকভাবে বুঝাইত, না তাহার প্রকৃত অর্থই এই, লেখক মহাশয় কোথাও তাহার আলোচনা করি-য়াছেন বলিয়া মনে পড়িতেছে না। সুরাপানের আনন্দের সহিত ঈশ্বর প্রেমানন্দের তুলনা অন্যত্রও পাওয়া যায়, হাফে-জের কবিতা তাহার দৃষ্টান্তস্থল। রামপ্রসাদের কোন গানেও তিনি সুরাকে আধ্যাত্মিক ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, তান্ত্রিকেরা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক

সুরাই সেবন করিয়া থাকেন। যাহা হউক্, এখনো আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ মোচন হয় নাই।

"আহার।" শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় বলেন "আমাদের মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা আহারকে ধর্ম্মের অন্তর্গত করিয়া গিয়াছেন।" এই ভাবের কথা আমরা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি না। অনেকেই গৌরব করিয়া থাকেন আমাদের আহার ব্যবহার সমস্তই ধর্ম্মের অন্তর্ভূত—কিন্তু এখানে ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায়? যদি বল ধর্ম্মের অর্থ কর্ত্তব্যজ্ঞান, মানুষের পক্ষে যাহা ভাল তাহাই তাহার কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম এই কথা বলে, তবে, জিজ্ঞাসা করি সে কথা কোন্ দেশে অবিদিত! শরীর সুস্থ রাখা যে, মানুষের কর্ত্তব্য, যাহাতে তাহার কল্যাণ হয় তাহাই তাহার অনুষ্ঠেয় এ কথা কে না বলে! যদি বল, এস্থলে ধর্ম্মের অর্থ পরলোকে দণ্ড পুরস্কারের বিধান, অর্থাৎ বিশেষ দিনে বিশেষ ভাবে বিশেষ আহার করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হইবে এবং না করিলে চতুর্দ্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবে, ধর্ম্ম এই কথা বলে, তবে সেটাকে সত্য ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কোন এক মহাজ্ঞানী সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকার লিখিয়া গিয়াছেন মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে গঙ্গাস্নান করিলে "ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ"; মানিয়া লওয়া যাক্ উক্ত ত্রয়োদশীতে নদীর জলে স্নান করিলে শরীরের স্বাস্থ্যসাধন হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে গৌরবের অংশ কোন্‌টুকু? ঐ পুরস্কারের প্রলোভনটুকু? কেবল ঐ মিথ্যা প্রলোভন সূত্রে এই স্বাস্থ্যতত্ত্ব অথবা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের নিয়মটুকুকে ধর্ম্মের সহিত গাঁথা হইয়াছে। নহিলে, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করা ভাল, এবং যাহা ভাল তাহাই কর্ত্তব্য এ কথা কোন্ দেশের লোক

জানে না? আহারের সময় পূর্ব্বমুখ করিয়া উপবেশন করিলে তাহাতে পরিপাকের সহায়তা ও তৎসঙ্গে মানসিক প্রসন্নতার বৃদ্ধি সাধন করে অতএব পূর্ব্বমুখে আহার করা ধর্ম্মবিহিত এ কথা বলিলে প্রমাণ লইয়া তর্ক উঠিতে পারে কিন্তু মূল কথাটা সম্বন্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু যদি বলা হয় পূর্ব্বমুখে আহার না করিলে অপবিত্র হইয়া ত্রিকোটিকুল-সমেত নরকে পতিত হইতে হইবে, ইহা ধর্ম্ম, অতএব ইহা পালন করিবে, তবে এ কথা লইয়া গৌরব করিতে পারি না। যাহার সত্য মিথ্যা প্রমাণের উপর নির্ভর করে, যে সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানোন্নতি সহকারে মতের পরিবর্ত্তন কিছুই অসম্ভব নহে তাহাকে কি বলিয়া ধর্ম্মনিয়মভুক্ত করা যায়? স্বাস্থ্য রক্ষা করা মানুষের কর্ত্তব্য অতএব তাহা ধর্ম্ম এ মূলনীতির কোন কালে পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে, কিন্তু কোন একটা বিশেষ উপায়ে বিশেষ দ্রব্য আহার করা ধর্ম্ম, না করা অধর্ম্ম এরূপ বিশ্বাসে গুরুতর অনিষ্টের কারণ ঘটে।

মানব নীতির দুই অংশ আছে, এক অংশ স্বতঃসিদ্ধ, এক অংশ যুক্তিসিদ্ধ।* আধুনিক সভ্য জাতিরা এই দুই অংশকে পৃথক্ করিয়া লইয়াছেন; এক অংশকে ধর্ম্মনৈতিক ও অপর অংশকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। একদিকে এই ধ্রুব শক্তি এবং অপর দিকে চঞ্চল শক্তির স্বা-তন্ত্র্যই সমাজ-জীবনের মূল নিয়ম। সকলেই জানেন, আকর্ষণ শক্তি না থাকিলে জগৎ বাষ্প হইয়া অনন্তে মিশাইয়া যাইত এবং বিপ্রকর্ষণ শক্তি না থাকিলেও বিশ্বজগৎ বিন্দুমাত্রে পরিণত

---

* এখানে আমরা তত্ত্ববিদ্যার তর্কে নামিতে চাহি না। বলা আবশ্যক, স্বতঃসিদ্ধ কিছু আছে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন না।

হইত। তেমনি অটল ধর্ম্মনীতির বন্ধন না থাকিলে সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া সমাজ-আকার ত্যাগ করে, এবং চঞ্চল লোকনীতি না থাকিলে সমাজ জড় পাষাণবৎ সংহত হইয়া যায়। আধুনিক হিন্দুসমাজে খাওয়া শোওয়া কোন বিষয়েই যুক্তির স্বাধীনতা নাই, সমস্তই এক অটল ধর্ম্মনিয়মে বদ্ধ এ কথা যদি সত্য হয় তবে ইহা আমাদের গৌরবের, আমাদের কল্যাণের বিষয় নহে। চন্দ্রনাথ বাবুও অন্যত্র এ কথা একরূপ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন "হিন্দুশাস্ত্রের নিষিদ্ধ দ্রব্যের মধ্যে কোনটি ভক্ষণ করিয়া যদি মানসিক প্রকৃতির অনিষ্ট না হয় তবে সে দ্রব্যটি ভক্ষণ করিলে তোমার হিন্দুয়ানীও নষ্ট হইবে না তোমার হিন্দু-নামেও কলঙ্ক পড়িবে না।" অর্থাৎ এ সকল বিষয় ধ্রুব ধর্ম্ম-নিয়মের অন্তর্গত নহে। ইহার কর্ত্তব্যতা প্রমাণ ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।

কিন্তু এই একটিমাত্র কথায় চন্দ্রনাথ বাবু বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের মূলে আঘাত করিতেছেন। আমি যদি বলি গোমাংস খাইলে আমার মানসিক প্রকৃতির অনিষ্ট হয় না; আমি যদি প্রমাণস্বরূপে দেখাই গোমাংসভুক্ যাজ্ঞবল্ক্য অনেক কুষ্মাণ্ডভুক্ স্মার্ত্তবাগীশের অপেক্ষা উচ্চতর মানসিক প্রকৃতিসম্পন্ন; তবে কি হিন্দুসমাজ আমাকে মাপ করিবেন? যদি কোন ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত একাসনে বসিয়া আহার করেন এবং প্রমাণ করেন তাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির কিছুমাত্র বিকার জন্মে নাই, তবে কি তাঁহার হিন্দুনামে কলঙ্ক পড়িবে না? যদি না পড়ে, এই যদি হিন্দুধর্ম্ম হয়, হিন্দুধর্ম্মে যদি মূল ধর্ম্মনীতিকে রক্ষা করিয়া আচার সম্বন্ধে স্বাধীনতা দেওয়া থাকে তবে এতক্ষণ আমরা বৃথা তর্ক করিতেছিলাম।

কাশ্মীর। এরূপ সাময়িক প্রসঙ্গ লইয়া বাঙ্গলা কাগজে প্রায়ই লেখা হয় না। তাহার কারণ, উপযুক্ত লেখক পাওয়া কঠিন। কেবল অন্ধভাবে ইংরাজী কাগজের অনুবাদ বা প্রতিবাদ করিলে সকল সময়ে সত্য পাওয়া যায় না। নগেন্দ্র বাবু কাশ্মীরের বর্ত্তমান বিপ্লব সম্বন্ধে এই যে প্রস্তাব লিখিয়াছেন ইহা কোন কাগজের প্রতিধ্বনি নহে; ইহা তিনি যেন রঙ্গভূমিতে উপস্থিত থাকিয়া লিখিয়াছেন। সমালোচ্য প্রবন্ধটি বিশেষ সমাদরণীয়।

সামাজিক রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন।

আপনাদের পত্রিকার পাঠকদিগকে প্রশ্ন করিবার অধিকার দিয়াছেন, এই জন্য সাহসী হইয়া আমার মনে যে একটি তর্ক উপস্থিত হইয়াছে তাহা মীমাংসার জন্য আপনাদের সমীপে প্রেরণ করিলাম।

শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্র বাবু তাঁহার কোন কোন বক্তৃতায় এমন ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, যে, আমাদের সমাজে আজকাল বিলাতী পক্ষ এবং দেশী পক্ষ এই দুই পক্ষ দাঁড়াইয়াছে এবং উভয় পক্ষের বিবাদে সমাজে অশান্তির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাঁহার মতে, পরস্পরের দোষাংশ বর্জ্জন করিয়া যদি গুণ-ভাগ লইয়া উভয় পক্ষ একত্র সম্মিলিত হইয়া যায় তাহা হইলেই আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক সমস্যার মীমাংসা হয়।

আমার প্রশ্ন এই, এরূপ সম্মিলন সম্ভবপর কি না? কখন

কোন জাতি কেবল মাত্র বিবেচনাশক্তির বলে দুই আত্যন্তিক-তার মধ্যরেখা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে কি না, এবং চলিতে পারে কি না?

গোলাপের কাঁটা ও সুগন্ধের ন্যায় প্রত্যেক জাতির বিশেষ গুণ ও বিশেষ দোষ একই অকাট্য কারণে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য-ভাবে সম্বদ্ধ কি না?

আমরা ইচ্ছা করিলেই কি অন্য জাতির দোষগুলি ছাড়াইয়া ফেলিয়া তাহার গুণভাগ গ্রহণ করিতে পারি? এই সমস্ত দোষ গুণ কি জল বায়ু ইতিহাস এবং অন্যান্য নানা অলক্ষ্য কারণে জীবনের সহিত মিশ্রিত হইয়া অন্তর হইতে বিকশিত হইয়া উঠে না? তাহা কি বাহির হইতে ধরিবার সামগ্রী?

জাতি সাধারণ, হয় চিরাভ্যাসক্রমে, না হয় ত কোন বিশেষ ভাবের উত্তেজনায়, না হয় ত বিশেষ কোন জাতির অনুকরণ করিয়া চলে কি না? প্রতি পদক্ষেপে দোষ গুণ এবং উভয় পক্ষ বিচার করিয়া চলা তাহার পক্ষে সম্ভব কি না?

আমাদের দক্ষিণ পদ এবং বাম পদ যেমন পরস্পর প্রতি-যোগী হইয়াও সহযোগী; চলিবার সময় আমাদের শরীরের ভার একবার দক্ষিণ পদ, একবার বাম পদের উপর ন্যস্ত করিয়া তবে ঠিক সোজা চলিতে পারি, তেমনি বিলাতী পক্ষ এবং দেশী পক্ষ উভয়ে স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ কার্য্য করিতে থাকিলে তবেই কি সমাজের পক্ষে মোটের উপর মধ্য পথ রক্ষা করিয়া চলা সম্ভব হয় না? দুই পা যদি জোড়া লাগিয়া যায় তবে কি আর চলা সম্ভব হয়?

প্রকৃতিতে চির-বসন্ত নাই, কিন্তু ছয় ঋতু গতায়াত করিয়া ঋতু-সামঞ্জস্য রক্ষা করে। তেমনি সমাজে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি

প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান হইতে চেষ্টা করে, এবং সকলেই আপনার প্রভাব সম্পূর্ণ বিস্তার করিতে গিয়া মোটের উপর একটা সামঞ্জস্য থাকিয়া যায় কি না। ইহাতেই সমাজের জীবন যৌবন এবং বল রক্ষা হয় কি না? সুবিচক্ষণ যুক্তির একাধিপত্য কি সামাজিক জরার লক্ষণ নহে?

অতএব দ্বিজেন্দ্র বাবু সামাজিক রোগের যে কবিরাজী চিকিৎসা ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে ব্যাধির অপেক্ষা বটিকা কি সাংঘাতিক হইয়া উঠিতে পারে না? এবং একটি বৃহৎ জনসমাজ কখন কি সেরূপ চিকিৎসাধীনে আসিতে পারে?

আমরা পুরাণ পাঠ করিয়া প্রাচীন আর্য্যদেরই অনুকরণ করি আর ইংরাজি পড়িয়া ইংরাজদেরই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করি, আমাদের মনের ইচ্ছা, আমাদের আদর্শের গুণগুলিই আমরা প্রাপ্ত হই। এমন জড়প্রকৃতি পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে, এ কথা যাহার বিবেচনায় উদয় হয় না যে, অনুকরণীয়ের ভালটা গ্রহণ করাই ভাল;—এ সম্বন্ধে উপদেশ নিতান্তই বাহুল্য। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় ব্যাস বশিষ্ঠ গৌতম সাজিতে গিয়া এক একটি ফোঁটাকাটা টিকিপরা বাঙ্গালী তর্কবাগীশের উদ্ভব হয়, এবং ইংরাজি বীর্য্যবল বুদ্ধির ধ্যান করিয়া কেবল কতকগুলি কালো কুর্ত্তিপরা কৃশকায় ক্ষুদ্র দাম্ভিক অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। কিন্তু শিব গড়িতে গিয়া সকল সময়ে যে শিব গড়া হয় না, সেটা কি কেবলমাত্র বিবেচনাশক্তি ও উপদেশের অভাবে? সে কি ক্ষমতার অভাবেই নহে? প্রাচীন আর্য্য অথবা আধুনিক ইংরাজ হওয়া কি বাঙ্গালীর কর্ম্ম? বাঙ্গালীর মধ্যে উভয়ের গুণের সংমিশ্রণ কি আরো অসম্ভব নহে? কারণ, মানুষের অনুকরণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু মানুষ হইতে পৃথক করিয়া

লইয়া তাহার গুণের ধ্যান করা অতি কঠিন। এই জন্য আমরা আমাদের আদর্শ মানুষের দোষ গুণ সর্ব্বসমেত অনুকরণ করিতে চেষ্টা করি কিন্তু ক্ষমতাভাবে গুণটা এড়াইয়া যায় দোষটা অতি সহজে ধরা দেয়। সামান্য বাহ্যিক লক্ষণগুলি অনুকরণের বাধ্য, কিন্তু আন্তরিক গুণগুলি স্বতন্ত্র জাতের; তাহারা শিল্প-দ্রব্য নহে, তাহারা প্রাণবিশিষ্ট। অতএব যে বেচারারা কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া অথবা ইংরাজি বুলি বিশুদ্ধভাবে উচ্চা-রণ করিয়া সান্ত্বনা ও শান্তি পায় তাহাদের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গাইয়া ফল কি?

দ্বিজেন্দ্র বাবু মোটের উপর এই কথা বলিয়াছেন যে, মহত্ত্ব সঞ্চয় কর তবেই মহৎ হইবে। কিন্তু প্রকৃত সমস্যা এই যে, কি করিয়া মহত্ত্ব সঞ্চয় করিব? যদি ইংরাজ এবং আর্য্যের গুণগুলি গ্রহণ করিবার শক্তি থাকিবে তবে কি আমাদের এমন দশা হয়? দ্বিজেন্দ্র বাবু তাঁহার কোন বক্তৃতায় চিকিৎসার উপমা গ্রহণ করিয়াছেন; আমরাও সেই উপমা অবলম্বন করিয়া আমা-দের প্রশ্নটি স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করি; একজন অজীর্ণ রোগীর কৃশ অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া যদি কোন চিকিৎসক তাহাকে পরা-মর্শ দেন যে, তুমি পশু মাংস হইতে এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে উভয়ের পুষ্টিকর অংশ গ্রহণ কয়িতে পারিলেই তোমার আর কোন ভাবনা নাই। রোগী তখন ক্ষীণকণ্ঠে এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে কি না, যে, কবিরাজ মহাশয় ইচ্ছা আছে, কিন্তু তাহার উপায় কি?—সেই উপায় বলিয়া দেওয়াই প্রকৃত পরামর্শ।

দ্বিজেন্দ্র বাবুকে আমরা গুরু বলিয়া মান্য করি; ভরসা করি, তিনি জিজ্ঞাসুর ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিয়া প্রশ্নের সদুত্তর দিবেন।

নিছনি।

(উত্তর।)

তৃতীয় সংখ্যক সাধনায় কোন পাঠক "নিছনি" শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; তাহার উত্তরে জগদানন্দ বাবু "নিছনি" শব্দের অর্থ "অনিচ্ছা" লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অনিচ্ছা অর্থে নিছনির ব্যবহার কোথাও দেখা যায় নাই। গোবিন্দদাসে আছে "গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি"—স্পষ্টই অনুমান করা যায়, "বালাই লইয়া মরি" বলিতে যে ভাব বুঝায় "নিছনি লইয়া মরি" বলিতেও তাহাই বুঝাইতেছে। কিন্তু সর্ব্বত্র নিছনি শব্দের এরূপ অর্থ পাওয়া যায় না। বসন্তরায়ের কোন পদে আছে—

পরাণ কেমন করে, মরম কহিনু তোরে,
জীবন নিছনি তুয়া পাশ।—

এখানে নিছনি বলিতে কতকটা উপহারের ভাব বুঝায়।

বসন্ত রায়ের অন্যত্র আছে—

তোমার পিরীতে হাম হইনু বিকিনী,
মূলে বিকালাঙ আর কি দিব নিছনি।

এখানে নিছনি বলিতে কি বুঝাইতেছে ঠিক করিয়া বলা শক্ত। এরূপ স্থলে নিছনি শব্দের সংস্কৃত মুলটি বাহির করিতে পারিলে অর্থ নির্ণয়ের সাহায্য হইতে পারে।

গোবিন্দ দাসের এক স্থলে আছে—

দোঁহে দোঁহে তনু নিরছাই।

এ স্থলে "নিছিয়া" এবং "নিরছাই" এক ধাতুমূলক বলিয়া সহজেই বোধ হয়।

অন্যত্র আছে—

"বরু হাম জীবন তোহে নিরমঞ্ছব
তবহুঁ না সোঁপব অঙ্গ।"

ইহার অর্থ, বরং আমার জীবন তোমার নিকট পরিত্যাগ করিব তথাপি অঙ্গ সমর্পণ করিব না।

আর এক স্থলে দেখা যায়—

"কুণ্ডল পিচ্ছে চরণ নিরমঞ্ছল
অব কিয়ে সাধসি মান।"

অর্থাৎ তোমার চরণে মাথা লুটাইয়া কামের কুণ্ডল ও চূড়ার ময়ূরপুচ্ছ দিয়া তোমার পা মুছাইয়া দিয়াছে তথাপি তোমার মান গেল না?

এই নির্মঞ্ছন শব্দই যে নিছনি শব্দের মূল রূপ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অভিধানে নির্মঞ্ছন শব্দের অর্থ দেখা যায়—"নীরাজনা, আরুতি, সেবা, মোছা।" নীরাজনা অর্থ "আরাত্রিক দীপমালা সজলপদ্ম ধৌতবস্ত্র বিল্বপত্রাদি সাষ্টাঙ্গপ্রণাম—এই পঞ্চ দ্বারা আরাধনা, আরুতি।" উহার আর এক অর্থ "শান্তিকর্ম্ম বিশেষ।"

অতএব যেখানে "নিছনি লইয়া মরি" বলা হয়, সেখানে বুঝায় তোমার সমস্ত অমঙ্গল লইয়া মরি—এখানে "শান্তিকর্ম্ম" অর্থের প্রয়োগ।

"দোঁহে দোঁহে তনু নিরছাই"—এস্থলে নিরছাই অর্থে মোছা।

নিরমল কুলশীল বিদিত ভুবন,
নিছনি করিনু তোমার ছুঁইয়া চরণ।

এখানে নিছনি অর্থে স্পষ্টই আরাধনার অর্ঘ্যোপহার বুঝাইতেছে।

"পরাণ নিছিয়া দিই পিরীতে তোমার"—অর্থাৎ তোমার প্রেমে প্রাণকে উপহারস্বরূপে অর্পণ করি।

তোমার পিরীতে হাম হইনু বিকিনী
মূলে বিকালাঙ, আর কি দিব নিছনি!

ইহার অর্থ বোধ করি নিম্নলিখিতমত হইবে—তোমার প্রেমে যখন আমি সমূলে বিক্রীত হইয়াছি তখন বিশেষ করিয়া আরাধনাযোগ্য উপহার আর কি দিব?

বর্ত্তমান প্রচলিত ভাষায় এই "নিছনি" শব্দের ব্যবহার আছে কি না জানিতে উৎসুক আছি; যদি কোন পাঠক অনুগ্রহ করিয়া জানান ত বাধিত হই। চণ্ডিদাসের পদাবলীতে নিছনি শব্দ কোথাও দেখি নাই।

প্রশ্ন।

১। চিম্‌নি বসাইবার পূর্ব্বে কেরোসিন ল্যাম্পের শিখা অপরিষ্কার ও ধূমাচ্ছন্ন থাকে কেন? চিম্‌নি বসাইলে কি কারণে দীপ-শিখা উজ্জ্বলতর ও ধূমবিহীন হয়?

২। সূর্য্য ও চন্দ্রের আকার উদয় ও অস্তকালে বৃহত্তর দেখায় কেন?

৩। সন্ধ্যাকালে মেঘ-শূন্য পশ্চিম গগণ লোহিতাভ হয় কেন?

শ্রীজগদানন্দ রায়
কৃষ্ণনগর।

৪। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর আগে রচিত হয় অথবা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর আগে রচিত হয়?

৫। তিনি পটল তুলিয়াছেন অর্থে তিনি মরিয়া গিয়াছেন ব্যবহৃত হয়। পটল তোলার সহিত মরিয়া যাওয়ার সমন্ধ কি?

শ্রীদীপ্তেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
কলিকাতা।

৬। "আনন্দমঠে" (৪র্থ সংস্করণ, ৭০ পৃষ্ঠা) বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন "যেমন মনোমধ্যে প্রতিভা, যেমন জগতের শব্দ মধ্যে সঙ্গীত, যেমন মরণের ভিতর সুখ, তেমনি সে রূপরাশিতে অনির্ব্বচনীয় কি ছিল!

"মরণের ভিতর সুখ" কি বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীগৌরহরি সেন।
কলিকাতা।

উত্তর।

কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীযুক্ত বাবু জগদানন্দ রায় লিখিয়াছেন "চেদীরাজ ভবাদি অষ্টবসুর অন্যতম নাম। চেদীরাজের পূজা হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহাদি সংস্কারের প্রধান অঙ্গ।"—কেন ভবাদি অষ্টবসুর মধ্যে একজনের নাম চেদীরাজ হইবে বুঝিতে পারিলাম না। উত্তরদাতা মহাশয় কোন বিবাহে "লাজ মোদক" দিয়া চেদীরাজপূজা অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছেন কি না জানিতে ইচ্ছা করি। ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব গ্রন্থে বিবাহসংস্কারের মধ্যে "চেদীরাজ" পূজার স্থান আছে কি না কোন পাঠক উত্তর দিলে বিশেষ বাধিত হইব।

জিজ্ঞাসু।
ভবানীপুর।

আমার কোন রন্ধননিপুণা আত্মীয়ার নিকট জানিলাম আদা সংযোগে কাঁচকলা গলিবার কোন ব্যাঘাত হয় না—এমন কি, কোন কোন ব্যঞ্জনে এরূপ সংযোগ হইয়া থাকে।

আদা এবং কাঁচকলার বিপরীত গুণ—আদা বিরেচক এবং কাঁচকলা ধারক—এই জন্যই কি বিরোধের সম্পর্ককে আদা কাঁচকলার সম্পর্ক বলা হইয়া থাকে?

পাঠক।

বহু পত্নীর সহিত পরলোকে কিরূপে একাত্ম হওয়া যাইতে পারে দীনেন্দ্র-কুমার বাবু তাহা বুঝিতে পারেন নাই। ব্যাপারটা নিতান্ত দুর্ব্বোধ নহে। দুইজনে মিশিয়া যদি এক হইতে পারে ত তিনজনে মিশিয়া এক হইতে আটক দেখি না। অবশ্য স্ত্রীর সংখ্যা অনুসারে উক্ত একের পরিমাণের তারতম্য হইতে পারে। সে হিসাবে, যাহার পত্নী যত বেশি পরলোকে সে ততই বেশি "মাহাত্ম্য" লাভ করিবে।

শ্রী ঃ—
কলিকাতা।

ভুল প্রশ্ন।

সাধনার দ্বিতীয় সংখ্যায় "জিজ্ঞাসু" লিখিয়াছেন "কোন ইংরাজি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি ধান গম যব প্রভৃতি শস্যের শীষ পরিপক্ব হইলে অন্য কোন দিকে না হেলিয়া উত্তর দিকে হেলিয়া থাকে।" আমরা সন্ধান করিয়া দেখিলাম "জিজ্ঞাসু" গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অ্যাণ্ড্রু উইল্‌সন্ সাহেবের রচিত "ষ্টাডিজ্ ইন লাইফ্ এণ্ড্ সেন্স্" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে পরিপক্ব শস্য প্রায়ই দক্ষিণ দিকে হেলিয়া থাকে। "জিজ্ঞাসু" নিশ্চয়ই এই গ্রন্থ হইতে তাঁহার সংবাদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—কিন্তু দক্ষিণকে কি করিয়া উত্তর করিলেন এ প্রশ্নের সদুত্তর প্রশ্নকর্ত্তাই দিতে পারেন।

সম্পাদক।

নূতন ডল্‌মেটিনা (হারমোনিয়ম)।

নগদ মূল্য ৬৫৲ হইতে ৭৫৲।

প্যারিস প্রদর্শনীতে সর্ব্বোচ্চ স্বর্ণমেডেলধারী বিখ্যাত ফরাসী-দেশীয় হারমোনিয়ম আবিষ্কারক রুডল্‌ফিল্‌স্ এণ্ড ডিবেন কর্ত্তৃক সলিড্ এনামাইজ্‌ড্ কাষ্ঠে প্রস্তুত। হাপর ভিতরে থাকাতে ঠাণ্ডা লাগে না পোকায় কাটে না। তিন গ্রাম, পাঁচ ষ্টপ্, দুই সেট্ রীড্ আছে। চাবিগুলি গজদন্তনির্ম্মিত ও চওড়া। স্বর প্রবল সুমিষ্ট ও দেশীয় সঙ্গীতোপযোগী। মজবুত বাক্সসমেত ওজনে ১২ সের, পরিমাণে ২৫ × ১৪ × ৮ ইঞ্চি। টেবিল ও বাক্স উভয় হারমোনিয়মই হয়। শিখিবার একখানি পুস্তকও দেওয়া হয়। দুই বৎসরের গ্যারাণ্টি।

চ্যালেঞ্জ মিউজিক্যাল বক্স বা আর্গিন যন্ত্র।

প্রত্যেকের নগদ মূল্য ৭৫৲।

বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী রাগরাগিণীযুক্ত এরূপ প্রবল ও সুমধুর স্বরবিশিষ্ট যন্ত্র এদেশে কখনও আসে নাই। ইহার কল অতিশয় মজবুত এবং দুইটি স্প্রিং থাকাতে একবার চাবি দিলে কুড়ি মিনিট বাজে। মাপ ১৮ × ১০ × ৭ ইঞ্চি।

১ নং	২ নং	৩ নং	৪ নং
১ বিদ্যাসুন্দর	১ কাফি সিন্ধু	১ ভৈরবী	১ সিন্ধু ভৈরবী
২ সারঙ্গ	২ গৌড় সারঙ্গ	২ বারোঁয়া	২ সিন্দুড়া
৩ দেশ	৩ পিলু জংলা	৩ কালাংড়া	৩ জয়জয়ন্তী
৪ ধানশ্রী পুরবী	৪ সোহিনী বাহার	৪ খাম্বাজ	৪ মূলতান
৫ আড়ানা বাহার	৫ বাউলের সুর	৫ বেহাগ	৫ ভূপালী
৬ ঝিঁঝিট	৬ বাগেশ্রী	৬ ঝিঁঝিট	৬ রামপ্রসাদী

ভারতবর্ষে একমাত্র এজেণ্ট ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্।

লালবাজার পুলিষ আদালতের পূর্ব্ব, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

রাজা ও রাণী	(নাটক)	এক টাকা
বিসর্জন	(নাটক)	এক টাকা।
রাজর্ষি	(উপন্যাস)	পাঁচ সিকা।
মানসী	(কবিতা)	দুই টাকা।
য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী	(ভূমিকা)	আট আনা।

উক্ত গ্রন্থকারের নিম্নলিখিত গ্রন্থ কলেজ ষ্ট্রীট্ পীপ্‌ল্ লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

কড়ি ও কোমল	(কবিতা)	এক টাকা।
সমালোচনা		এক টাকা।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

আর্য্যামি এবং সাহেবিয়ানা	দুই আনা।
সোনার কাটি ও রূপার কাটি	দুই আনা।
সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা	দুই আনা।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

সরোজিনী নাটক	(পঞ্চম সংস্করণ)	এক টাকা।

সাধনা।

বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা।

যাঁহারা অনেক ইংরাজি কেতাব পড়িয়াছেন তাঁহারা অনেকেই আধুনিক বাঙ্গলা লেখা ও লেখকদের প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। এইরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া তাঁহারা অনেকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। বোধ করি ইতর সাধারণ হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া অভিমানে তাঁহারা আপাদমস্তক কণ্টকিত হইয়া উঠেন। একটা কথা ভুলিয়া যান— যে, পৃথিবীতে বড় হওয়া শক্ত কিন্তু আপনাকে বড় মনে করা সকলের চেয়ে সহজ। সমযোগ্য লোককে দূরে পরিহার করিয়া অনেকে স্বকপোলকল্পিত মহত্ত্ব লাভ করে, কিন্তু প্রার্থনা করি, এরূপ অজ্ঞানকৃত প্রহসন অভিনয় হইতে আমাদের অন্তর্যামী আমাদিগকে সতত বিরত করুন।

বহুকাল হইতে বহুতর সামাজিক প্লাবনের সাহায্যে স্তর পড়িয়া ইংরাজি সাহিত্য উচ্চতা, কঠিনতা এবং একটা নির্দ্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যে সম্প্রতি পলি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার কোথাও জলা, কোথাও বালি, কোথাও মাটি। সুতরাং ইহার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যে যাহা ইচ্ছা বলিতে পারে, কাহারো প্রতিবাদ করিবার সাধ্য

নাই। ইহার ইতিহাস নাই, আবহমানকালপ্রচলিত প্রবাহ নাই, বহুকালসঞ্চিত রত্নভাণ্ডার নাই, ইহার বিক্ষিপ্ত অংশগুলিকে এখনো এক সমালোচনার নিয়মে বাঁধিবার সময় হয় নাই। সুতরাং ইংরাজি সমালোচনাগ্রন্থ হইতে মুখগহ্বর পূর্ণ করিয়া লইয়া যখন কোন প্রবল প্রতিপক্ষ ইহার প্রতি মুহুর্মুহু ফুৎকার প্রয়োগ করিতে থাকেন তখন বঙ্গসাহিত্যের ক্ষীণ আশার আলোকটুকু একান্ত কম্পিত ও নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়া আসে। কিন্তু তথাপি বলা যাইতে পারে ফুৎকার যতই প্রবল হোক্ শীর্ণ দীপশিখা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বর্ত্তমান বাঙ্গলা লেখকেরা বঙ্গসাহিত্যের প্রথম ভিত্তি নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত আছেন। সুতরাং যাঁহারা ইংরাজি গ্রন্থস্তূপ-শিখরের উপর চড়িয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করেন তাঁহারা ইহাঁদিগকে ছোট বলিয়া মনে করিতে পারেন। ইহাঁরা মাটির উপরে দাঁড়াইয়া খাটিয়া মরিতেছেন তাঁহারা উচ্চ চূড়ায় বসিয়া কেবল হাওয়া খাইতেছেন, এরূপ স্থলে উভয়ের মধ্যে সমকক্ষতার ভাব রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়ে।

এই দুই দলের মধ্যে যদি প্রকৃত উচ্চনীচতা থাকে তবে আর কোন কথাই নাই। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাঁহারা শুদ্ধমাত্র পরের চিন্তালব্ধ ধন সঞ্চয় করিয়া জীবন যাপন করেন তাঁহারা জানেন না নিজে কোন বিষয় আনুপূর্ব্বিক চিন্তা করা এবং সেই চিন্তা ভাষায় ব্যক্ত করা কি কঠিন! অনেক বড় বড় কথা পরের মুখ হইতে পরিপক্ক ফলের মত অতি সহজে পাড়িয়া লওয়া যায় কিন্তু অতি ছোট কথাটিও নিজে ভাবিয়া গড়িয়া তোলা বিষম ব্যাপার। যে ব্যক্তি কেবল-মাত্র পাঠ করিয়া শিখিয়াছে, সঞ্চয় করা ছাড়া বিদ্যাকে আর

কোন প্রকার ব্যবহারে লাগায় নাই, সে নিজে ঠিক জানে না সে কতটা জানে এবং কতটা জানে না।

যে শ্রেণীর সমালোচকের কথা বলিতেছি তাঁহারা যখন বাঙ্গলা পড়েন তখন মনে মনে বাঙ্গলাকে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া লন, সুতরাং সমালোচ্য গ্রন্থের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। বাঙ্গলা ভাষার প্রাণের মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করেন নাই, প্রবেশ করিবার অবসর পান নাই। মাতৃভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে সকল সাহিত্যই ম্লান নির্জ্জীব ভাব ধারণ করে, তখন তাহার প্রতি সমালোচন-শর প্রয়োগ করা কেবল "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" দেওয়া মাত্র।

যাঁহারা বাঙ্গলা লেখেন তাঁহারাই বাঙ্গলা ভাষার বাস্তবিক চর্চ্চা করেন; অগত্যাই তাঁহাদিগকে বাঙ্গলা চর্চ্চা করিতে হয়। বাঙ্গলা ভাষার প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ শ্রদ্ধা অবশ্যই আছে। বঙ্গভাষা রাজভাষা নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা নহে, সম্মান লাভের ভাষা নহে, অর্থোপার্জ্জনের ভাষা নহে, কেবলমাত্র মাতৃ-ভাষা। যাঁহাদের হৃদয়ে ইহার প্রতি একান্ত অনুরাগ ও অটল ভরসা আছে তাঁহাদেরই ভাষা। যাঁহারা উপেক্ষাভরে দূরে থাকেন তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে কোন সুযোগই পান নাই। তাঁহারা তর্জ্জমা করিয়া বাঙ্গলার বিচার করেন। অতএব সভয়ে নিবেদন করিতেছি এরূপ স্থলে তাঁহাদের মতের অধিক মূল্য নাই।

ত্যাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ফাল্গুনের প্রথম পূর্ণিমায় আম্রমুকুলের গন্ধ লইয়া নব বসন্তের বাতাস বহিতেছে। পুষ্করিণীতীরের একটি পুরাতন লিচু গাছের ঘন পল্লবের মধ্য হইতে একটি নিদ্রাহীন অশ্রান্ত পাপিয়ার গান মুখুয্যেদের বাড়ির একটি নিদ্রাহীন শয়নগৃহের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। হেমন্ত কিছু চঞ্চল ভাবে কখন তার স্ত্রীর এক গুচ্ছ চুল খোঁপা হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইয়া আঙুলে জড়াইতেছে, কখন তাহার বালাতে চুড়িতে সংঘাত করিয়া ঠুং ঠুং শব্দ করিতেছে, কখন তাহার মাথার ফুলের মালাটা টানিয়া স্বস্থানচ্যুত করিয়া তাহার মুখের উপর আনিয়া ফেলিতেছে। সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধ ফুলের গাছটিকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বাতাস যেমন একবার এপাশ হইতে একবার ওপাশ হইতে একটু আধটু নাড়াচাড়া করিতে থাকে, হেমন্তের কতকটা সেই ভাব।

কিন্তু কুসুম সম্মুখের চন্দ্রালোকপ্লাবিত অসীম শূন্যের মধ্যে দুই নেত্রকে নিমগ্ন করিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে। স্বামীর চাঞ্চল্য তাহাকে স্পর্শ করিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। অবশেষে হেমন্ত কিছু অধীর ভাবে কুসুমের দুই হাত নাড়া দিয়া বলিল "কুসুম তুমি আছ কোথায়! তোমাকে যেন একটা মস্ত দুরবীণ কষিয়া বিস্তর ঠাহর করিয়া বিন্দুমাত্র দেখা যাইবে এম্‌নি দূরে গিয়া পড়িয়াছ। আমার ইচ্ছা, তুমি আজ একটু কাছাকাছি এস। দেখ দেখি কেমন চমৎকার রাত্রি!"

কুসুম শূন্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া স্বামীর মুখের দিকে রাখিয়া কহিল—"এই জ্যোৎস্না রাত্রি এই বসন্তকাল সমস্ত এই মুহূর্ত্তে মিথ্যা হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এমন একটা মন্ত্র আমি জানি।"

হেমন্ত বলিল "যদি জান ত সেটা উচ্চারণ করিয়া কাজ নাই। বরং এমন যদি কোন মন্ত্র জানা থাকে যাহাতে সপ্তাহের মধ্যে তিনটে চারটে রবিবার আসে কিম্বা রাত্রিটা বিকাল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত টিঁকিয়া যায়, ত তাহা শুনিতে রাজি আছি।" বলিয়া কুসুমকে আর একটু টানিয়া লইতে চেষ্টা করিল। কুসুম সে আলিঙ্গনপাশে ধরা না দিয়া কহিল—"আমার মৃত্যু-কালে তোমাকে যে কথাটা বলিব মনে করিয়াছিলাম আজ তাহা বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। আজ মনে হইতেছে তুমি আমাকে যত শাস্তি দাও না কেন আমি বহন করিতে পারিব।"

শাস্তি সম্বন্ধে জয়দেব হইতে শ্লোক আওড়াইয়া হেমন্ত একটা রসিকতা করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। এমন সময়ে শোনা গেল একটা ক্রুদ্ধ চটি জুতার চটাচট্ শব্দ নিকটবর্ত্তী হইতেছে। হেমন্তের পিতা হরিহর মুখুয্যের পরিচিত পদশব্দ। হেমন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। হরিহর দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে কহিল "হেমন্ত, বৌকে এখনি বাড়ি হইতে দূর করিয়া দাও।" হেমন্ত স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল, স্ত্রী কিছুই বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কেবল দুই হাতের মধ্যে কাতরে মুখ লুকাইয়া আপনার সমস্ত বল এবং ইচ্ছা দিয়া আপনাকে যেন লুপ্ত করিয়া দিতে চেষ্টা করিল। দক্ষিণে বাতাসে পাপিয়ার স্বর ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল, কাহারো কানে গেল না। পৃথিবী এমন অসীম সুন্দর অথচ এত সহজেই সমস্ত বিকল হইয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হেমন্ত বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল "সত্য কি ?" স্ত্রী কহিল "সত্য।" "এতদিন বল নাই কেন ?" "অনেক বার বলিতে চেষ্টা করিয়াছি বলিতে পারি নাই। আমি বড় পাপিষ্ঠা।" "তবে আজ সমস্ত খুলিয়া বল।" কুসুম গম্ভীর দৃঢ়স্বরে সমস্ত বলিয়া গেল—যেন অটল চরণে ধীর গতিতে আগুনের মধ্যে দিয়া চলিয়া গেল, কতখানি দগ্ধ হইতেছিল কেহ বুঝিতে পারিল না। সমস্ত শুনিয়া হেমন্ত উঠিয়া গেল। কুসুম বুঝিল, যে স্বামী চলিয়া গেল, সে স্বামীকে আর ফিরিয়া পাইবে না। কিছু আশ্চর্য্য মনে হইল না; এ ঘটনাও যেন অন্যান্য দৈনিক ঘটনার মত অত্যন্ত সহজ ভাবে উপস্থিত হইল; মনের মধ্যে এমন একটা শুষ্ক অসাড়তার সঞ্চার হইয়াছে। কেবল পৃথিবীকে এবং ভালবাসাকে আগাগোড়া মিথ্যা এবং শূন্য বলিয়া মনে হইল। এমন কি, হেমন্তের সমস্ত অতীত ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত নীরস কঠিন নিরানন্দ হাসি একটা খরধার নিষ্ঠুর ছুরির মত তাহার মনের একধার হইতে আর একধার পর্য্যন্ত একটি দাগ রাখিয়া দিয়া গেল। বোধ করি সে ভাবিল, যে ভালবাসাকে এতখানি বলিয়া মনে হয়, এত আদর, এত গাঢ়তা, যাহার তিলমাত্র বিচ্ছেদ এমন মর্ম্মান্তিক, যাহার মুহূর্ত্তমাত্র মিলন এমন নিবিড়ানন্দময়; যাহাকে অসীম অনন্ত বলিয়া মনে হয়, জন্মজন্মান্তরেও যাহার অবসান কল্পনা করা যায় না—সেই ভালবাসা এই! এইটুকুর উপর নির্ভর! সমাজ যেমনি একটু আঘাত করিল অমনি অসীম ভালবাসা চূর্ণ হইয়া এক মুষ্টি ধূলি হইয়া গেল। হেমন্ত কম্পিতস্বরে এই কিছু-

পূর্ব্বে কানের কাছে বলিতেছিল "চমৎকার রাত্রি!" সে রাত্রি ত এখনো শেষ হয় নাই; এখনো সেই পাপিয়া ডাকিতেছে, দক্ষিণের বাতাস মশারি কাঁপাইয়া যাইতেছে, এবং জ্যোৎস্না সুখশ্রান্ত সুপ্ত সুন্দরীর মত বাতায়নবর্ত্তী পালঙ্কের এক প্রান্তে নিলীন হইয়া পড়িয়া আছে। সমস্তই মিথ্যা! ভালবাসা আমার অপেক্ষাও মিথ্যাবাদিনী মিথ্যাচারিণী!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতেই অনিদ্রাশুষ্ক হেমন্ত পাগলের মত হইয়া প্যারিশঙ্কর সান্যালের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। প্যারিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল "কিহে বাপু, কি খবর!" হেমন্ত মস্ত একটা আগুনের মত যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "তুমি আমাদের জাতি নষ্ট করিয়াছ, সর্ব্বনাশ করিয়াছ—তোমাকে ইহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে—" বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। প্যারিশঙ্কর ঈষৎ হাসিয়া কহিল "আর তোমরা আমার জাতি রক্ষা করিয়াছ আমার সমাজ রক্ষা করিয়াছ, আমার পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়াছ! আমার প্রতি তোমাদের বড় যত্ন, বড় ভালবাসা।" হেমন্তের ইচ্ছা হইল সেই মুহূর্ত্তেই প্যারিশঙ্করকে ব্রহ্মতেজে ভস্ম করিয়া দিতে কিন্তু সেই তেজে সে নিজেই জ্বলিতে লাগিল, প্যারিশঙ্কর দিব্য সুস্থ নিরাময় ভাবে বসিয়া রহিল। হেমন্ত ভগ্নকণ্ঠে বলিল "আমি তোমার কি করিয়াছিলাম!" প্যারিশঙ্কর কহিল "আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার একটিমাত্র কন্যা ছাড়া আর সন্তান নাই. আমার সেই কন্যা তোমার বাপের কাছে কি অপরাধ করিয়াছিল! তুমি তখন ছোট ছিলে, তুমি হয়ত

জান না—ঘটনাটা তবে মন দিয়া শোন। ব্যস্ত হইয়ো না, বাপু, ইহার মধ্যে বিস্তর কৌতুক আছে।

আমার জামাতা নবকান্ত আমার কন্যার গহনা চুরি করিয়া যখন পালাইয়া বিলাতে গেল, তখন তুমি শিশু ছিলে। তাহার পর পাঁচ বৎসর বাদে সে যখন বারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল তখন পাড়ায় যে একটা গোলমাল বাধিল তোমার বোধ করি কিছু কিছু মনে থাকিতে পারে। কিম্বা তুমি না জানিতেও পার তুমি তখন কলিকাতার স্কুলে পড়িতে। তোমার বাপ গ্রামের দলপতি হইয়া বলিলেন—মেয়েকে যদি স্বামীগৃহে পাঠান অভি· প্রায় থাকে তবে সে মেয়েকে আর ঘরে লইতে পারিবে না। আমি তাঁহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলাম, দাদা এ যাত্রা তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমি ছেলেটিকে গোবর খাওয়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইতেছি তোমরা তাহাকে জাতে তুলিয়া লও। তোমার বাপ কিছুতেই রাজি হইলেন না, আমিও আমার এক-মাত্র মেয়েকে ত্যাগ করিতে পারিলাম না। জাত ছাড়িয়া দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া ঘর করিলাম। এখানে আসিয়াও আপদ মিটিল না। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের যখন বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়াছি—তোমার বাপ কন্যাকর্ত্তাদের উত্তেজিত করিয়া সে বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিলেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যদি ইহার প্রতিশোধ না লই তবে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে নহি।—এইবার কতকটা বুঝিতে পারিয়াছ—কিন্তু আর একটু সবুর কর—সমস্ত ঘটনাটি শুনিলে খুসী হইবে—ইহার মধ্যে একটু রস আছে।

তুমি যখন কালেজে পড়িতে তোমার বাসার পাশেই বিপ্রদাস চাটুয্যের বাড়ি ছিল। বেচারা এখন মারা গিয়াছে। চাটুয্যে

মহাশয়ের বাড়িতে কুসুম নামে একটি শৈশব-বিধবা অনাথা কায়স্থকন্যা আশ্রিতভাবে থাকিত। মেয়েটি বড় সুন্দরী—বুড়ো ব্রাহ্মণ কালেজের ছেলেদের দৃষ্টিপথ হইতে তাহাকে সম্বরণ করিয়া রাখিবার জন্য কিছু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বুড়ো মানুষকে ফাঁকি দেওয়া একটি মেয়ের পক্ষে কিছুই শক্ত নহে। মেয়েটি প্রায়ই কাপড় শুকাইতে দিতে ছাতে উঠিত এবং তোমারও বোধ করি ছাতে না উঠিলে পড়া মুখস্থ হইত না। পরস্পরের ছাত হইতে তোমাদের কোনরূপ কথাবার্ত্তা হইত কি না সে তোমরাই জান, কিন্তু মেয়েটির ভাবগতিক দেখিয়া বুড়ার মনেও সন্দেহ হইল। কারণ, কাজকর্ম্মে তাহার ক্রমিক ভুল হইতে দেখা গেল এবং তপস্বিনী গৌরীর মত দিন দিন সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিতে লাগিল। এক এক দিন সন্ধ্যাবেলায় সে বুড়ার সম্মুখেই অকারণে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিত না। অবশেষে বুড়া আবিষ্কার করিল ছাতে তোমাদের মধ্যে সময়ে অসময়ে নীরব দেখা সাক্ষাৎ চলিয়া থাকে—এমন কি কালেজ কামাই করিয়াও মধ্যাহ্নে চিলের ঘরের ছায়ায় ছাতের কোণে তুমি বই হাতে করিয়া বসিয়া থাকিতে নির্জ্জন অধ্যয়নে সহসা তোমার এত উৎসাহ জন্মিয়াছিল। বিপ্রদাস যখন আমার কাছে পরামর্শ জানিতে আসিল আমি কহিলাম, খুড়ো, তুমি ত অনেক দিন হইতে কাশি যাইবার মানস করিয়াছ, মেয়েটিকে আমার কাছে রাখিয়া তীর্থবাস করিতে যাও আমি তাহার ভার লইতেছি। বিপ্রদাস তীর্থে গেল। আমি মেয়েটিকে শ্রীপতি চাটুয্যের বাসায় রাখিয়া তাহাকেই মেয়ের বাপ বলিয়া চালাইলাম। তাহার পর যাহা হইল তোমার জানা আছে। তোমার কাছে আগাগোড়া সব কথা খোলসা করিয়া বলিয়া বড় আনন্দ লাভ করিলাম। এ যেন একটি গল্পের মত। ইচ্ছা আছে

সমস্তটি লিখিয়া একটি বই করিয়া ছাপাই। আমার লেখা আসে না। আমার ভাইপোটা শুনিতেছি একটু আধটু লেখে—তাহাকে দিয়া লেখাইবার মানস আছে। কিন্তু তোমাতে তাহাতে মিলিয়া লিখিলে সব চেয়ে ভাল হয়, কারণ, গল্পের উপসংহারটি আমার ভাল জানা নাই।”

হেমন্ত প্যারিশঙ্করের এই শেষ কথাগুলিতে বড় একটা কান না দিয়া কহিল “কুসুম এই বিবাহে কোন আপত্তি করে নাই?”

প্যারিশঙ্কর কহিল “আপত্তি ছিল কি না বোঝা ভারি শক্ত। জান ত, বাপু, মেয়েমানুষের মন; যখন “না” বলে তখন “হাঁ” বুঝিতে হয়। প্রথমে ত দিনকতক নূতন বাড়িতে আসিয়া তোমাকে না দেখিতে পাইয়া কেমন পাগলের মত হইয়া গেল। তুমিও দেখিলাম কোথা হইতে সন্ধান পাইয়াছ; প্রায়ই বই হাতে করিয়া কালেজে যাত্রা করিয়া তোমার পথ ভুল হইত—এবং শ্রীপতির বাসার সম্মুখে আসিয়া কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে; ঠিক যে প্রেসিডেন্সি কালেজের রাস্তা খুঁজিতে তাহা বোধ হইত না, কারণ ভদ্রলোকের বাড়ির জানলার ভিতর দিয়া কেবল পতঙ্গ এবং উন্মাদ যুবকদের হৃদয়ের পথ ছিল মাত্র। দেখিয়া শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হইল। দেখিলাম, তোমার পড়ার বড়ই ব্যাঘাত হইতেছে এবং মেয়েটির অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন। একদিন কুসুমকে ডাকিয়া লইয়া কহিলাম—বাছা, আমি বুড়ামানুষ, আমার কাছে লজ্জা করিবার আবশ্যক নাই—তুমি যাহাকে মনে মনে প্রার্থনা কর আমি জানি। ছেলেটিও মাটি হইবার যো হইয়াছে। আমার ইচ্ছা তোমাদের মিলন হয়। শুনিবামাত্র কুসুম একেবারে বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং ছুটিয়া পালাইয়া গেল। এমনি করিয়া প্রায় মাঝে

মাঝে সন্ধ্যাবেলায় শ্রীপতির বাড়ি গিয়া কুসুমকে ডাকিয়া তোমার কথা পাড়িয়া ক্রমে তাহার লজ্জা ভাঙ্গিলাম। অবশেষে প্রতিদিন ক্রমিক আলোচনা করিয়া তাহাকে বুঝাইলাম যে, বিবাহ ব্যতীত পথ দেখি না। তাহা ছাড়া মিলনের আর কোন উপায় নাই। কুসুম কহিল কেমন করিয়া হইবে? আমি কহিলাম, তোমাকে কুলীনের মেয়ে বলিয়া চালাইয়া দিব। অনেক তর্কের পর সে এ বিষয়ে তোমার মত জানিতে কহিল। আমি কহিলাম, ছেলেটা একে ক্ষেপিয়া যাইবার যো হইয়াছে, তাহাকে আবার এ সকল গোলমালের কথা বলিবার আবশ্যক কি? কাজটা বেশ নিরাপত্তে নিশ্চিন্তে নিষ্পন্ন হইয়া গেলেই সকল দিকে সুখের হইবে। বিশেষতঃ এ কথা যখন কখনও প্রকাশ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই তখন বেচারাকে কেন গায়ে পড়িয়া চিরজীবনের মত অসুখী করা!—কুসুম বুঝিল, কি বুঝিল না আমি বুঝিতে পারিলাম না। কখন কাঁদে কখন চুপ করিয়া থাকে। অবশেষে আমি যখন বলি, তবে কাজ নাই, তখন আবার সে অস্থির হইয়া উঠে। এইরূপ অবস্থায় শ্রীপতিকে দিয়া তোমাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাই। দেখিলাম সম্মতি দিতে তোমার তিলমাত্র বিলম্ব হইল না। তখন বিবাহের সমস্ত ঠিক হইল। বিবাহের অনতিপূর্ব্বে কুসুম এমনি বাঁকিয়া দাঁড়াইল তাহাকে আর কিছুতেই বাগাইতে পারি না। সে আমার হাতে পায়ে ধরে, বলে ইহাতে কাজ নাই জ্যাঠামশায়। আমি বলিলাম, কি সর্ব্বনাশ, সমস্ত স্থির হইয়া গেছে, এখন কি বলিয়া ফিরাইব!—কুসুম বলে তুমি রাষ্ট্র করিয়া দাও আমার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে, আমাকে এখান হইতে কোথাও পাঠাইয়া দাও!—আমি বলিলাম তাহা হইলে ছেলেটির দশা কি

হইবে! তাহার বহুদিনের আশা কাল পূর্ণ হইবে বলিয়া সে স্বর্গে চড়িয়া বসিয়াছে, আজ আমি হঠাৎ তাহাকে তোমার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইব! আবার তাহার পরদিন তোমাকে তাহার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইতে হইবে, এবং সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় আমার কাছে তোমার মৃত্যুসংবাদ আসিবে। আমি কি এই বুড়া বয়সে স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিতে বসিয়াছি! তাহার পর শুভলগ্নে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল—আমি আমার একটা কর্ত্তব্য-দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিলাম। তাহার পর কি হইল তুমি জান।”

হেমন্ত কহিলেন “আমাদের যাহা করিবার তাহা ত করিলেন আবার কথাটা প্রকাশ করিলেন কেন?”

প্যারিশঙ্কর কহিলেন “দেখিলাম তোমার ছোট ভগ্নীর বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়া গেছে। তখন মনে মনে ভাবিলাম, একটা ব্রাহ্মণের জাত মারিয়াছি কিন্তু সে কেবল কর্ত্তব্যবোধে। আবার আর একটা ব্রাহ্মণের জাত মারা পড়ে, আমার কর্ত্তব্য এটা নিবারণ করা। তাই তাহাদের চিঠি লিখিয়া দিলাম। বলিলাম, হেমন্ত যে শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিয়াছে তাহার প্রমাণ আছে।”

হেমন্ত বহুকষ্টে ধৈর্য্য সম্বরণ করিয়া কহিল—“এই যে মেয়েটিকে আমি পরিত্যাগ করিব, ইহার দশা কি হইবে? আপনি ইহাকে আশ্রয় দিবেন?”

প্যারিশঙ্কর কহিলেন “আমার যাহা কাজ তাহা আমি করিয়াছি, এখন পরের পরিত্যক্ত স্ত্রীকে পোষণ করা আমার কর্ম্ম নহে। ওরে, হেমন্ত বাবুর জন্য বরফ দিয়া এক গ্লাস ডাবের জল লইয়া আয়, আর পান আনিস্!”

হেমন্ত এই সুশীতল আতিথ্যের জন্য অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী। অন্ধকার রাত্রি। পাখী ডাকিতেছে না। পুষ্করিণীর ধারের লিচু গাছটি কালো চিত্রপটের উপর গাঢ়তর কালির দাগের মত লেপিয়া গেছে। কেবল দক্ষিণের বাতাস এই অন্ধকারে অন্ধভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহাকে "নিশি"তে পাইয়াছে। আর আকাশের তারা নির্নিমেষ সতর্ক নেত্রে প্রাণপণে অন্ধকার ভেদ করিয়া কি একটা রহস্য আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত আছে।

শয়নগৃহে দীপ জ্বালা হয় নাই। হেমন্ত বাতায়নের কাছে খাটের উপরে বসিয়া সম্মুখের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আছে। কুসুম ভূমিতলে দুই হাতে তাহার পা জড়াইয়া পায়ের উপর মুখ রাখিয়া পড়িয়া আছে। সময় যেন স্তম্ভিত সমুদ্রের মত স্থির হইয়া আছে। যেন অনন্ত নিশীথিনীর উপর অদৃষ্ট চিত্রকর এই একটি চিরস্থায়ী ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে—চারিদিকে প্রলয় মাঝখানে একটি বিচারক, এবং তাহার পায়ের কাছে একটি অপরাধিনী।

আবার চটিজুতার শব্দ হইল। হরিহর মুখুয্যে দ্বারের কাছে আসিয়া বলিলেন—"অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে আর সময় দিতে পারি না। মেয়েটাকে ঘর হইতে দূর করিয়া দাও!"—কুসুম এই স্বর শুনিবামাত্র একবার মুহূর্ত্তের মত চিরজীবনের সাধ মিটাইয়া হেমন্তের দুই পা দ্বিগুণতর আবেগে চাপিয়া ধরিল—চরণ চুম্বন করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া পা ছাড়িয়া দিল।

হেমন্ত উঠিয়া গিয়া পিতাকে বলিল—"আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না।" হরিহর গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল—"জাত খোয়াইবি?" হেমন্ত কহিল "আমি জাত মানি না।"

"তবে তুইসুদ্ধ দূর হইয়া যা!"

সামাজিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর।

চৈত্র মাসের সাধনায় সামাজিক রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন বাহির হইয়াছে নিম্নে তাহার উত্তর দেওয়া গেল।

প্রশ্নকর্ত্তার প্রথম প্রশ্ন এই যে, দুই জাতির গুণভাগের সম্মিলন সম্ভবপর কি না? ইহার উত্তর এই যে, দুই জাতির গুণভাগ যেখানে আত্যন্তিক বিভিন্ন সেখানে সম্মিলন সহজ-সাধ্য না হইতে পারে কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা যে অসাধ্য তাহা নহে; কেন না গুণ স্বভাবতই গুণকে আকর্ষণ করে। প্রকৃত ভদ্র ইংরাজ এবং প্রকৃত ভদ্র বাঙ্গালি, পরস্পরের গুণগ্রাহী হয় না কেবল পরিচয়ের অভাবে; এ নহে যে, দুয়ের মধ্যস্থলে প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট কোনো-রূপ অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর সমুত্থিত রহিয়াছে; বিশেষতঃ ইংরাজ বাঙ্গালি যখন একই মূল জাতির দুই বিভিন্ন শাখা। ইংরাজদিগের কোনো একটি বিশেষ গুণ ধর, যেমন—উদ্যম; দেখিবে যে, তাহা এমন কোনো আত্যন্তিক বিজাতীয় সামগ্রী নহে যাহা আমাদের দেশে কেহই কখনো জানিত না অথবা কেহই যাহার দিক্ মাড়াইত না অথবা এখনকার এদেশীয় কোনো লোক যাহা জানে না অথবা যাহার

দিক্ মাড়ায় না। পুরাতন শাস্ত্রেও আছে যে, "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি" আর এক্ষণেও আমরা চক্ষু মেলিলেই দেখিতে পাই যে, আমাদের দেশে বাঙ্গালিরা বিদ্যানুশীলনে—মাড়োয়ারিরা ব্যবসা বাণিজ্যে—এবং আর আর নানা জাতি আর আর নানা প্রকারে উদ্যোগী রহিয়াছে। প্রভেদ কেবল এই যে, ইংরাজদিগের উদ্যমশীলতা পৃথিবী-জোড়া ব্যাপক, আমাদের দেশের উদ্যম-শীলতা তাহার তুলনায় অতীব সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে অবরুদ্ধ। ইংরাজদিগের উদ্যমের ক্ষেত্র যেমন বিস্তীর্ণ, তাহার গুণও তেমনি অনেক—যেমন কার্য্যের—সুশৃঙ্খলা, নৈপুণ্য, পারিপাট্য, ইত্যাদি; এ গুণ-গুলি যে, আমাদের দেশে মূলেই নাই, তাহা নহে; আছে, কিন্তু অনেক কম পরিমাণে। অতএব "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি" এ কথা যদি সত্য হয়, তবে কালে আমাদের দেশে উদ্যমশীলতার পরিমাণ প্রবর্দ্ধিত হইবারই কথা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কখনো কোনো জাতি কেবলমাত্র বিবেচনা-শক্তির বলে দুই আত্যন্তিকতার মধ্য-রেখা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে কি না? ইহার উত্তর এই যে, হালও চাই দাঁড়ও চাই—চক্ষুও চাই হস্ত-পদও চাই—কেবল মাত্র কোনো সামগ্রীতেই কোনো কাজ হয় না। বিবেচনার লক্ষ্য কাজের প্রতি; কাজের লক্ষ্য বিবেচনা কি বলে তাহার প্রতি। ফরাসীস্ বিদ্রোহানল রোসো প্রভৃতি পণ্ডিত-বর্গের এবং তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যের বিবেচনার অভ্যন্তরে অনেক-কাল ছাই-চাপা ছিল; তাহার পরে তাহার প্রচণ্ড শিখা অভিব্যক্ত হইল। ফরাসীস বিদ্রোহ ব্যাপারটা আর কিছু না—এ পক্ষ হইতে সহসা ওপক্ষে লম্ফ প্রদান। ফরাসীস্ বিদ্রোহের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া এক্ষণে

সকল সভ্যজাতিরই চক্ষু ফুটিয়াছে; এক্ষণকার খ্যাতিমান্ গ্রন্থ-কর্ত্তারা তাই সহস্র উত্তেজিত হইলেও একদিক-ঘেঁসা কথা ততটা জোরের সহিত কথনই বলিতে সাহসী হ'ন না। অনুভয় পক্ষে ভর করিয়া উভয়-পক্ষের দোষ-গুণ বিবেচনা এক্ষণকার কালের বিশেষ একটি কালিক ধর্ম্ম। এই যুগ-ধর্ম্মটি এক্ষণে পৃথিবীস্থ সকল সভ্যজাতির অধিকার প্রদেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে কার্য্য করিতেছে। ঠিক্ মধ্য-রেখা অবলম্বন করা কোনো জাতির পক্ষে সম্ভবপর কি না বলা সুকঠিন; কিন্তু একটা মধ্য-রেখা আছে—এবং সেই মধ্যরেখাই সকল রোগের মহৌষধ এবং সকল কল্যাণের প্রসূতি—এ কথাটি অধুনাতন-কালের কৃতবিদ্যমণ্ডলে সর্ব্ববাদিসম্মত; কাজেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই মধ্য-রেখার দিকে ক্রমশই সভ্যজাতি-গণের উত্তরোত্তর টান পড়িতেছে; তাহার সাক্ষী—সার্ব্বজাতিক রাজনিয়মের প্রতিষ্ঠা; সার্ব্বজাতিক রাজনিয়ম অর্থাৎ International laws; ইহা সার্ব্বজাতিক সৌহার্দ্দের একটি পূর্ব্বসূচনা তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, গোলাপের কাঁটা ও সুগন্ধের ন্যায় বিশেষ গুণ ও বিশেষ দোষ একই অকাট্য কারণে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্বদ্ধ কি না? ইহার উত্তর এই যে, গোলাপের কাঁটা যদি তেমন একটা গুরুতর দোষ হইত তাহা হইলে অবশ্যই উদ্ভিদ্‌বেত্তারা তাহার সংশোধনের চেষ্টা পাইতেন। উদ্ভিদ্‌বেত্তারা এক্ষণে ছোটো গোলাপকে বড় করিতেছেন এবং যেরূপ রঙ ভাল বিবেচনা করেন সেইরূপ রঙের গোলাপ ফুটা-ইয়া তুলিতেছেন—ইহা অধুনাতন কালের বিদ্যা-মাহাত্ম্যের বিশেষ একটি পরিচয়-স্থল।

চতুর্থ প্রশ্ন এই যে, আমরা ইচ্ছা করিলেই কি অন্য জাতির দোষগুলি ছাড়াইয়া ফেলিয়া গুণগুলি গ্রহণ করিতে পারি? এই সমস্ত দোষ গুণ কি জলবায়ু ইতিহাস এবং অন্যান্য নানা অলক্ষ্য কারণে জীবের সহিত মিশ্রিত হইয়া অন্তর হইতে বিকশিত হইয়া উঠে না? তাহা কি বাহির হইতে ধরিবার সামগ্রী? ইহার উত্তর এই যে, এক হাতে তালি বাজে না। দেবপ্রসাদ এবং আত্মপ্রভাব দুয়ের শুভযোগেই জাতিগণ কালে কালে উন্নতিমঞ্চে অধিরূঢ় হয়। পুরাতন গ্রীস্ যদি ইজিপ্টের বিজ্ঞান এবং শিল্পকে পর ভাবিয়া অগ্রাহ্য করিত, তবে কি তাৎকালিক গ্রীকেরা পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রধান জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারিত? অথচ ইজিপ্ট্ এবং গ্রীস্ দুয়ের জল বায়ুর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। জাতিগণের উন্নতি অবনতি জল বায়ুর উপরে কতক পরিমাণে নির্ভর করে বলিয়া জাতিগণ কি হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিবে—এইরূপ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে যে, বায়ু যদি অনুকূল হয় তবে নৌকা আপনিই কূলাভিমুখে যাইবে, বায়ু যদি প্রতিকূল হয় তবে নৌকা অকূল পাথারে ভাসিয়া যাইবে, এ তো অবশ্যম্ভাবী—তবে আর হাল ধরিয়া থাকিবার আবশ্যকতা কি? এ অতি অসঙ্গত কথা! কি ব্যক্তি, কি জাতি, উভয়েরই জানা উচিত যে, বিবেচনার পথ পরিত্যাগ করিয়া অবিবেচনার পথে গেলেই ঠকিতে হইবে—বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালে। শৈশব অবস্থায় অবিবেচনা অনেক সময় লোকের নিকট আদর পায়—কিন্তু বয়োবৃদ্ধি হইলে সে প্রথা একেবারেই উল্টিয়া যায়। এখনকার কালে কোনো জাতি যে মুসলমানদিগের ন্যায় গোঁয়ারতেমি করিয়া জিতিবে—অথবা বাঙ্গালির ন্যায় কাঁদিয়া জিতিবে—সে পথ জন্মের মতন বন্ধ।

পঞ্চম প্রশ্ন এই যে, জাতি সাধারণ হয় চিরাভ্যাস-ক্রমে, না হয় তো কোনো বিশেষ ভাবের উত্তেজনায়, না হয় তো বিশেষ কোনো জাতির অনুকরণ করিয়া চলে কি না? প্রতি পদ-ক্ষেপে দোষগুণ এবং উভয় পক্ষ বিচার করিয়া চলা তাহার পক্ষে সম্ভব কি না? ইহার উত্তর এই যে, শিশুরা যে দিকে যখন ঝোঁক হয় সেই দিকে চলে এবং ধাত্রীর হাত ধরিয়া চলে; কিন্তু তাহাদের বয়োবৃদ্ধি হইলে তাহারা কোন্ পথে ধূলা কাদা কোন্ পথে গাড়ি ঘোড়ার ভিড় কোন্ পথ সোজা কোন্ পথ বাঁকা সমস্তই দেখিয়া শুনিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। কোনো একটি স্থান অধিকার করিতে হইলে ইউরোপীয় জাতিরা সর্ব্বাগ্রে সেইস্থানের মানচিত্র আঁকাইয়া আনে এবং সেখানকার লোকদিগের অবস্থা এবং ভাবগতি তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া লয়। পূর্ব্বকালে তাতার দেশের লোকদিগের আক্রমণ-প্রণালী আর একরূপ ছিল; তাই তাহারা খড়ের আগুণের ন্যায় দেশ বিদেশ দগ্ধ করিয়া অচিরে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইত। পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় জাতিরা একদিক্‌দর্শী এবং পরানুকারী হয় বলিয়া চিরকালই যে তাহারা শিশু থাকিবে ইহা কোনো যুক্তিতেই স্থান পাইতে পারে না। প্রতি পদক্ষেপে দোষ গুণ বিচার করিয়া চলা একটা অত্যুক্তি মাত্র—আমরা কাহাকেও তাহা করিতে পরামর্শ দিতেছি না; আমরা কেবল বলিতেছি যে, রাস্তার এ ধারে গাড়ির ভিড়, ও ধারে অত্যন্ত কাদা, অতএব পথ দেখিয়া চল। ফলে, প্রৌঢ় বয়স্ক ব্যক্তি এবং জাতি উভয়েরই প্রতি হিতৈষী ব্যক্তিদিগের এ উপদেশ কখনই ব্যর্থ হইতে পারে না যে, চক্ষু বুজিয়া চলিলে পদে পদে ঠোক্কর খাইতে হইবে—এবং হয় তো বা একেবারেই গাড়ির চাকার নীচে পড়িতে হইবে।

ষষ্ঠ প্রশ্ন এই যে, পৃথিবীতে চিরবসন্ত নাই কিন্তু ছয় ঋতু গতায়াত করিয়া ঋতুসামঞ্জস্য রক্ষা করে; তেমনি সমাজে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান হইতে চেষ্টা করে এবং সকলেই আপনকার প্রভাব সম্পূর্ণ রূপে বিস্তার করিতে গিয়া মোটের উপর একটা সামঞ্জস্য থাকিয়া যায় কি না? ইহাতেই সমাজের জীবন যৌবন এবং বল রক্ষা হয় কি না? সুবিচক্ষণ যুক্তির একাধিপত্য কি সামাজিক জরার লক্ষণ নহে? ইহার উত্তর এই যে, ভৌতিক উপমা অপেক্ষা জৈবিক উপমা বর্ত্তমান স্থলে বেশী সংলগ্ন হয়; আর উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থকর্ত্তারাও তাহা অনুমোদন করেন। দেহতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, শরীরের বিভিন্ন স্থানীয় স্নায়ুপিণ্ডগুলি কতক অংশে স্বস্বপ্রধান, তাহার সাক্ষী ঘুমন্ত ব্যক্তির পায়ে সুড়সুড়ি দিলে তখনি সে ঘুমের ঘোরে পা নাড়া দিবে; কিন্তু তাহা হইলেও এটা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, নিম্নশ্রেণীর স্নায়ুপিণ্ড উচ্চশ্রেণীর স্নায়ু-পিণ্ডের বশবর্ত্তী এবং সমস্ত স্নায়ুপিণ্ড মস্তিষ্কের বশবর্ত্তী। খুব অধম শ্রেণীর জীবেরই স্নায়ু-পিণ্ডগুলি অধিক পরিমাণে স্বস্বপ্রধান; একটা বোল্‌তাকে তাহার কটিদেশ ঘেঁসিয়া দুই খণ্ড করিলে—বিচ্ছিন্ন খণ্ডদ্বয় অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সজীব থাকে; উচ্চশ্রেণীর জীব সেরূপ অবস্থায় তিলার্দ্ধ কালও বাঁচিতে পারে না। শরীরের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পূর্ণমাত্রা স্ফূর্ত্তি স্বাস্থ্যের লক্ষণ—ইহা কেহই অস্বীকার করে না; কিন্তু এটা জানা উচিত যে, পূর্ণমাত্রা শব্দে এখানে অতিরিক্ত মাত্রা বুঝিলে চলিবে না—যথোচিত মাত্রা বুঝিতে হইবে। যদি বলি যে, পূর্ণ-মাত্রা মস্তিষ্ক চালনা করিবে এবং পূর্ণমাত্রা ব্যায়াম অভ্যাস করিবে, তবে এ দুই কথা পরস্পরের বিরোধী নহে। কিন্তু যদি পূর্ণমাত্রার অর্থ করা যায়—আত্য-

স্তিক মাত্রা, তবে ঐ দুই কথা পরস্পরের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়; তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে, মস্তিষ্ক ভোঁতা করিয়া হস্তপদ পরিচালনা করিবে; এবং হস্ত পদ ক্ষীণ করিয়া মস্তিষ্ক পরিচালনা করিবে। সুস্থ শরীরের একটি প্রধান লক্ষণ এই, প্রধান লক্ষণ কেন—লক্ষণই এই যে, তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পরাধীন; বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীস্থ জীব-শরীরের। উচ্চ শ্রেণীস্থ জীব-শরীরের স্নায়ু-মণ্ডলগুলি যদি মস্তিষ্কের অধীনতা অমান্য করিয়া স্ব স্বপ্রধান হয়, তবে শরীরকে আর বেশী দিন টিঁকিয়া থাকিতে হয় না। শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পৃথক্ স্ফূর্ত্তি এবং একপরতা দুয়ের সমবেত সাহায্যেই জীব-শরীরে পূর্ণ স্ফূর্ত্তির আবির্ভাব হয়;—কিন্তু পৃথক্ স্ফূর্ত্তি যদি একপরতাকে ছাড়াইয়া উঠে তবে শরীর সেই মুহূর্ত্তেই প্রপঞ্চে বিলীন হইয়া যায়; আর যদি একপরতা পৃথক্ স্ফূর্ত্তিকে দলিয়া মারে তবে শরীর সেই মুহূর্ত্তেই প্রস্তর বনিয়া যায়। একপরতা এবং পৃথক্ স্ফূর্ত্তি দুয়ের যোগই সামঞ্জস্য এবং তাহাই স্বাস্থ্যের নিদান।

সপ্তম প্রশ্ন এই যে, দ্বিজেন্দ্র বাবু সামাজিক রোগের যে কবিরাজী চিকিৎসা ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে ব্যাধির অপেক্ষা বটিকা কি সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠিতে পারে না? এবং একটি বৃহৎ জনসমাজ কি সেরূপ চিকিৎসাধীনে আসিতে পারে? ইত্যাদি প্রকার আর আর কথা। ইহার উত্তর এই যে, সামাজিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে প্রশ্নকর্ত্তা বোধ হয় আমার প্রকৃত মন্তব্য কথাটি ঠিক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। যাঁহারা এপক্ষের বা ওপক্ষের চরণোপান্তে জন্মের মত বিক্রীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আমি প্রবন্ধটি লিখি নাই; অসাধ্য রোগের চিকিৎসা করিবার জন্য

আমি বদ্ধপরিকর হই নাই; তবে কি? না—যাঁহাদের শরীরে এখনো পর্য্যন্ত কোনো-পক্ষীয় রোগেরই সঞ্চার হয় নাই, সামাজিক রোগের প্রতি তাঁহাদিগের চক্ষু ফুটাইয়া দেওয়াই প্রবন্ধটির একমাত্র উদ্দেশ্য। সমাজে নানা প্রকার রোগের বীজ কার্য্য করিতেছে—কোনো কোনো বীজ গূঢ়-ভাবে ভিতরে ভিতরে কার্য্য করিতেছে—কোনো কোনো বীজ দেদীপ্যমান প্রকট-ভাবে কার্য্য করিতেছে; ব্যক্তিবিশেষের মুখের কথায় তাহারা যে স্বকার্য্যে বিরত হইবে, ইহা অসম্ভব। রোগের নিবারণ মুখের কথায় হইতে পারে না—হইতে পারে কেবল রোগের সংক্রামকতা-নিবারণ; এইটিই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। ঘোর এপক্ষীয়দিগের অথবা ঘোর ওপক্ষীয়দিগের বাতাস গায়ে লাগিলে অনেক নীরোগ শরীরেও রোগের সঞ্চার হইতে পারে; রোগী ব্যক্তিদিগকে নহে কিন্তু নীরোগ-ব্যক্তিদিগকেই আমি বলিতেছি যে প্রথমে তাঁহারা অনুভয়-পক্ষের মুক্ত বায়ুতে থাকিয়া—পক্ষ-পাতশূন্য হইয়া—জ্ঞান-চর্চ্চা করিবেন; তাহা হইলেই তাঁহারা যখন কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, তখন উভয়-পক্ষের ভাল কোন্‌গুলি মন্দ কোন্‌গুলি তাহা বুঝিতে পারিবেন—বুঝিতে পারিলেই ভালগুলির দিকে তাঁহারা আকৃষ্ট হইবেন, মন্দ-গুলির দিক হইতে পরাঙ্মুখ হইবেন। ও পাড়ায় বসন্ত-রোগ ও পাড়ায় যাইও না,—এ পাড়ায় ম্যালেরিয়া রোগ এ পাড়ায় থাকিও না—নীরোগ পল্লীতে থাকিয়া ব্যায়ামাদি-দ্বারা শরীরকে সবল করিয়া গড়িয়া তোলো; তাহা হইলেই শরীর আপনা হইতেই চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুর ভাল পরমাণু-গুলি আকর্ষণ করিবে, মন্দ পরমাণুগুলি পরিবর্জ্জন করিবে—স্বভাবতই এরূপ করিবে, তোমাকে তাহার জন্য বেশী আয়াস পাইতে হইবে না।

লোকের যত দিন জ্ঞানচক্ষু না ফোটে ততদিন এপক্ষেরও ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে না, ওপক্ষেরও ভালমন্দ বিচার করিতে পারে না। এপক্ষের সংস্কার এই যে, সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে; বিদ্যালয়ের জ্ঞান-শিক্ষার সময় এ সংস্কারকে দূরে সরাইয়া রাখিতে হইবে; তাহার পরে বিদ্যা-শিক্ষা আর এক ধাপ অগ্রসর হইলে মার্শ্‌মান্‌ সাহেবের ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের অনেকগুলি ও-পক্ষীয় ভ্রম মন হইতে দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। অনুভয়-পক্ষে ভর করিয়া জ্ঞান-চর্চ্চা না করিলে কথনই জ্ঞান পরিপক্কতা লাভ করিতে পারে না; আর, উভয়-পক্ষ হইতে ভাল আকর্ষণ এবং মন্দ পরিবর্জ্জন করিতে না পারিলে কাজের সুশৃঙ্খলা হইতে পারে না। এমন কি—কাজের অনুরোধে ঘোর এপক্ষীয় ব্যক্তিরাও ওপক্ষীয় প্রণালী-অনুসারে সভাদি সংস্থাপন এবং প্রচালন করিতে বাধ্য হ'ন।

আমার চিকিৎসা-প্রণালী আর কিছু না—অনুভয়-পক্ষ অবলম্বন করিয়া জ্ঞানচর্চ্চা করিবে এবং উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে অবতীর্ণ হইয়া দুয়ের ভাল যাহা তাহা গ্রহণ করিবে মন্দ যাহা তাহা পরিত্যাগ করিবে। ইহার একটু টীকা করা আবশ্যক; "অনুভয় পক্ষ অবলম্বন করিয়া" অর্থাৎ পক্ষপাতশূন্য হইয়া। "উভয়-পক্ষের মধ্যস্থলে অবতীর্ণ হইয়া দুয়ের ভাল যাহা তাহা গ্রহণ করিবে, মন্দ যাহা তাহা পরিবর্জ্জন করিবে" ইহার অর্থ এ নয় যে, এর ভাল গুণ ও'র ভাল গুণ জোড়াতাড়া দিয়া একটা অদ্ভুত সঙ গড়িয়া তুলিবে। কোনো পক্ষেরই আমি কৃত্রিম অনুকরণ করিতে বলি না। লোকের ক্ষুধা-মান্দ্য হইলে যতই সে আহার করে, ততই তাহার শরীরে রোগ জড়ো হয়, আর, ক্ষুধার উদ্রেক হইলে ভুক্ত অন্নের সারাকর্ষণ এবং অসার পরিবর্জ্জন

করিতে কাহারো কাল-বিলম্ব হয় না। অনুভয়-পক্ষের উচ্চ মঞ্চে থাকিয়া যে ব্যক্তি জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছে সে ব্যক্তি কখনো এপক্ষ এবং ওপক্ষ দুইকে অত্যন্ত ভিন্ন করিয়া দেখে না;—জঠরানল যেমন চাল আর ডালকে অত্যন্ত ভিন্ন করিয়া দেখে না;—সেইরূপ। এ হইতে এ'র ভাল জিনিস—ও-হইতে ও'র ভাল জিনিস লইয়া জোড়াতাড়া দিয়া একটা জিনিস খাড়া করা নিতান্তই কৃত্রিম ব্যাপার; এরূপ কার্য্য আমি কোনো অংশেই শ্রেয় বলি না; তবে কি? না—কিয়ৎকাল উপবাসের পর জঠরানল যেমন ভুক্ত খিচুড়ির চাল হইতেও সারাকর্ষণ করে, ডাল হইতেও সারাকর্ষণ করে;—স্বভাবতই করে; তেমনি অনুভয়-পক্ষের চিত্তসংযমের পর উদ্দীপ্ত জ্ঞানানল উভয় পক্ষ হইতেই সার আকর্ষণ করে—স্বভাবতই এরূপ করে—কৃত্রিমরূপে জোড়াতাড়া দিয়া কিছুই করে না। অনুভয়-পক্ষই জ্ঞান চর্চ্চা এবং সংযম-শিক্ষার উচ্চ মঞ্চ, আর, উভয়-পক্ষের মধ্যস্থলই কার্য্য শিক্ষার উর্ব্বরাক্ষেত্র। মধুকর, বিকসিত শতদলের এদল হইতে ওদলে, ও-দল হইতে এ-দলে, যুগযুগান্তর ঘুরিয়া বেড়াইলেও এক বিন্দুও মধু পাইতে পারে না; কিন্তু সকল দলের সম্মিলন-স্থানে অবতীর্ণ হইলে সেইখানেই মধুর অন্বেষণ পাইতে পারে। প্রশ্ন-কর্ত্তার কথার ভাব এই যে, জোড়াতাড়া দিয়া একটা জিনিস খাড়া করা নিতান্তই কৃত্রিম ব্যাপার—আমিও তাহাই বলি; অধিকন্তু আমি এই বলি যে, জোড়াতাড়া দিয়া নহে—জ্ঞানের স্বাভাবিক অভিব্যক্তিবলে উভয় পক্ষ হইতেই সারাকর্ষণ করা যাইতে পারে—তা শুধু নয় (মুখে যিনি যাহা বলুন) বাস্তবিক তাহাই আমরা করিতেছি এবং সেই গতিকে অল্প অল্প করিয়া উন্নতিপথে অগ্রসর হইতেছি। কেবল, যাঁহারা রোগাক্রান্ত,

তাঁহারাই একবার ও-পক্ষের চরণ-প্রান্তে গা ঢালিতেছেন, তাহার পরেই এ-পক্ষের চরণ-প্রান্তে গড়াগড়ি দিতেছেন; সোজাপথে চলা ইঁহাদের শাস্ত্রে লেখে না। প্রশ্নকর্ত্তা যদি বলেন, এরূপ রোগ জন-সমাজে অনিবার্য্য; তবে, তাঁহার জানা উচিত যে, আমিও তাহাই বলি; কেবল, অধিকন্তু আর-একটি কথা এই বলি যে, জনসমাজে রোগের প্রাদুর্ভাব হইলেই তাহার প্রতিবিধান-চেষ্টা, অন্ততঃ তাহার সংক্রামকতা-নিবারণ চেষ্টা, তেমনিই একটি অনিবার্য্য ব্যাপার।

আমরাই যে কেবল এইরূপ করিয়া (অর্থাৎ নানা দিকের ভাল আত্মসাৎ এবং মন্দ পরিবর্জ্জন করিয়া) উন্নতি লাভ করিতেছি তাহা নহে—সকল জাতিই এইরূপ করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমার চিকিৎসা-প্রবন্ধের মূল কথা এই যে, জন-সমাজের উন্নতি শুধু দেশের উপরেও নির্ভর করে না, শুধু কালের উপরেও নির্ভর করে না—কিন্তু দেশ এবং কাল দুয়ের সমবেত কার্য্যকারিতার উপর নির্ভর করে। কাল যদি বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ না ঘটাইবে তবে কাল কিসের জন্য? দেশ যদি বিভিন্ন সমাজকে শৈশবাবস্থায় আগ্‌লিয়া না রাখিয়া পরিপোষণ না করিবে তবে দেশ কিসের জন্য? কাল, বিভিন্ন দেশের এর ওর তার পরস্পরের সঙ্গে কিরূপে যোগাযোগ ঘটায় এবং সেই গতিকে এক এক দেশ কিরূপে উন্নতির কেন্দ্র-স্বরূপ হইয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত নূতন জীবনের সঞ্চার করে, তাহার প্রমাণ অন্বেষণ করিবার জন্য দূরে যাইতে হইবে না—ইংরাজ জাতি তাহার একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ইংরাজ জাতি ক্রুসেডের সময় হইতে কত দেশের কত ভাল আত্মসাৎ করিয়াছে—মন্দ হইতে ভাল বাছিয়া ভাল আত্মসাৎ করিয়াছে—কৃত্রিমরূপে জোড়াতাড়া

দিয়া নহে কিন্তু স্বাভাবিক প্রণালীতে আত্মসাৎ করিয়াছে—তবে তাহারা আজ সভ্যতম জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা এক্ষণে ইংরাজদের যা তা আত্মসাৎ করিতেছি কিন্তু ইংরাজেরা ক্রুসেডের সময় পূর্ব্ব অঞ্চল হইতে অনেক নূতন নূতন ভাব সংগ্রহ করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই—অথচ মুসলমানদিগের রকমসকম চাল্‌চোল্ বিলাসিতা প্রভৃতি নিতান্তই হেয় জ্ঞান করিত। সত্য কি মিথ্যা সর্ ওয়াল্টর স্কট্ প্রণীত Talisman এবং Betrohed পাঠ করিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে।

রেলপথের দুই পার্শ্বে।

(য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী।)

৭ সেপ্টেম্বর। আজ সকালে ব্রিন্দিশি পৌঁছন গেল। মেল গাড়ি প্রস্তুত ছিল, আমরা গাড়িতে উঠ্‌লুম।

গাড়ি যখন ছাড়্‌ল তখন টিপ্‌টিপ্ করে' বৃষ্টি আরম্ভ হয়েচে আহার করে' এসে একটি কোণে জান্‌লার কাছে বসা গেল।

প্রথমে, দুইধারে কেবল আঙুরের ক্ষেত। তার পরে জলপাইয়ের বাগান। জলপাইয়ের গাছগুলো নিতান্ত বাঁকাচোরা, গ্রন্থি ও ফাটলবিশিষ্ট, বলি-অঙ্কিত, বেঁটেখাটো রকমের; পাতাগুলো ঊর্দ্ধমুখ; প্রকৃতির হাতের কাজে যেমন একটি সহজ অনায়াসের ভাব দেখা যায়, এই গাছগুলোয় তার বিপরীত। এরা নিতান্ত দরিদ্র লক্ষ্মীছাড়া, বহু কষ্ট বহু চেষ্টায় কায়ক্লেশে

অষ্টাবক্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; এক একটা এমন বেঁকে ঝুঁকে পড়েচে যে পাথর উঁচু করে' তাদের ঠেকো দিয়ে রাখ্‌তে হয়েচে।

বামে চষা মাঠ; শাদা শাদা ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাথরের টুক্‌রো চষা মাটির মধ্যে মধ্যে উৎক্ষিপ্ত। দক্ষিণে সমুদ্র। সমুদ্রের একেবারে ধারেই এক একটি ছোট ছোট সহর দেখা দিচ্চে। চর্চ্চ চূড়া-মুকুটিত শাদা ধব্‌ধবে নগরীটি একটি পরিপাটি তন্বী নাগরীর মত কোলের কাছে সমুদ্র-দর্পণ রেখে নিজের মুখ দেখে হাস্‌চে। নগর পেরিয়ে আবার মাঠ। ভুট্টার ক্ষেত, আঙুরের ক্ষেত, ফলের বাগান, জলপাইয়ের বন; ক্ষেতগুলি খণ্ড প্রস্তরের বেড়া দেওয়া। মাঝে মাঝে এক একটি বাঁধা কূপ। দূরে দূরে দুটো একটা সঙ্গীহীন ছোট শাদা বাড়ি।

সূর্য্যাস্তের সময় হয়ে এল। আমি কোলের উপর এক থোলো আঙুর নিয়ে বসে' বসে' এক আধটা করে' মুখে দিচ্চি। এমন মিষ্ট টস্‌টসে, সুগন্ধ আঙুর ইতিপূর্ব্বে কখন খাইনি। মাথায় রঙীন্ রুমাল বাঁধা ঐ ইতালীয়া যুবতীকে দেখে আমার মনে হচ্চে, ইতালীয়ানীরা এখানকার আঙুরের গুচ্ছের মত, অম্‌নি একটি বৃন্তভরা অজস্র সুডোল সৌন্দর্য্য, যৌবনরসে অম্‌নি উৎপূর্ণ,—এবং ঐ আঙুরেরই মত তাদের মুখের রং—অতি বেশি শাদা নয়।

এখন একটা উচ্চ সমুদ্রতটের উপর দিয়ে চলেচি। আমাদের ঠিক নীচেই ডানদিকে সমুদ্র। ভাঙ্গাচোরা জমি ঢালু হয়ে জলের মধ্যে প্রবেশ করেচে। গোটা চার পাঁচ পালমোড়া নৌকা ডাঙ্গার উপর তোলা। নীচেকার পথ দিয়ে গাধার উপর চড়ে' লোক চলেচে। সমুদ্রতীরে কতকগুলো গরু চরচে—কি খাচ্চে তারাই জানে;—মাঝে মাঝে কেবল কতকগুলো শুক্‌নো খড়্‌কের মত আছে মাত্র।

রাত্রে আমরা গাড়ির ভোজনশালায় ডিনারে বসেচি, এমন সময় গাড়ি একটা ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। এক দল নরনারী প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে ভীড় করে' বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের ভোজ দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তারি মধ্যে গ্যাসের আলোকে দুটি একটি সুন্দর মেয়ের মুখ দেখা যাচ্ছিল, তা'তে করে' ভোজনপাত্র থেকে আমাদের চিত্তকে অনেকটা পরিমাণে বিক্ষিপ্ত কর্‌ছিল। ট্রেন্‌ ছাড়বার সময় আমাদের সহযাত্রীগণ তাদের প্রতি অনেক টুপি রুমাল আন্দোলন, অনেক চুম্বন সঙ্কেত প্রেরণ, তারস্বরে অনেক উল্লাসধ্বনি প্রয়োগ করলে; তারাও গ্রীবা আন্দোলনে আমাদের প্রত্যভিবাদন করতে লাগ্‌ল।

৮ সেপ্টেম্বর। কাল অ্যাড্রিয়াটিকের সমতল শ্রীহীন তীর-ভূমি দিয়ে আস্‌ছিলুম আজ শস্যশ্যামলা লম্বার্ডির মধ্যে দিয়ে গাড়ি চল্‌চে। চারিদিকে আঙুর, জলপাই, ভুট্টা ও তুঁতের ক্ষেত। কাল যে আঙুরের লতা দেখা গিয়েছিল সেগুলো ছোট ছোট গুল্মের মত। আজ দেখ্‌চি, ক্ষেতময় লম্বা লম্বা কাঠি পোঁতা, তারি উপর ফলগুচ্ছপূর্ণ দ্রাক্ষালতা লতিয়ে উঠেচে।

ক্রমে পাহাড় দেখা দিচ্চে। পাহাড়ের উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত দ্রাক্ষাদণ্ডে কণ্টকিত হয়ে উঠেচে, তারি মাঝখানে এক একটি লোকালয়।

রেলের লাইনের ধারে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কুটীর; এক হাতে তারি একটি দুয়ার ধরে,' এক হাত কোমরে দিয়ে একটি ইতালিয়ান যুবতী সকৌতুক কৃষ্ণনেত্রে আমাদের গাড়ির গতি নিরীক্ষণ করচে। অনতিদূরে একটি ছোট বালিকা একটা প্রখরশৃঙ্গ প্রশস্তস্কন্ধ প্রকাণ্ড গরুর গলার দড়িটি ধরে' নিশ্চিন্ত মনে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে। তার থেকে আমাদের

বাঙ্গলা দেশের নব দম্পতির চিত্র মনে পড়্‌ল। মস্ত একটা চষমা-পরা দাড়িওয়ালা গ্র্যাজুয়েট্ পুঙ্গব, এবং তারি দড়িটি ধরে' ছোট্ট একটি বারো-তেরো বৎসরের নোলকপরা নববধূ; জন্তুটি দিব্যি পোষ মেনে চরে' বেড়াচ্চে, এবং মাঝে মাঝে বিস্ফারিত নয়নে কর্ত্রীর প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করচে।

ট্যুরিন্ ষ্টেশনে আসা গেল। এ দেশের সামান্য পুলিশ-ম্যানের সাজ দেখে অবাক্ হতে হয়। মস্ত চূড়াওয়ালা টুপি, বিস্তর জরিজরাও, লম্বা তলোয়ার,—সকল ক'টিকেই সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র বলে' মনে হয়। আমাদের দেশে এ রকম জম্‌কালো পাহারাওয়ালা থাক্‌লে আমরা সর্ব্বদা ডরিয়ে ডরিয়ে আরো কাহিল হয়ে যেতুম।

দক্ষিণে বামে তুষাররেখাঙ্কিত সুনীল পর্ব্বতশ্রেণী দেখা দিয়েচে। বামে ঘনচ্ছায়া স্নিগ্ধ অরণ্য। যেখানে অরণ্যের একটু বিচ্ছেদ পাওয়া যাচ্চে সেইখানেই শস্যক্ষেত্র তরুশ্রেণী ও পর্ব্বত সমেত এক একটা নব নব আশ্চর্য্য দৃশ্য খুলে যাচ্চে। পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর পুরাতন দুর্গশিখর, তলদেশে এক একটি ছোট ছোট গ্রাম। যত এগোচ্চি অরণ্য পর্ব্বত ক্রমশঃ ঘন হয়ে আস্‌চে। মাঝে মাঝে যে গ্রামগুলি আস্‌চে সেগুলি তেমন উদ্ধত শুভ্র নবীন পরিপাটি নয়; একটু যেন ম্লান দরিদ্র নিভৃত; একটি আধ্‌টি চর্চ্চের চূড়া আছে মাত্র; কিন্তু কল কারখানার ধূমোদ্গারী বৃংহিতধ্বনিত ঊর্দ্ধমুখী ইষ্টকশুণ্ড নেই।

ক্রমে অল্পে অল্পে পাহাড়ের উপরে ওঠা যাচ্চে। পার্ব্বত্যপথ সাপের মত এঁকে বেঁকে চলেচে; ঢালু পাহাড়ের উপর চষাক্ষেত সোপানের মত থাকে থাকে উঠেচে। একটি গিরিনদী স্বচ্ছ সফেন জলরাশি নিয়ে সঙ্কীর্ণ উপলপথ দিয়ে ঝরে' পড়চে।

গাড়িতে আলো দিয়ে গেল। এখনি মণ্ট্ সেনিসের বিখ্যাত দীর্ঘ রেলোয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। গহ্বরটি উত্তীর্ণ হতে প্রায় আধঘণ্টা লাগ্‌ল।

এইবার ফ্রান্স। দক্ষিণে এক জলস্রোত ফেনিয়ে ফেনিয়ে চলেচে। ফরাসী জাতির মত দ্রুত চঞ্চল উচ্ছ্বসিত হাস্যপ্রিয় কলভাষী। কিন্তু তাদের চেয়ে অনেক নির্ম্মল এবং শিশুস্বভাব।

ফ্রান্সের প্রবেশদ্বারে একবার একজন কর্ম্মচারী গাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করে' গেল আমাদের মাশুল দেবার যোগ্য জিনিষ কিছু আছে কি না—আমরা বল্লুম, না। আমাদের একজন বৃদ্ধ সহযাত্রী ইংরাজ বল্লেন, I don't parlez-vous francais.

সেই স্রোত এখনো আমাদের ডান দিক দিয়ে চলেচে। তার পূর্ব্বতীরে "ফার্" অরণ্য নিয়ে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। চঞ্চলা নির্ঝরিণী বেঁকে চুরে ফেনিয়ে ফুলে নেচে কলরব করে' পাথর-গুলোকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ঠেলে রেলগাড়ির সঙ্গে সমান দৌড়বার চেষ্টা করচে। মাঝে মাঝে এক একটা লোহার সাঁকো মুষ্টি দিয়ে তার ক্ষীণ কটিদেশ পরিমাপ করবার চেষ্টা করচে। এক জায়গায় জলরাশি খুব সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেচে; দুই তীরের শ্রেণীবদ্ধ দীর্ঘ বৃক্ষগুলি শাখায় শাখায় বেষ্টন করে' দুরন্ত স্রোতকে অন্তঃপুরে বন্দী করবার বৃথা চেষ্টা করচে। উপর থেকে ঝরণা এসে সেই প্রবাহের সঙ্গে মিশ্‌চে। বরাবর পূর্ব্বতীর দিয়ে একটি পার্ব্বত্য পথ সমরেখায় স্রোতের সঙ্গে বেঁকে বেঁকে চলে গেছে। এক জায়গায় আমাদের সহচরীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হল। হঠাৎ সে দক্ষিণ থেকে বামে এসে এক অজ্ঞাত সঙ্কীর্ণ শৈলপথে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে এক একটা পাহাড় তৃণহীন সহস্র রেখাঙ্কিত পাষাণ-কঙ্কাল প্রকাশ করে' নগ্নভাবে

দাঁড়িয়ে আছে; কেবল তার মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় খানিকটা করে' অরণ্যের খণ্ড আবরণ রয়েচে। প্রচণ্ড সংগ্রামে একটা দৈত্য সহস্র হিংস্র নখের বিদারণ-রেখা রেখে যেন ওর শ্যামল ত্বক্ অনেকখানি করে' আঁচ্‌ড়ে ছিঁড়ে নিয়েচে।

আবার হঠাৎ ডান দিকে আমাদের সেই পূর্ব্বসঙ্গিনী মুহূর্ত্তের জন্যে দেখা দিয়ে বামে চলে গেল। একবার দক্ষিণে একবার বামে, একবার অন্তরালে। ফরাসী ললনার মত বিচিত্র কৌতুক-চাতুরী। আবার হয় ত যেতে যেতে কোন্ এক পর্ব্বতের আড়াল থেকে সহসা কলহাস্যে করতালি দিয়ে আচম্‌কা দেখা দেবে।

সেই জলপাই এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জ অনেক কমে' গেছে। বিবিধ শস্যের ক্ষেত্র এবং দীর্ঘ সরল পপ্লার গাছের শ্রেণী। ভূট্টা, তামাক, নানাবিধ শাক সব্‌জি। মনে হয় কেবলি বাগানের পর বাগান আস্‌চে। এই কঠিন পর্ব্বতের মধ্যে মানুষ বহুদিন থেকে বহু যত্নে প্রকৃতিকে বশ করে' তার উচ্ছৃঙ্খলতা হরণ করেচে। প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের উপর মানুষের কত প্রয়াস প্রকাশ পাচ্চে। এদেশের লোকেরা যে আপনার দেশকে ভালবাস্‌বে তার আর কিছু আশ্চর্য্য নেই। এরা আপনার দেশকে আপনার যত্নে আপনার করে' নিয়েচে। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুকাল থেকে একটা বোঝাপড়া হয়ে আস্‌চে, উভয়ের মধ্যে ক্রমিক আদান প্রদান চল্‌চে, তারা পরস্পর সুপরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। একদিকে প্রকাণ্ড প্রকৃতি উদাসীন ভাবে দাঁড়িয়ে আর একদিকে বৈরাগ্যবৃদ্ধ মানব উদাসীন ভাবে শুয়ে—য়ুরোপের সে ভাব নয়। এদের এই সুন্দরী ভূমি এদের একান্ত সাধনার ধন, একে এরা নিয়ত বহু আদর করে' রেখেচে। এর জন্যে যদি প্রাণ না দেবে ত কিসের জন্যে দেবে! এই প্রেয়সীর প্রতি কেউ

তিলমাত্র হস্তক্ষেপ কর্‌লে কি আর সহ্য হয়? আমরা ত জঙ্গলে থাকি; খাল বিল বন বাদাড় ভাঙ্গারাস্তা এবং পানাপুকুরের ধারে বাস করি। ক্ষেত থেকে দু'মুঠো ধান আনি, মেয়েরা আঁচল ভরে' শাক তুলে নিয়ে আসে, ছেলেরা পাঁকের মধ্যে নেমে চিংড়িমাছ ধরে' আনে, প্রাঙ্গণের গাছ থেকে গোটাকতক তেঁতুল পাড়ি, তার পরে শুক্‌নো কাঠকুট্ সংগ্রহ করে' একবেলা অথবা দু'বেলা কোন রকম করে' আহার চলে' যায়; ম্যালেরিয়া এসে যখন জীর্ণ অস্থিকঙ্কাল কাঁপিয়ে তোলে তখন কাঁথা মুড়ি দিয়ে রৌদ্রে পড়ে' থাকি, গ্রীষ্মকালে শুষ্কপ্রায় পঙ্ককুণ্ডের হরিদ্বর্ণ জলাবশেষ থেকে উঠে এসে ওলাউঠা যখন আমাদের গৃহ আক্রমণ করে তখন ওলা দেবীর পূজা দিই, এবং অদৃষ্টের দিকে কোটর-প্রবিষ্ট হতাশ শূন্যদৃষ্টি বদ্ধ করে' দল বেঁধে মর্‌তে আরম্ভ করি। আমরা কি আমাদের দেশকে পেয়েছি না পেতে চেষ্টা করেছি? আমরা ইহলোকের প্রতি ঔদাস্য করে' এখানে কেবল অনিচ্ছুক পথিকের মত যেখানে সেখানে পড়ে' থাকি এবং যত শীঘ্র পারি দ্রুতবেগে বিশ পঁচিশটা বৎসর ডিঙ্গিয়ে একেবারে পরলোকে গিয়ে উপস্থিত হই।

কিন্তু একি চমৎকার চিত্র! পর্ব্বতের কোলে, নদীর ধারে, হ্রদের তীরে পপ্লার-উইলোবেষ্টিত কাননশ্রেণী। নিষ্কণ্টক নিরাপদ নিরাময় ফলশস্যপরিপূর্ণ প্রকৃতি প্রতিক্ষণে মানুষের ভালবাসা পাচ্চে এবং মানুষকে দ্বিগুণ ভালবাস্‌চে। মানুষের মত জীবের এইত যোগ্য আবাসস্থান। মানুষের প্রেম এবং মানুষের ক্ষমতা যদি আপনার চতুর্দ্দিককে সংযত সুন্দর সমুজ্জ্বল করে' না তুল্‌তে পারে তবে তরুকোটর গুহাগহ্বর বনবাসী জন্তুর সঙ্গে তার প্রভেদ কি?

সাহিত্য।

(পত্রোত্তর)

তুমি আমাকে খানিকটা ভুল বুঝেছ সন্দেহ নেই। আমিও বোধ করি কিঞ্চিৎ ঢিলে রকমে ভাব প্রকাশ করেছিলুম—কিন্তু সে জন্যে আমার কোন দুঃখ নেই। কারণ, ভুল না বুঝলে অনেক সময় এক কথায় সমস্ত শেষ হয়ে যায়, অনেক কথা বল্‌বার অবসর পাওয়া যায় না। খাবার জিনিষ মুখে দেবা মাত্র মিলিয়ে গেলে যেমন তার সম্পূর্ণ স্বাদগ্রহণ করা যায় না তেমনি ভুল না বুঝলে, শোন্‌বামাত্র অবাধে মতের ঐক্য হলে, কথাটা একদমে উদরস্থ হয়ে যায়—রয়ে বসে' তার সমস্তটার পূরো আস্বাদ পাওয়া যায় না।

তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ সে যে তোমার দোষ তা আমি বল্‌তে চাইনে। আপনার ঠিক মতটি নির্ভুল করে' ব্যক্ত করা ভারি শক্ত। এক মানুষের মধ্যে যেন দুটো মনুষ্য আছে, ভাবুক এবং লেখক। যে লোকটা ভাবে, সেই লোকটাই যে সব সময়ে লেখে তা ঠিক মনে হয় না। লেখক-মনুষ্যটি ভাবুক-মনুষ্যটির প্রাইভেট্ সেক্রেটারি। তিনি অনেক সময়ে অনবধানতা কিম্বা অক্ষমতা বশতঃ ভাবুকের ঠিক ভাবটি প্রকাশ করেন না। আমি মনে করচি, আমার যেটি বক্তব্য আমি সেটি ঠিক লিখে যাচ্চি, এবং সকলের কাছেই সেটা পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠ্‌চে, কিন্তু আমার লেখনী যে কখন্ পাশের রাস্তায় চলে গেছেন আমি হয় ত তা' জান্‌তেও পারি নি।

কিন্তু তার ভুলের জন্যে আমিই দায়ী; তার উপরে দোষারোপ করে' আমি নিষ্কৃতি পেতে পারিনে। এই জন্যে অনেক

সময়ে দায়ে পড়ে' তার পক্ষ সমর্থন করতে হয়। যেটা ঠিক আমার মত নয় সেইটেকেই আমার মত বলে' ধরে নিয়ে প্রাণপণে লড়াই করে' যেতে হয়। কারণ আমার নিজের মধ্যে যে একটা গৃহবিচ্ছেদ আছে সেটা বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করতে ইচ্ছে করে না।

সাহিত্য যে কেবল লেখকের আত্মপ্রকাশ, আমার চিঠিতে যদি এই কথা বেরিয়ে গিয়ে থাকে তা হলে অগত্যা যতক্ষণ পারা যায় তার হয়ে লড়তে হবে, এবং সে কথাটার মধ্যে যতটুকু সত্য আছে তা সমস্তটা আদায় করে' নিয়ে তার পরে তাকে ইক্ষুর চর্ব্বিত অংশের মত ফেলে দিলে কোন ক্ষতি হবে না। আমরা যে ভাবে চলেচি তাতে তাড়াতাড়ি একটা কথা সংশোধন করবার কোন দরকার দেখিনে।

তুমি বলেছ, সাহিত্য যদি লেখকের আত্মপ্রকাশই হবে তবে শেক্সপিয়রের নাটককে কি বল্‌বে!—সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া অসম্ভব অতএব একটু খোলসা করে' বলি।

আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষা এই দুই নিয়ম জীবজগতে কার্য্য করে। এক হিসাবে দুটোকেই এক নাম দেওয়া যেতে পারে। কারণ, বংশরক্ষা প্রকৃত পক্ষে বৃহৎভাবে ব্যাপক ভাবে সুদূর ভাবে আত্মরক্ষা। সাহিত্যের কার্য্যকে তেমনি দুই অংশে ভাগ করা যেতে পারে। আত্মপ্রকাশ এবং বংশপ্রকাশ। গীতিকাব্যকে আত্মপ্রকাশ এবং নাট্যকাব্যকে বংশপ্রকাশ নাম দেওয়া যাক্।

আত্মপ্রকাশ বল্‌তে কি বোঝায়, তার আর বাহুল্য বর্ণনার আবশ্যক নেই। কিন্তু বংশপ্রকাশ কথাটার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক।

লেখকের নিজের অন্তরে একটি মানবপ্রকৃতি আছে এবং লেখকের বাহিরে সমাজে একটি মানবপ্রকৃতি আছে, অভিজ্ঞতা-সূত্রে, প্রীতিসূত্রে এবং নিগূঢ় ক্ষমতাবলে এই উভয়ের সম্মিলন হয়; এই সম্মিলনের ফলেই সাহিত্যে নূতন নূতন প্রজা জন্মগ্রহণ করে। সেই সকল প্রজার মধ্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি দুইই সম্বদ্ধ হয়ে আছে, নইলে কখনই জীবন্ত সৃষ্টি হতে পারে না। কালিদাসের দুষ্মন্ত শকুন্তলা এবং মহাভারতকারের দুষ্মন্ত শকুন্তলা এক নয়,—তার প্রধান কারণ কালিদাস এবং বেদব্যাস এক লোক নন্, উভয়ের অন্তরপ্রকৃতি ঠিক এক ছাঁচের নয়; সেইজন্য তাঁরা বাহিরের মানবপ্রকৃতি থেকে যে দুষ্মন্ত শকুন্তলা গঠিত করেচেন তাদের আকার প্রকার ভিন্ন রকমের হয়েচে। তাই বলে বলা যায় না যে কালিদাসের দুষ্মন্ত অবিকল কালিদাসের প্রতিকৃতি—কিন্তু তবু একথা বল্‌তেই হবে তার মধ্যে কালিদাসের অংশ আছে নইলে সে অন্য-রূপ হত। তেম্‌নি শেক্সপিয়রের অনেকগুলি সন্তানের এক একটি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়েচে বলে যে তাদের মধ্যে শেক্স-পিয়রের আত্মপ্রকৃতির কোন অংশ নেই তা আমি স্বীকার কর্‌তে পারিনে। সে রকম প্রমাণ অবলম্বন করতে গেলে পৃথিবীর অধিকাংশ ছেলেকেই পিতৃঅংশ হতে বিচ্যুত হতে হয়। ভাল নাট্যকাব্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি এম্‌নি অবিচ্ছিন্ন ঐক্য রক্ষা করে' মিলিত হয় যে উভয়কে স্বতন্ত্র করা দুঃসাধ্য।

অন্তরে বাহিরে এই রকম একীকরণ না করতে পারলে কেবলমাত্র বহুদর্শিতা এবং সূক্ষ্ম বিচারশক্তিবলে কেবল রক্ফুকো প্রভৃতির ন্যায় মানবচরিত্র সম্বন্ধে লোকসংসার সম্বন্ধে পাকা

প্রবন্ধ লিখ্‌তে পারা যায়—কিন্তু শেক্সপিয়র তাঁর নাটকের পাত্র-গণকে নিজের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত করে' তুলেছিলেন, অন্তরের নাড়ির মধ্যে প্রবাহিত প্রতিভার মাতৃরস পান করিয়েছিলেন, তবেই তারা মানুষ হয়ে উঠেছিল, নইলে তারা কেবলমাত্র প্রবন্ধ হত। অতএব এক হিসাবে শেক্সপিয়রের রচনাও আত্ম-প্রকাশ কিন্তু খুব সম্মিশ্রিত, বৃহৎ এবং বিচিত্র।

সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হচ্চে মানবজীবনের সম্পর্ক। মানুষের মানসিক জীবনটা কোন্‌খানে? যেখানে আমাদের বুদ্ধি এবং হৃদয় বাসনা এবং অভিজ্ঞতা সবগুলি গলে' গিয়ে মিশে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ ঐক্যলাভ করেছে। যেখানে আমাদের বুদ্ধি প্রবৃত্তি এবং রুচি সম্মিলিতভাবে কাজ করে। এক কথায়, যেখানে আদত মানুষটি আছে। সেইখানেই সাহিত্যের জন্মলাভ হয়। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশ পায়। সেই খণ্ড অংশগুলি বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি রচনা করে। পর্য্যবেক্ষণ-কারী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে, চিন্তাশীল মানুষ দর্শন রচনা করে, এবং সমগ্র মানুষটি সাহিত্য রচনা করে।

গেটে উদ্ভিদতত্ত্ব সম্বন্ধে বই লিখেচেন। তাতে উদ্ভিদ্‌রহস্য প্রকাশ পেয়েচে, কিন্তু গেটের কিছুই প্রকাশ পায়নি, অথবা সামান্য এক অংশ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু গেটে যে সমস্ত সাহিত্য রচনা করেচেন, তার মধ্যে মূল মানবটি প্রকাশ পেয়ে-ছেন। বৈজ্ঞানিক গেটের অংশও অলক্ষিত মিশ্রিত ভাবে তার মধ্যে আছে। যিনি যাই বলুন্‌ শেক্সপিয়রের কাব্যের কেন্দ্রস্থলেও একটি অমূর্ত্ত ভাবশরীরী শেক্সপিয়রকে পাওয়া যায়, যেখান থেকে তাঁর জীবনের সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস বিরাগ অনুরাগ বিশ্বাস অভিজ্ঞতা সহজ জ্যোতির মত চতুর্দ্দিকে বিচিত্র শিখায়

বিবিধ বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়্‌চে। যেখান থেকে ইয়াগোর প্রতি বিদ্বেষ, ওথেলোর প্রতি অনুকম্পা, ডেস্‌ডিমোনার প্রতি প্রীতি, ফল্‌ষ্টাফের প্রতি সকৌতুক সখ্য, লীয়ারের প্রতি সসম্ভ্রম করুণা, কর্ডেলিয়ার প্রতি সুগভীর স্নেহ শেক্সপীয়রের মানব-হৃদয়কে চিরদিনের জন্য ব্যক্ত ও বিকীর্ণ করচে।

সাহিত্যের সত্য কাকে বলা যেতে পারে এইবার সেটা বল্‌বার অবসর হয়েচে।

লেখাপড়া, দেখাশুনা, কথাবার্ত্তা, ভাবাচিন্তা সবসুদ্ধ জড়িয়ে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সমগ্র জীবন দিয়ে নিজের সম্বন্ধে, পরের সম্বন্ধে, জগতের সম্বন্ধে একটা মোট্‌ সত্য পাই। সেই-টেই আমাদের জীবনের মূল সুর। সমস্ত জগতের বিচিত্র সুরকে আমরা সেই সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিই, এবং আমাদের সমস্ত জীবন-সঙ্গীতকে সেই সুরের সঙ্গে বাঁধি। সেই মূল তত্ত্ব অনুসারে, আমরা সংসারে বিরক্ত অথবা অনুরক্ত, স্বদেশবদ্ধ অথবা সার্ব্বভৌমিক, পার্থিব অথবা আধ্যাত্মিক, কর্ম্মপ্রিয় অথবা চিন্তাপ্রিয়। আমার জীবনের সেই মূল তত্ত্বটি,—জগতের সমস্ত সত্য আমার জীবনের মধ্যে সেই যে একটি জীবন্ত ব্যক্তিগত পরিণতি লাভ করেচে সেইটি আমার রচনার মধ্যে প্রকাশ্যে অথবা অলক্ষিত ভাবে আত্মাস্বরূপে বিরাজ করবেই। আমি গীতিকাব্যই লিখি আর যাই লিখি কেবল তাতে যে আমার ক্ষণিক মনোভাবের প্রকাশ হয় তা নয়, আমার মর্ম্মসত্যটিও তার মধ্যে আপনার ছাপ দেয়। মানুষের জীবনকেন্দ্রগত এই মূল সত্য সাহিত্যের মধ্যে আপনাকে নানা আকারে প্রতিষ্ঠিত করে এই জন্যে একেই সাহিত্যের সত্য বলা যেতে পারে, জ্যামিতির সত্য কখন সাহিত্যের সত্য হতে পারে না। এই

সত্যটি বৃহৎ হলে পাঠকের স্থায়ী এবং গভীর তৃপ্তি হয় এই সত্যটি সঙ্কীর্ণ হলে পাঠকের বিরক্তি জন্মে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে বল্‌তে পারি, ফরাসী কবি গোটিয়ে রচিত "ম্যাড্‌মোয়াজেল্‌ ডে মোপ্যাঁ" পড়ে' (বলা উচিত, আমি ইংরাজি অনুবাদ পড়েছিলুম) আমার মনে হয়েছিল—গ্রন্থটির রচনা যেমনই হোক্‌ তার মূল তত্ত্বটি জগতের যে অংশকে সীমাবদ্ধ করেচে সেটুকুর মধ্যে আমরা বাঁচ্‌তে পারিনে। গ্রন্থের মূল ভাবটা হচ্চে একজন যুবক হৃদয়কে দূরে রেখে' কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেশদেশান্তরে সৌন্দর্য্যের সন্ধান করে' ফিরচে। সৌন্দর্য্য যেন প্রস্ফুটিত জগৎ-শতদলের উপর লক্ষ্মীর মত বিরাজ করছে না, সৌন্দর্য্য যেন মণিমুক্তার মত কেবল অন্ধকার খণিগহ্বরে ও অগাধ সমুদ্রতলে প্রচ্ছন্ন, যেন তা' গোপনে আহরণ করে' আপনার ক্ষুদ্র সম্পত্তির মত কৃপণের সঙ্কীর্ণ সিন্ধুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখ্‌বার জিনিষ! এই জন্য এই গ্রন্থের মধ্যে হৃদয় অধিকক্ষণ বাস করতে পারে না; রুদ্ধশ্বাস হয়ে তাড়াতাড়ি উপরে বেরিয়ে এসে যখন আমাদের প্রতিদিনের শ্যামল তৃণক্ষেত্র, প্রতিদিনের সূর্য্যালোক প্রতিদিনের হাসিমুখগুলি দেখ্‌তে পাই তখনি বুঝতে পারি সৌন্দর্য্য এই ত আমাদের চারিদিকে, সৌন্দর্য্য এই ত আমাদের প্রতিদিনের ভালবাসার মধ্যে। এই বিশ্বব্যাপী সত্যকে সঙ্কীর্ণ করে' আনাতে পূর্ব্বোক্ত ফরাসী গ্রন্থে সাহিত্যশিল্পের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও সাহিত্য-সত্যের স্বল্পতা হয়েছে বলা যেতে পারে। ম্যাড্‌মোয়াজেল্‌ ডে মোপ্যাঁ এবং গোটিয়ে সম্বন্ধে আমার সমালোচনা ভ্রমাত্মক হবার সম্ভাবনা থাক্‌তে পারে—কিন্তু এই দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার কথাটা কতকটা পরিষ্কার করা গেল। শেলি বল, কীট্‌স্‌ বল, টেনিসন্‌ বল সক-

লের লেখাতেই রচনার ভালমন্দর মধ্যেও একটা মর্ম্মগত মূল জিনিষ আছে, তারি উপর ঐ সকল কবিতার ধ্রুবত্ব ও মহত্ত্ব নির্ভর করে। সেই জিনিষটাই ঐ সকল কবিতার সত্য। সেটাকে যে আমরা সকল সময়ে কবিতা বিশ্লেষণ করে' সমগ্র বের করতে পারি তা নয় কিন্তু তার শাসন আমরা বেশ অনুভব করতে পারি।

গোটিয়ের সহিত ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থের তুলনা করা যেতে পারে। ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থের কবিতার মধ্যে যে সৌন্দর্য্যসত্য প্রকাশিত হয়েচে, তা পূর্ব্বোক্ত ফরাসীস্ সৌন্দর্য্যসত্য অপেক্ষা বিস্তৃত। তাঁর কাছে পুষ্প পল্লব নদী নির্ঝর পর্ব্বত প্রান্তর সর্ব্বত্রই নব নব সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌চে। কেবল তাই নয়, তার মধ্যে তিনি একটা আধ্যাত্মিক বিকাশ দেখ্‌তে পাচ্চেন—তা'তে করে' সৌন্দর্য্য অনন্ত বিস্তার এবং অনন্ত গভীরতা লাভ করেচে। তার ফল এই যে, এরকম কবিতায় পাঠকের শ্রান্তি তৃপ্তি বিরক্তি নেই;—ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থের কবিতার মধ্যে সৌন্দর্য্যের এই বৃহৎ সত্যটুকু থাকাতেই তার এত গৌরব এবং স্থায়িত্ব।

বৃহৎ সত্য কেন বল্‌চি, অর্থাৎ বৃহৎই বা কেন বলি, সত্যই বা কেন বলি, তা আর একটু পরিষ্কার করে বল্‌বার চেষ্টা করি। পরিষ্কার হবে কি না বল্‌তে পারি না, কিন্তু যতটা বক্তব্য আছে এই সুযোগে সমস্তটা বলে' রাখা ভাল।

একটি পুষ্পের মধ্যে আমাদের হৃদয়ের প্রবেশ করবার একটি মাত্র পথ আছে—তার বাহ্য সৌন্দর্য্য। ফুল চিন্তা করে না, ভালবাসে না, ফুলের সুখ দুঃখ নেই, সে কেবল সুন্দর আকৃতি নিয়ে ফোটে। এই জন্য সাধারণতঃ ফুলের সঙ্গে মানুষের আর কোন সম্পর্ক নেই, কেবল আমরা ইন্দ্রিয়যোগে তার সৌন্দর্য্য-

টুকু উপলব্ধি করতে পারি মাত্র। এই জন্য সচরাচর ফুলের মধ্যে আমাদের সমগ্র মনুষ্যত্বের পরিতৃপ্তি নেই—তাতে কেবল আমাদের আংশিক আনন্দ ; কিন্তু কবি যখন এই ফুলকে কেবলমাত্র জড় সৌন্দর্য্যভাবে না দেখে' এর মধ্যে মানুষের মনোভাব আরোপ করে' দেখিয়েছেন তখন তিনি আমাদের আনন্দকে আরো বৃহত্তর গাঢ়তর করে দিয়েচেন।

এ কথা একটা চির-সত্য যে, যাদের কল্পনাশক্তি আছে তারা সৌন্দর্য্যকে নির্জ্জীবভাবে দেখ্‌তে পারে না। তারা অনুভব করে যে, সৌন্দর্য্য যদিও বস্তুকে অবলম্বন করে' প্রকাশ পায় কিন্তু তা' যেন বস্তুর অতীত, তার মধ্যে যেন একটা মনের ধর্ম্ম আছে। এই জন্য মনে হয় সৌন্দর্য্যে যেন একটা ইচ্ছাশক্তি, একটা আনন্দ, একটা আত্মা আছে। ফুলের আত্মা যেন সৌন্দর্য্যে বিকশিত প্রফুল্ল হয়ে ওঠে, জগতের আত্মা যেন অপার বহিঃসৌন্দর্য্যে আপনাকে প্রকাশ করে। অন্তরের অসীমতা যেখানে বাহিরে আপনাকে প্রকাশ করতে পেরেছে সেইখানেই যেন সৌন্দর্য্য ;—সেই প্রকাশ যেখানে যত অসম্পূর্ণ সেইখানে তত সৌন্দর্য্যের অভাব, রূঢ়তা, জড়তা, চেষ্টা, দ্বিধা ও সর্ব্বাঙ্গীন অসামঞ্জস্য।

সে যাই হোক্—সামান্যতঃ, ফুলের মধ্যে আমাদের সম্পূর্ণ আত্মপরিতৃপ্তি জন্মে না। এই জন্য কেবল ফুলের বর্ণনা মাত্র সাহিত্যে সর্ব্বোচ্চ সমাদর পেতে পারে না। আমরা যে কবিতা[illegible] একত্রে যত অধিক চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ করি তাকে ততই উচ্চশ্রেণীর কবিতা বলে' সম্মান করি। সাধারণতঃ যে জিনিষে আমাদের একটিমাত্র বা অল্পসংখ্যক চিত্তবৃত্তির তৃপ্তি হয় কবি যদি তাকে এমন ভাবে দাঁড় করাতে পারেন যাতে তার

দ্বারা আমাদের অধিকসংখ্যক চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয় তবে কবি আমাদের আনন্দের একটি নূতন উপায় আবিষ্কার করে' দিলেন বলে তাঁকে সাধুবাদ দিই। বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে আত্মার সৌন্দর্য্য সংযোগ করে' দিয়ে কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্‌ এই কারণে আমাদের নিকট এত সম্মানাস্পদ হয়েচেন। ওয়ার্ড্‌স্‌-ওয়ার্থ যদি সমস্ত জগৎকে অন্ধ যন্ত্রের ভাবে মনে করে' কাব্য লিখ্‌তেন, তাহলে তিনি যেমনই ভাল ভাষায় লিখুন না কেন সাধারণ মানবহৃদয়কে বহুকালের জন্যে আকর্ষণ করে' রেখে দিতে পারতেন না। জগৎ জড় যন্ত্র কিম্বা আধ্যাত্মিক বিকাশ এ দুটো মতের মধ্যে কোন্‌টা সত্য সাহিত্য তা নিয়ে তর্ক করে না—কিন্তু এই দুটো ভাবের মধ্যে কোন্‌ ভাবে মানুষের স্থায়ী এবং গভীর আনন্দ সেই সত্যটুকুই কবির সত্য, কাব্যের সত্য।

কিন্তু, যতদূর মনে পড়ে, আমার প্রথম পত্রে এ সত্য সম্বন্ধে আমি কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করি নি। কি বলেচি মনে নেই, কিন্তু যা বল্‌তে চেয়েছিলুম, তা হচ্চে এই যে, যদি কোন দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সত্যকে সাহিত্যের অন্তর্গত করতে চাই তবে তাকে আমাদের ভাল লাগা মন্দ লাগা, আমা-দের সন্দেহ বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত করে', আমাদের মানসিক প্রাণপদার্থের মধ্যে নিহিত করে' দিতে হবে—নইলে, যতক্ষণ তাকে স্বপ্রকাশ সত্যের আকারে দেখাই ততক্ষণ তার অন্য নাম। যেমন নাইট্রোজেন্‌ তার আদিম আকারে বাষ্প—উদ্ভিদ্‌ অথবা জন্তুশরীরে রূপান্তরিত হলে তবেই সে আমাদের খাদ্য; তেম্‌নি সত্য যখন মানব-জীবনের সঙ্গে মিশে যায় তখনি সাহিত্যে ব্যক্ত হতে পারে।

কিন্তু আমি যদি বলে' থাকি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যের উপযোগিতা নেই তবে সেটা অত্যুক্তি। আমার বল্‌বার অভিপ্রায় এই যে, সাহিত্যের উপযোগিতা সবচেয়ে বেশি। বসন না হলেও চলে (অবশ্য লোকে অসভ্য বল্‌বে) কিন্তু অশন না হলে চলে না। হর্ব্বার্ট্‌ স্পেন্সর উল্টো বলেন। তিনি বলেন সাহিত্য বসন এবং বিজ্ঞান অশন।

বিজ্ঞানশিক্ষা আমাদের প্রাণরক্ষা এবং জীবনযাত্রার অনেক সাহায্য করে স্বীকার করি কিন্তু সে সাহায্য আমরা পরের কাছ থেকে নিতে পারি। ডাক্তারের কাছ থেকে স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ, কেমিষ্টের কাছ থেকে ওষুধপত্র, যান্ত্রিকের কাছ থেকে যন্ত্র আমরা মূল্য দিয়ে নিতে পারি। কিন্তু সাহিত্য থেকে যা পাওয়া যায় তা আর কারো কাছ থেকে ধার করে' কিম্বা কিনে নিতে পারিনে। সেটা আমাদের সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে আকর্ষণ করে' নিতে হয়, সেটা আমাদের সমস্ত মনুষ্যত্বের পুষ্টি সাধন করে। আমাদের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী মনুষ্যসমাজ তার সমগ্র উত্তাপ প্রয়োগ করে' আমাদের প্রত্যেককে প্রতিক্ষণে ফুটিয়ে তুল্‌চে, কিন্তু এই মানবসমাজের বিচিত্র জটিল ক্রিয়া আমরা হিসাব করে' পরিষ্কার জমাখরচের মধ্যে ধরে' নিতে পারিনে; অথচ একজন ডাক্তার আমার যে উপকারটা করে, তা' খুব স্পষ্ট ধারণাগম্য। এই জন্যে হঠাৎ মনে হতে পারে মনুষ্যসমাজ আমাদের বিশেষ কিছু করে না, ডাক্তার তার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করে। কিন্তু সমাজের অন্যান্য সহস্র উপকার ছেড়ে দিয়ে, কেবলমাত্র তার সান্নিধ্য, মনুষ্যসাধারণের একটা আকর্ষণ, চারিদিকের হাসি-কান্না, ভালবাসা, বাক্যালাপ না পেলে আমরা যে মানুষ হতে পারতুম না সেটা আমরা ভুলে যাই। আমরা ভুলে যাই সমাজ

নানারকম দুষ্পাচ্য কঠিন আহারকে পরিপাক করে' সেটাকে জীবনরসে পরিণত করে' আমাদের প্রতিনিয়ত পান করাচ্চে। সাহিত্য সেই রকম মানসিক সমাজ। সাহিত্যের মধ্যে মানুষের হাসিকান্না, ভালবাসা, বৃহৎ মনুষ্যের সংসর্গ এবং উত্তাপ, বহুজীবনের অভিজ্ঞতা, বহুবর্ষের স্মৃতি, সবসুদ্ধ মানুষের একটা ঘনিষ্ঠতা পাওয়া যায়। সেইটেতে বিশেষ কি উপকার করে পরিষ্কার করে' বলা শক্ত, এই পর্য্যন্ত বলা যায় আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বকে পরিস্ফুট করে' তোলে।

প্রত্যেক মানুষের পক্ষে মানুষ হওয়া প্রথম দরকার। অর্থাৎ, মানুষের সঙ্গে মানুষের যে লক্ষ লক্ষ সম্পর্কসূত্র আছে, যার দ্বারা প্রতিনিয়ত আমরা শিকড়ের মত বিচিত্র রসাকর্ষণ করচি সেইগুলোর জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তোলা, তার নূতন নূতন ক্ষমতা আবিষ্কার করা, চিরস্থায়ী মনুষ্যত্বের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগ সাধন করে' ক্ষুদ্র মানুষকে বৃহৎ করে' তোলা—সাহিত্য এম্‌নি করে' আমাদের মানুষ করচে। সাহিত্যের শিক্ষাতেই আমরা আপনাকে মানুষের এবং মানুষকে আপনার বলে' অনুভব করচি। তার পরে আমরা ডাক্তারি শিখে মানুষের চিকিৎসা করি, বিজ্ঞান শিখে মানুষের মধ্যে জ্ঞান প্রচার করতে প্রাণপণ করি। গোড়ায় যদি আমরা মানুষকে ভালবাস্‌তে না শিখ্‌তুম তাহলে সত্যকে তেমন ভালবাস্‌তে পারতুম কি না সন্দেহ। অতএব সাহিত্য যে সব গোড়াকার শিক্ষা এবং সাহিত্য যে চিরকালের শিক্ষা আমার তাতে সন্দেহমাত্র নেই।

এই ত গেল মোট কথাটা। ইংরিজি ম্যাগাজিন্ সম্বন্ধে তুমি যা বলেচ সে কথা ঠিক। তাদের নিতান্ত দরকারী কথা এত বেশী বেড়ে গেছে যে রসালাপের আর বড় সময় নেই। বিশেষতঃ

দিবে; শুধু তাহা নহে প্রত্যেক স্ফোটকে যে বিষ নিহিত আছে তাহার দ্বারা আরও শত শত সুস্থ ব্যক্তিকে বসন্তবিষে পরিপূর্ণ করা যাইতে পারে। সহসা এত বিষ কোথা হইতে আসিল? তা' ছাড়া শরীরের উপর জড়ীয় বিষপদার্থের প্রভাব দেখিলেই বুঝা যায় যে সজীব রোগবিষের সহিত উহার অনেক প্রভেদ। আফিম পেটের মধ্যে গলিবার সময় পাইলেই উহার সমস্ত অপকারিতা প্রকাশ হইয়া পড়ে; কিন্তু টীকা দিবার পর, বসন্তের বিষ যেন দিনকতক নির্জীব অপরিণত অবস্থায় থাকে। ক্রমে ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিয়া বৃদ্ধির সীমা প্রাপ্ত হইলে আবার কমিয়া আসে—ইহাতে জড়তার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার পর, যথন গুটিকত রোগের জীবাণু অণুবীক্ষণ দ্বারা ধরা পড়িয়াছে তখন ভিন্ন জাতীয় জীবাণুর প্রাদুর্ভাবই যে ভিন্ন জাতীয় রোগের কারণ তাহা সহজেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

মনে করা যাক যে একটি জীবাণুবীজ কোন সূত্রে শরীরে প্রবেশ করিয়াছে এবং ধরা যাক যে ইহার পরিণত হইতে এবং আর চারিটি বীজ উৎপাদন করিতে এক দিন লাগে*। তাহা হইলে নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে ইহার বৃদ্ধি হইবে;—

প্রথম দিন	৪	ষষ্ঠ দিন	৪,০৯৬
দ্বিতীয় দিন	১৬	সপ্তম দিন	১৬,৩৮৪
তৃতীয় দিন	৬৪	অষ্টম দিন	৬৫,৫৩৬
চতুর্থ দিন	২৫৬	নবম দিন	২,৬২,১৪৪
পঞ্চম দিন	১,০২৪	ইত্যাদি ইত্যাদি।	

১৫ দিনে এইরূপে পঞ্চকোটির অধিক জীবাণু শরীরে জন্মলাভ করিবে। ইহা হইতে সহজেই বুঝা যাইতে পারে যে

* ইহা নিতান্ত কল্পনা নহে। বাস্তবিকও কতকটা এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে শরীরের উপর এই জীবাণুবংশের কোন বিশেষ ফললাভ নাও দেখা যাইতে পারে. কিন্তু ক্রমেই তাহাদের বৃদ্ধি সহকারে শরীরের অপকার হইতে থাকে। এখন দেখা আবশ্যক কি করিলে এই রোগবীজকে বৃদ্ধি পাইতে না দিয়া একেবারে গোড়াতেই বিনাশ করা যায়।

দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল রোগ কিছু সমস্ত শরীরকে অধিকার করিয়া বসে না, প্রত্যেক রোগের স্থানবিশেষের উপর প্রভাব এবং সেই অংশ ব্যতীত আর কোথাও তাহা স্থান লাভ করিতে পারে না। ইহার অর্থ এই, প্রত্যেক জাতীয় জীবাণু-বীজ শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানেই তাহার পরিণতির আবশ্যকীয় উপাদান পাইতে পারে সকল স্থানে তাহা পায় না। এই বিশেষ স্থানগুলিকে ইংরাজি বৈজ্ঞানিক ভাষায় বীজের নাইডস্ বলে, বাঙ্গলায় নীড় বলা যাইতে পারে। এই নীড়ে, অবশ্যই এমন কোন পদার্থ নিহিত থাকে, যাহার সহিত সংযোগ ব্যতীত জীবাণুবীজ পরিণত হইতে পারে না। এবং সেই পদার্থ নিশ্চয়ই অনন্ত পরিমাণে শরীরে থাকে না। অতএব, পূর্ব্বলিখিত তালিকা অনুসারে যেরূপ দ্রুতবেগে জীবাণুগুলির বৃদ্ধি হয় তাহাতে উক্ত পদার্থ শীঘ্রই নিঃশেষিত হইবার কথা। এই জীবনসঞ্চারক পদার্থ নিঃশেষ হইবার পর যে সকল বীজ শরীরে উৎপন্ন হয় তাহারা পরিণতির উপাদান অভাবে নিরীহ অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। যেগুলি পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহাদের জীবন শেষ হইলেই রোগেরও নিবৃত্তি হয়। একটা বড় সুবিধা এই যে, এই নীড়স্থ পদার্থ একবার ফুরাইলে আর দ্বিতীয় বার প্রায় শরীরে জন্মায় না, সেই জন্য যাহার একবার বসন্ত, টাইফয়ড্ প্রভৃতি রোগ হইয়াছে তাহার আর

দ্বিতীয়বার হইতে দেখা যায় না। তবে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে তাহা হইলে পালাজ্বর হয় কেন? পালাজ্বরে যে, নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা দিতেছে তাহা নহে—পালাজ্বরের জীবাণুদিগের নীড় রক্তে; রক্ত ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আজ যে রক্ত আছে কাল তাহা নাই। সুতরাং আজিকার রক্তের উপর যে কার্য্য করা হইয়াছে, কালকার রক্তের উপর তাহার ফল ফলিবার কোন কথা নাই।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার ন্যায় সংক্রামক জ্বরগুলির লক্ষণ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১। প্রত্যেক জ্বরের নিজের বিশেষ লক্ষণ যথা বসন্তের বা হামের গায়ের দাগ, পালাজ্বরের নিয়মিত প্রত্যাবর্ত্তন ইত্যাদি। ২। সকল জ্বরের সাধারণ লক্ষণ যথা গা গরম, রক্তের দ্রুতবেগে চলাচল, এবং অধিক হইলে মস্তিষ্কের বিকৃতি ও প্রলাপ বকুনি।

নীড়স্থ জীবনসঞ্চারক পদার্থের সহিত রোগবীজগুলির সংযোগ বশতঃ যে অজ্ঞাত বিকৃতি উপস্থিত হয় তাহাই প্রথম শ্রেণীর লক্ষণের কারণ। বসন্তরোগবীজের নীড় চর্ম্মে, সেই নিমিত্ত চর্ম্মে স্ফোটকের আবির্ভাব। টাইফয়্‌ড্‌ বীজের নীড় জঠরে, সেই নিমিত্ত জঠরের বিকৃতি। বাতবীজের নীড় অস্থিগ্রন্থির মাংসপেশীতে, তাই গ্রন্থিগুলির ফুলিয়া উঠা এবং বেদনা। পরিণত জীবাণুগুলি স্বীয় শরীর পোষণের নিমিত্ত মনুষ্যশরীর হইতে আবশ্যকীয় উপাদান শোষণ করিয়া লওয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণের কারণ। নাইট্রোজেন এবং জল সকল প্রাণীরই নিতান্ত আবশ্যকীয় আহার এবং আমাদেরও শরীরতন্তুর গঠনে বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়। রক্ত হইতে জীবাণুগুলি এই নাইট্রোজেন ও জল যত টানিয়া লয় দেহতন্তুগুলি অনাহারে ততই শুকাইয়া

যাইতে থাকে এবং শরীর এই অভাব পূরণের নিমিত্ত ততই ঘন ঘন রক্ত যোগাইতে থাকে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বাড়িয়া উঠে এবং রক্তের বেগে শরীর গরম হইয়া উঠে; অবশেষে যখন জীবাণুগুলি ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া মস্তিষ্কের আবশ্যকীয় উপাদানগুলিতেও হস্তক্ষেপ করে তখন তাহারও বিকৃতি ঘটিতে আরম্ভ হয়; পরিণামে মস্তিষ্কের, স্নায়ুর এবং মাংসপেশীর অত্যন্ত দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে মৃত্যু হয়। আর কিছু না হৌক চিকিৎসকগণ নীড়স্থ জীবনসঞ্চারক পদার্থ নিঃশেষ হওয়া পর্য্যন্ত উপযুক্ত আহার ঔষধ বিধানে শরীরের বল কোন প্রকারে রাখিয়া দিতে পারিলে মানুষ বাঁচিয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহা যথেষ্ট নহে। রোগ-জীবগুলিকে মারিয়া ফেলিতে না পারিলে বা উহাদের পরিণতি না বন্ধ করিতে পারিলে কোন কাজের চিকিৎসা হইল বলিতে পারা যায় না। যদি এমন কোন পদার্থ রোগীর শরীরে প্রবেশ করান যায় যাহা শরীরের কোন ক্ষতি না করিয়া নীড়স্থ পদার্থ নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে তবেই রোগের পরিণতি বন্ধ করা যাইতে পারে। বসন্তরোগের টীকা দেওয়া এই জাতীয় চিকিৎসা। কতকগুলি অপেক্ষাকৃত নিরীহ জীবাণু শরীরে ঢুকাইয়া, সামান্য পীড়া উপস্থিত করিয়া এই রোগনীড় নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। এইরূপ সকল প্রকারেরই রোগনীড় নষ্ট করিবার উপযুক্ত নিরীহ জীবাণু এক্ষণে খোঁজা হইতেছে। পাষ্টর নামক খ্যাতনামা রসায়ণশাস্ত্রবিৎ হাইড্রোফোবিয়ার (ক্ষিপ্ত কুক্কুরের দংশন-জনিত রোগ) এইরূপ নিরীহ জীবাণু আবিষ্কার করিয়াছেন। আশা করা যাইতে পারে যে কালে সকল প্রকার রোগেরই নিরীহ জীবাণু আবিষ্কৃত হইবে।

রোগীর অনিষ্ট না করিয়া রোগ-জীবাণুদের মারিয়া ফেলা

যায় এমন কোন ঔষধ যদি প্রয়োগ করা যায় তবে সেও একটা চিকিৎসার উপায় বটে। এইরূপ ঔষধ দুই একটা জানা আছে যথা পালাজ্বরের পক্ষে কুইনাইন্।

ডাঃ ম্যাকলেগান বলিতেছেন যে পালাজ্বরের পক্ষে যে-রূপ কুইনাইন, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার পক্ষে সেইরূপ স্যালিসিন্। স্যালি-সিনের কোন অপকারিতা নাই; কুইনাইন অপেক্ষাও উহা নির্দ্দোষ, অথচ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাবের সময় অল্প মাত্রায় (প্রতি দিন ৫ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত) এই ঔষধ নিয়মিত সেবন করিলে, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার বীজ শরীরে প্রবেশ করিবামাত্র নষ্ট হইয়া যায়।

উপসংহারে এইটুকু বলিয়া রাখা আবশ্যক স্যালিসিন্ এবং স্যালিসিলেট্ অফ্ সোডা সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ এবং দ্বিতীয়টি কখন কখন বিশেষ অপকারী বলিয়া প্রথমটির প্রতি অকারণে সন্দেহ স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে।

অপরাধীগণের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা।

অপরাধীদিগের তথ্যানুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে উহাদের কোন বিশেষ ছাঁচের চেহারা নাই—অর্থাৎ উহারা কোন বিশেষ ছাঁচের চেহারা লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। তবে যাহারা চিরাভ্যস্ত অপরাধী, যাহারা বারম্বার জেল খাটিয়া আইসে তাহাদের চেহারার একটা বিশেষত্ব ক্রমে দাঁড়াইয়া যায়। কিন্তু সে বিশেষত্বও লক্ষ্য করা বড় সহজ নহে। ফল কথা, চেহারা কিম্বা ধরণ-ধারণ দেখিয়া অপরাধীকে চেনা কঠিন— উহা চরিত্রের অকাট্য নিদর্শন নহে।

কৌলিক দোষে যে সব সময়ে অপরাধ-প্রবণতা প্রসূত হয় তাহাও নহে—উহা অনেকটা ব্যক্তিগত অভ্যাসের ফল। অধ্যাপক বাইস্‌মান বলেন, অর্জ্জিত অভ্যাস সকল উত্তরবংশে সংক্রামিত হয় না—গ্যাল্‌টনও ঐ কথা বলেন। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহেরই আমরা অধিকারী হই, তাঁহাদের অর্জ্জিত অভ্যাস সকল আমরা লাভ করি না। বাঁশবাজিকরের ছেলে বিনা অভ্যাসে বাঁশবাজিকর হয় না—অথবা কুস্তিগির পালোয়ানের ছেলে বিনা শিক্ষায় কুস্তির মার-পঁ্যাচ আদায় করিতে পারে না। চোরের ছেলে সব সময়ে যে চোর হইবে এরূপ কোন কথা নাই; তবে যদি চোর হয় সে তাহার পিতার কুদৃষ্টান্তে ও সঙ্গদোষে, জন্মদোষে নহে।

সন্তান পিতামাতার অর্জ্জিত বৃত্তির অধিকারী হয় না বটে কিন্তু ইহা সত্য যে তাঁহাদিগের রোগের অধিকারী হইয়া থাকে। আর, রোগের সহিত অপরাধপ্রবণতার যে বিশেষ যোগ আছে তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। রোগগ্রস্ত কিম্বা শারীরিক হীনতা-গ্রস্ত ব্যক্তি অপরাধী হইবেই এরূপ কোন কথা নাই—অনেক স্থলেই হয় না। তবে, এ কথা বলা যায় যে, কৌলিক রোগ হইতে যাহারা মুক্ত তাহাদের তুলনায় কৌলিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা অধিক। শারীরিক হীনতার পরিণাম-গতি কোন্ দিকে? মেজাজ বিগ্‌ড়াইয়া দেওয়া, ইচ্ছা-শক্তিকে হ্রাস করা ও সাধারণতঃ মানসিক সামঞ্জস্য নষ্ট করা—এই দিকেই কি তাহার স্বাভাবিক গতি নহে? এই প্রবণতা যে হতভাগ্য ব্যক্তির স্বভাবে বদ্ধমূল হয় সেই অপরাধকার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে। বুর্ত্তেম্‌বুর্গ্ রাষ্ট্রের কারাধ্যক্ষ হের্ সিথার্ট বলেন যে, অনেক অপরাধীই হীনতা-যুক্ত

পিতামাতার সন্তান। ১৭১৪ কয়েদীর তথ্যানুসন্ধান করিয়া তিনি জানিয়াছিলেন যে তন্মধ্যে শতকরা ১৬ জন মাতাল পিতামাতার সন্তান; শতকরা ৬ জন সেই সকল পরিবার হইতে সমাগত যে পরিবারে উন্মাদ রোগ ছিল; শতকরা ৪ জন আত্মহত্যাপ্রবণ পরিবার হইতে ও শতকরা ১ জন অপরাপর রোগগ্রস্ত পরিবার হইতে আগত। ফ্রান্স ও ইটালি দেশেও এইরূপ দেখা যায়। ডাক্তার কর্ এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ফরাসিস সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে যাহারা দুষ্কর্ম্মের জন্য দণ্ডিত হয় প্রায়ই তাহারা শারীরিক ও মানসিক হীনতা-যুক্ত পিতামাতার সন্তান। ডাক্তার ভির্জিলিও বলেন, ইটালি দেশের অপরাধী অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৩২ জন ব্যক্তিতে পিতামাতার অপরাধপ্রবণতা সংক্রামিত হয়। ইংলণ্ডের বিচার-সংক্রান্ত তথ্যতালিকা অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে ১৮৭৯ হইতে ১৮৮৮ সাল পর্য্যন্ত ১৪৩ জন অর্থাৎ শতকরা ৩২ জন উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এবং যে ২৯৯ জনের ফাঁসির হুকুম হয় তাহারও মধ্যে ১৪৫ জন অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেক মানসিক দুর্ব্বলতা-গ্রস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় তাহাদের দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যাহারা ইচ্ছাকৃত হত্যাপরাধে অপরাধী হইয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪০।৫০ জন উন্মাদগ্রস্ত কিম্বা মানসিক দুর্ব্বলতা সমন্বিত।

অপরাধীবর্গের মধ্যে কতক সংখ্যক লোক লেখাপড়া শিখিতে একেবারেই অক্ষম। তাহাদের স্মরণ ও বুদ্ধিশক্তি এত কম যে, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা সময়ের অপব্যয় মাত্র। সচরাচর অপরাধীদিগের সাধারণ লক্ষণ এই দেখা যায় যে, তাহাদের স্মরণ কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ অভাব।

শারীরিক ও মানসিক দুর্গতির সহিত অপরাধপ্রবণতার ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিলেও অনেকটা আবার তাহা সামাজিক অবস্থার দ্বারা নিয়মিত হয়। যে হীনতাযুক্ত ব্যক্তির জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়, তাহাকে অনেক সময় বাধ্য হইয়া কুপথের আশ্রয় লইতে হয়—এবং অনেকে হীনতাগ্রস্ত হইয়াও জীবিকার সংস্থান থাকা প্রযুক্ত সুপথে থাকিয়া যায়।

দাক্ষিণাত্যে আর্য্য-উপনিবেশ।

(সময় নির্ণয়।)

পরলোকগত মহাত্মা পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয় বলেন, "The Grammar of Panini, ... was composed, according to Dr Goldstucker, between the ninth and the eleventh centuries before Christ. (Indo-Aryan Vol I p 19) অর্থাৎ ডাঃ গোল্ডষ্টুকারের মতে খৃঃ পূঃ ৯ম ও ১১শ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী কোনও সময়ে পাণিনি আবির্ভূত হন। ডাঃ ভাণ্ডারকরের মতে পাণিনি খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী অপেক্ষা কখনই আধুনিক নহেন। ডাঃ রামদাস সেন ও বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত মহোদয়ও এই মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার ঋগ্বেদের পাদটীকার এক স্থলে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী যাস্ক ঋষিকে খৃঃ পূঃ

(ক) গত সংখ্যক সাধনার ৪৪৩ পৃঃ মৎস্য পুরাণের "নবরাষ্ট্রাঃ" পদটিকে আমরা "মহারাষ্ট্রাঃ" বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু মহাভারতের সভাপর্ব্বে দিগ্বিজয় পর্ব্বাধ্যায়ে কুন্তিভোজের রাজ্যের নিকটে নবরাষ্ট্র নামক জনপদের উল্লেখ আছে। সুতরাং মৎস্যপুরাণোক্ত নবরাষ্ট্র মহারাষ্ট্র নহে।

৫ম শতাব্দীর লোক স্থির করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে পাণিনি খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন বোধ হয়। কিন্তু তাঁহার Ancient India নামক গ্রন্থ ও ১১৯৭ সালের পৌষমাসের নব্যভারত পাঠে জানা যায় যে তাঁহার সেই মত এক্ষণে সম্পূর্ণ-রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁহার মতে খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দী পাণিনির আবির্ভাব কাল।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কোনও প্রদেশের বা জনপদের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। তদ্দৃষ্টে ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহোদয় অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকারের যুক্তি অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাণিনির সময় দাক্ষিণাত্য অনার্য্যনিবাস ও আর্য্যগণের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। তিনি বলেন,—"অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকার এরূপ প্রসঙ্গে অধিকাংশ স্থলে যে যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিয়া যদি (পাণিনি কত প্রবীণ ও অনবধানশূন্য বৈয়াকরণ ছিলেন, তাহা স্মরণ রাখিয়া) আমরা এরূপ অনুমান করি যে, পাণ্ড্য, চোল ও মহিষ্মৎ প্রভৃতি প্রদেশ তাঁহার (পাণিনির) নিকট বিদিত থাকিলে, তিনি কখনও ঐ সকল প্রদেশের নাম স্বীয় ব্যাকরণ-সূত্রে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না, তাহা হইলে তাহা কোনও রূপে অসঙ্গত হয় না। অতএব পাণিনি উক্ত প্রদেশ সমূহের বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না, ইহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। ... ... ইহা হইতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পাণিনির সময় (ডাঃ ভাণ্ডারকরের মতে খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী) পর্য্যন্ত আর্য্য-গণ দাক্ষিণাত্যের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না। (Early History of the Deccan etc. sec III.)

কিন্তু কেবলমাত্র এই যুক্তিটি অবলম্বন করিয়া কে কাহার পর

তাহা স্থির করিতে গেলে অনেক সময়ই অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। অমরসিংহ (৫০০ খৃঃ অঃ) স্বীয় অভিধানে দশরথাত্মজ ভগবান রামচন্দ্রের উল্লেখ করেন নাই। তদীয় কোষগ্রন্থে যদুকুলচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উল্লেখ আছে। এমন কি, বিষ্ণু-অবতার বাচক নামের উল্লেখ প্রসঙ্গেও (শ্রীকৃষ্ণের নামোল্লেখ আছে, কিন্তু) রামচন্দ্রের কোনও উল্লেখ নাই। ইহা হইতে কি সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, অমরসিংহের পর রামচন্দ্র আবির্ভূত হন? মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ বিদ্যমান থাকিতে কখনই উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এতদ্‌ব্যতীত অমরসিংহের বহুপূর্ব্বে (অর্থাৎ খৃঃ ২য় শতাব্দীতে) খোদিত প্রস্তরলিপিতে ও ভগবান রামচন্দ্রের উল্লেখ আছে। পতঞ্জলির (১৫০ পূঃ খৃঃ) মহাভাষ্যে মাহিষ্মতী, বিদর্ভ কাঞ্চীপুর ও কেরল এই কয়টি প্রদেশের নামোল্লেখ আছে; কিন্তু উক্ত গ্রন্থের কোনও স্থলেই "মহারাষ্ট্র" এই নাম দৃষ্ট হয় না। এক্ষণে অধ্যাপক গোল্ড-ষ্টুকারের যুক্তি অবলম্বন করিলে বলিতে হয় যে, পতঞ্জলির সময় মহারাষ্ট্র দেশ অনার্য্যভূমি ও আর্য্যগণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু খৃষ্টের প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে মহারাষ্ট্র দেশে মিসরদেশীয় বনিক্‌গণ বাণিজ্যার্থে আগমন করিতেন ও তথায় "রষ্ঠি" "রষ্ঠ" বা "মহারষ্ঠ" ও "মহাভোজ" নামক ক্ষত্রিয় জাতি বাস করিতেন, তাহা ডাঃ ভাণ্ডারকরই সপ্রমাণ করিয়াছেন।

অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকারের পূর্ব্বোক্ত যুক্তির ভ্রমাত্মকতা পুরা-তত্ত্ববিৎ ডাঃ রামদাস সেন মহোদয় অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করি-য়াছেন। তিনি বলেন, "আচার্য্য গোল্ডষ্টুকার কেবলমাত্র ব্যাকরণসূত্রের কতকগুলি কথা লইয়া তদীয় কাল দেশ ও তদা-নীন্তন গ্রন্থাবলীর যে সত্তানির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অযৌক্তিক।

বৈয়াকরণিক সঙ্কেত কেবল প্রচলিত সাধু শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ দেখিয়া, তাহার সাধুতা সপ্রমাণ করিয়া দেয় মাত্র। এতদ্ভিন্ন কোনও ইতিহাস নির্ণয় করিয়া দেয় না। প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিভাগ ও সাধনপ্রণালী প্রদর্শন পূর্ব্বক বিশেষ শব্দকে অর্থবিশেষে ব্যবস্থাপনা করাই ব্যাকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু পারিভাষিক বা নিগূঢ় সঙ্কেতযুক্ত শব্দের উপর ব্যাকরণের কিছু-মাত্র প্রভুত্ব নাই। সুতরাং ব্যাকরণের সহিত তাদৃশ শব্দের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। ইহা সত্য কি অসত্য নিদর্শন দেখাই-তেছি। পুরাণে একটি শব্দ আছে, "পঞ্চাম্র"। ... এই পঞ্চাম্র শব্দটির অর্থ পাণিনি বলিবেন, পাঁচটি আম্রবৃক্ষ। বস্তুতঃ তাহা নহে। নিম্ব, অশত্থ, বট, জাতিপুগ, দাড়িম্ব এই সকল বৃক্ষ একত্রে রোপণ করিলে তৎসমুদায়কে পঞ্চাম্র বলে, ...। যদিও পঞ্চাম্র শব্দটির উৎপত্তি পাণিনির পরে হইয়া থাকে এমতও হয়, তথাপি তৎপরবর্ত্তী আচার্য্যেরা বা ব্যাকরণকর্ত্তারা তাহা পরি-ত্যাগ করিবেন কেন? ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ব্যাকরণ নিয়মের মধ্যে তাদৃশ শব্দের সমাবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই, এবং তজ্জন্যই তাদৃশ শব্দের বর্জ্জন আছে।

"আর একটি শব্দ আছে "ষোড়শী"। এই শব্দের অর্থ পাণিনি বলিবেন ষোল সংখ্যার পূরণী। (কিন্তু) বেদে বলে, একটি যজ্ঞপাত্র অর্থাৎ সোমরস গ্রহণের পাত্র। এই ষোড়শী শব্দটি পাণিনি কি অন্য কোন ব্যাকরণের মতে যজ্ঞপাত্রং বুঝায় না। যুক্তিতে দেখা যায়, ইহা পাণিনির পূর্ব্বে উৎপন্ন হইলে পাণিনি ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বস্বধন সোমের পাত্র বিস্মৃত হইয়া ষোল সংখ্যায় পূরণ মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতেন না!! কিন্তু পাঠকগণ বলিয়া দিতেছি, ইহা পাণিনির চিরপরিচিত যজুর্ব্বেদের সহস্র

স্থানে আছে। "অতিরাত্রে ষোড়শীং গৃহ্নাতি নাতিরাত্রে ষোড়শীং গৃহ্নাতি।" ইত্যাদি। অতএব, কেবলমাত্র ব্যাকরণ সূত্রের দ্বারা কোনও ইতিবৃত্ত নির্ণয় হইতে পারে না।" (ঐতিহাসিক রহস্য, ৩য় ভাগে, পাণিনি শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

অতএব পাণিনির গ্রন্থে যদি কোনও বিষয়ের ও কোনও দেশের উল্লেখ না থাকে, তবে তাহা যে, তৎকালে জনসাধারণের নিকট অবিদিত ছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। পাণিনিকে যে তৎকালপ্রচলিত বা জ্ঞাত সমস্ত বিষয়েরই উল্লেখ করিতে হইবে, এরূপ বিবেচনা করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে বসুদেব, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাভারতীয় ব্যক্তিবৃন্দের উল্লেখ আছে, পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও উদাহরণস্থানে মহাভারতবর্ণিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থে কোনও স্থলেই রামচন্দ্র দশরথ বা রামায়ণবর্ণিত কোনও ব্যক্তির নাম দৃষ্ট হয় না। এখন কি গোল্ডষ্টুকার বলিবেন যে,পতঞ্জলির (১৫০পূঃ খৃঃ) পরবর্ত্তী সময়ে রামচন্দ্রাদি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন? অতএব পাণিনি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত প্রদেশ সমূহের উল্লেখ করেন নাই বলিয়াই যে, তাঁহার সময় উক্ত প্রদেশ সমূহ আর্য্যগণের নিকট অবিদিত ছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি পাণিনির বহুপূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারতের সময়ে দাক্ষিণাত্যে আর্য্যগণের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইতেছিল; এবং মহাভারতেরও পূর্ব্ববর্ত্তী রামায়ণের সময় আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিতেছিলেন। এখন রামায়ণ ও মহাভারতের সময় নিরূপণ করিতে পারিলেই, দাক্ষিণাত্যে আর্য্যগণের উপনিবেশ স্থাপনের সময় নির্ণয় করিতে পারা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয়াধ্যায়ে লিখিত আছে—

"আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনং।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরং॥"

পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি সিদ্ধান্তকৌমুদীর ভূমিকায় এই শ্লোকের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা এই—তোমার (পরীক্ষিতের) জন্ম হইতে এক হাজার পাঁচ শত দশ বৎসর পরে নন্দের রাজ্যাভিষেক হয়। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ হণ্টারের মতে ৩২৬ পূঃ খৃঃ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হন। বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণানুসারে চন্দ্রগুপ্তের একশত বৎসর পূর্ব্বে নন্দ প্রাদুর্ভূত হন। তাহা হইলে নন্দের রাজ্যারম্ভকাল ৪২৬ পূঃ খৃঃ। মহারাজ পরীক্ষিৎ নন্দের ১৫১০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং ৪২৬+১৫১০=১৯৩৬ পূঃ খৃঃ তাঁহার জন্ম হয়। যে বৎসর পরীক্ষিতের জন্ম হয়, সেই বৎসরই কুরুক্ষেত্রের মহা সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল।

বিষ্ণুপুরাণের ৪র্থ অং ২৪ অঃ ও ভাগবতে (১২।২) লিখিত আছে যে, পরীক্ষিতের রাজ্যকালে কলির ১২০০ বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ১২ শত কলিগতাব্দ—১৯০০ পূঃ খৃঃ। পরীক্ষিতের রাজ্যপ্রাপ্তির ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম হয় (ম, ভা, স্ত্রী পর্ব্ব ২৫ অঃ ও মৌষল পর্ব্ব ১ম অঃ।) সুতরাং ১৯০০+৪৬= ১৯৪৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সংগ্রাম হয়।

এই সময় সূর্য্যবংশাবতংস ভগবান রামচন্দ্রের বংশধর বৃহদ্বল অযোধ্যা শাসন করিতেছিলেন। এই সর্ব্বলোকক্ষয়কর যুদ্ধে তিনি মহাবীর অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন। রামচন্দ্রের অধস্তন ৩০শ পুরুষ বৃহদ্বল রাজা হন। এই ৩০ পুরুষের রাজত্বকাল কত ধরা যাইতে পারে? সচরাচর প্রত্যেক পুরুষের রাজ্যকাল গড়ে ন্যূনকল্পে ১৬ ও ঊর্দ্ধকল্পে ৩০ বৎসর ধরিবার প্রথা দেখা যায়।

কিন্তু এরূপ গণনা অনেক স্থলেই প্রমাদশূন্য হয় না। বিশেষতঃ প্রাচীনকালের আর্য্য নৃপতিগণ এখনকার অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অধিক বলিষ্ঠ সুস্থকায় ও মিতাচারী ছিলেন। মহর্ষি মনু বলেন (১। ৮৩)—সত্যযুগে মনুষ্যগণ রোগহীন ও চারিশত বর্ষ পরমায়ু সম্পন্ন ছিলেন, ত্রেতায় তিনশত, দ্বাপরে দুইশত ও কলিতে একশত বৎসর মানবের জীবনকাল ছিল। পণ্ডিতাগ্রণ্য ডাঃ রাজেন্দ্র-লাল মিত্র মহোদয় বংশাবলী গণনা করিয়া আদিশূরের সময় নির্দ্ধারণ জন্য তিন পুরুষের জীবনকাল এক শত বৎসর ধরিয়াছেন। অতএব এস্থলে আমরা প্রতি পুরুষের রাজত্বকাল গড়ে ৪০ বৎসর ধরিতে পারি। এই হিসাবে গণনা করিলে ৩০ পুরুষের রাজত্বকাল ১২ শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ৩১৫০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র অযোধ্যা শাসন করিতেছিলেন।

কিন্তু পুরাণে রামচন্দ্র হইতে বৃহদ্বল পর্য্যন্ত ৩০ জন নৃপতির নাম (লিপিকরের প্রমাদ বা সংগ্রাহকের অনবধানতাবশতঃ পদ্ম-পুরাণে ৪জন হরিবংশে ১০জন কল্কিপুরাণে কয় জন নৃপতির নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে।) উল্লেখ করিয়া, "এতে সূর্য্যাদয়োবংশাঃ প্রাধান্যেন ময়োদিতাঃ।" এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা অনুমিত হইয়াছে যে, রামচন্দ্র হইতে বৃহদ্বল পর্য্যন্ত ৩০ জন সুবিখ্যাত ও প্রধান প্রধান নৃপতি ব্যতীত আরও অনেক সামান্য নরপতি এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সামান্য বলিয়া পুরাণে ইহাদের নামোল্লেখ করা হয় নাই। অতএব রামচন্দ্র খৃঃ পূঃ ৩১৫০ বৎসরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও অনির্দ্দিষ্ট সময়ে অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কত পূর্ব্বে?

আমরা দেখিয়াছি, পুরাণের বংশতালিকায় সামান্য ও অপ্রসিদ্ধ নৃপতিগণের নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন যদি প্রত্যেক

৪জন নৃপতির মধ্যে গড়ে একজন করিয়া বিখ্যাত নৃপতি হইয়াছিলেন, এরূপ ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত বংশে সর্ব্বশুদ্ধ ১২০ জন নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বলিতে হইবে। এই ১২০ জন নৃপতির মধ্যে ৩০ জন সুবিখ্যাত ছিলেন। অবশিষ্ট ৯০ জন সামান্য নৃপতির রাজ্যকাল কত বৎসর ধরা যাইতে পারে? ইহারা সামান্য নৃপতি ছিলেন বলিয়া যদি ইঁহাদের প্রত্যেকের রাজত্বকাল গড়ে ২৭ বৎসর করিয়া ধরা যায়; তাহা হইলে ৯০ জনের রাজত্বকালে (৯০×২৭=) ২৪৩০ বৎসর হয়। এতদনুসারে ভগবান্ রামচন্দ্র খৃষ্টাব্দের প্রায় (৩১৫০+২৪৩০=) ৫৫৮০ বৎসর পূর্ব্বে বার্ত্তমান ছিলেন, অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ অনুমান কতদূর সঙ্গত?

ভগবান্ রামচন্দ্র যে ত্রেতাযুগের শেষ নৃপতি একথা সকল হিন্দুশাস্ত্রেই একবাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে। মহর্ষি মনু বলেন,

চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি ইর্ষাণাং তু কৃতংযুগং।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥৬৯॥
ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সসন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু।
একাপায়েন বর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ ॥ ৭০ ॥ প্রথম অধ্যায়।

অনুবাদ—চারি সহস্র বৎসরে সত্যযুগ হয়; সেই যুগের পূর্ব্ব ৪ শত বৎসর সন্ধ্যা ও উত্তর চারি শত বৎসর সন্ধ্যাংশ। ৬৯॥ অন্যান্য তিন যুগ ও তাহাদের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ যথাক্রমে ক্রমশঃ এক সহস্র ও এক শত বৎসর করিয়া কমিয়া যায়। অর্থাৎ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সহ ৩৬০০ বৎসরে ত্রেতা যুগ, ২৪ শত বৎসরে দ্বাপর যুগ ও ১২শত বৎসরে কলিযুগ শেষ হয়। সুতরাং দ্বাপর যুগের পরিমাণ ২৪ শত বৎসর। মহাভারতেও লিখিত আছে,

"তথা বর্ষসহস্রেদ্বে দ্বাপরং পরিমাণতঃ।
তস্যাপি দ্বিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥" ২৪ ॥
বনপর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায়।

অর্থাৎ দ্বাপর যুগের পরিমাণ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সহ ২৪ শত বৎসর। শান্তি পর্ব্বের ২৩১ অধ্যায়ানুসারেও দ্বাপরের পরিমাণ ২৪ শত বৎসর। আধুনিক পঞ্জিকাকারগণের মতে ৩১০০ পূঃ খৃঃ কলিযুগের প্রারম্ভ হয়। ইহার ২৪ শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৫৫০০ পূঃ খৃঃ দ্বাপর যুগ প্রারব্ধ হয়। সুতরাং ৫৫০১ পূঃ খৃঃ ত্রেতাযুগের শেষ বৎসর। এই বৎসর রামচন্দ্র ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আমাদের পূর্ব্বানুমিত সিদ্ধান্তের সহিত এই সিদ্ধান্তের একবাক্যতা করিলে, দৃষ্ট হইবে যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, আমাদের হিন্দু গণনানুসারে রামচন্দ্র খৃঃ পূঃ ৫৬ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, সন্দেহ নাই। (১)

পূর্ব্ব প্রস্তাবদ্বয়ে দাক্ষিণাত্যে আর্য্যোপনিবেশের ইতিবৃত্ত যথাসাধ্য সংকলিত করিয়া দিয়াছি, এই প্রস্তাবে রামচন্দ্রের ও কুরুপাণ্ডবের সময় যথাবুদ্ধি নিরূপিত করিয়া দিলাম। এক্ষণে, আর্য্যগণের দাক্ষিণাত্যে প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের সময় নির্ণয় করিবার ভার পাঠকগণের উপর অর্পণ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

---

(১) ১৫ই মে অধ্যাপক বাল গঙ্গাধর তিলক মহোদয় পুনা সহরের "হীরা-বাগ"—এ "বেদের কাল নির্ণয়" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। বক্তৃতাটি মহারাষ্ট্রী ভাষায় পঠিত হইয়াছিল। তিনি নানাবিধ যুক্তি ও জ্যোতিষিক প্রমাণ অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, খৃষ্টের অন্ততঃ ৬৷৭ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশগুলি রচিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশগুলি সম্ভবতঃ খৃষ্টের ৯২৮০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে রচিত হয়। কারণ মহাভারতে লিখিত আছে, "ততস্ত্রেতাযুগং নাম ত্রয়ী যত্র ভবিষ্যতি" অর্থাৎ ত্রেতাযুগে বেদত্রয় রচিত হয়। অন্যান্য পুরাণে ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহা হউক, একথা বিচার করিলে আমাদের নিরূপিত রামচন্দ্রের সময় অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে না।

যুগকালের বিস্তারিত বিবরণ যাঁহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মল্লিখিত "এটা কোন্ যুগ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

বিম্ববতী

(রূপকথা।)

যতনে সাজিল রাণী, বাঁধিল কবরী,
নব ঘন স্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী
পরিল অনেক সাধে। তার পরে ধীরে
গুপ্ত আবরণ খুলি' আনিল বাহিরে
মায়াময় কনক দর্পণ। মন্ত্র পড়ি'
শুধাইল তারে—কহ মোরে সত্য করি'
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে।
ফুটিয়া উঠিল ধীরে মুকুরের মাঝে
মধুমাখা হাসি-আঁকা একখানি মুখ,
দেখিয়া বিদারি' গেল মহিষীর বুক—
রাজকন্যা বিম্ববতী সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে!

তার পর দিন রাণী প্রবালের হার
পরিল গলায়। খুলি' দিল কেশভার
আজানুচুম্বিত। গোলাপী অঞ্চলখানি,
লজ্জার আভাসসম, বক্ষে দিল টানি'।
সুবর্ণ মুকুর রাখি কোলের উপরে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি'—কহ সত্য করে'
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী!
দর্পণে উঠিল ফুটে সেই মুখশশি।
কাঁপিয়া কহিল রাণী, অগ্নিসম জ্বালা—
"পরালেম তারে আমি বিষফুলমালা,
তবু মরিল না জ্বলে' সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!

তার পরদিনে,—আবার রুধিল দ্বার
শয়নমন্দিরে। পরিল মুক্তার হার,
ভালে সিন্দুরের টিপ, নয়নে কাজল,
রক্তাম্বর পট্টবাস, সোনার আঁচল।
শুধাইল দর্পণেরে—কহ সত্য করি'
ধরাতলে সব চেয়ে কে আজি সুন্দরী!
উজ্জ্বল কনক পটে ফুটিয়া উঠিল
সেই হাসিমাখা মুখ। হিংসায় লুটিল
রাণী শয্যার উপরে। কহিল কাঁদিয়া·
বনে পাঠালেম তারে কঠিন বাঁধিয়া,
এখনো সে মরিল না সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে!

তার পর দিনে,—আবার সাজিল সুখে
নব অলঙ্কারে ; বিরচিল হাসিমুখে
কবরী নূতন ছাঁদে বাঁকাইয়া গ্রীবা।
পরিল যতন করি' নব রৌদ্রবিভা
নব পীতবাস। দর্পণ সম্মুখে ধরে'
শুধাইল মন্ত্র পড়ি'—সত্য কহ মোরে
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী!
সেই হাসি সেই মুখ উঠিল বিকশি'
মোহন মুকুরে। রাণী কহিল জ্বলিয়া—
বিষফল খাওয়ালেম তাহারে ছলিয়া,
তবুও সে মরিল না সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!

তার পর দিনে রাণী কনক রতনে
খচিত করিল তনু অনেক যতনে।
দর্পণেরে শুধাইল বহু দর্পভরে—
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ কার বল্ সত্য করে'।
দুইটি সুন্দর মুখ দেখা দিল হাসি'
রাজপুত্র রাজকন্যা দোঁহে পাশাপাশি
বিবাহের বেশে।—অঙ্গে অঙ্গে শিরা যত
রাণীরে দংশিল যেন বৃশ্চিকের মত।
চীৎকারি' কহিল রাণী কর হানি' বুকে,
মরিতে দেখেছি তারে আপন সম্মুখে
কার প্রেমে বাঁচিল সে সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!

ঘষিতে লাগিল রাণী কনক মুকুর
বালু দিয়ে--প্রতিবিম্ব নাহি হল দূর।
মসী লেপি দিল তবু ছবি ঢাকিল না।
অগ্নি দিল, তবুও ত গলিল না সোনা।
আছাড়ি' ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে
ভাঙ্গিল না সে মায়া-দর্পণ। ভূমিতলে
চকিতে পড়িল রাণী, টুটি' গেল প্রাণ;—

সর্ব্বাঙ্গে হীরকমণি অগ্নির সমান
লাগিল জ্বলিতে; ভূমে পড়ি' তারি পাশে
কনক দর্পণে ছুটি হাসিমুখ হাসে।
বিম্ববতী, মহিষীর সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।

পরনিন্দার জন্ম-বিবরণ।

যিনি এই গল্পের নায়িকা তাঁহার নাম পরনিন্দা। তাঁর বাবার নাম অহঙ্কার শর্ম্মা এবং মায়ের নাম হিংসা দেবী। ইহাঁদের যখন শুভ বিবাহ হয় তখন পৃথিবীময় শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠে এবং স্বর্গ হইতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্পবৃষ্টি হয়। বিবাহের গল্পটা এই।

পৃথিবীতে অনেক দিন ধরিয়া জ্ঞানচর্চ্চা এবং সাধনভজন হইতেছিল। যতদিন সাধু মহাপুরুষেরা এই সকল ব্যাপারে নিযুক্ত ছিলেন ততদিন পৃথিবী আগ্রহের সহিত তাঁহাদের কথা শুনিতেন এবং তাঁহার মুখে হাসি উৎসাহ সদাই দেখিতে পাওয়া যাইত।

কিন্তু মহাপুরুষেরা কত দিন থাকিবেন? ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ধর্ম্ম হারু তারুর হাতে আসিয়া পড়িল। পৃথিবী আর বেশিদিন তাহাদের বকুনি সহিতে পারিলেন না। নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া তিনি একটি হাই তুলিলেন।

যেমন হাই তুলিলেন অমনি জগতময় নিদ্রা আসিয়া পড়িল। বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষা দিতেছেন, আর অমনি ছাত্রেরা দলকে দল ঢুলিতে লাগিল। উপাসনাগৃহে আচার্য্য বক্তৃতা দিতেছেন, আর উপাসকমণ্ডলী প্রাণভরে ঢুলিতে আরম্ভ করিল। গায়ক বহু বাদ্য সহকারে গানে মাতিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সুললিত তানে সকলকার চক্ষু মুদিয়া আসিল। যেখানে সেখানে সকলে যেন এলিয়া পড়িল।

আর কাজ চলে না। দেবতারা পৃথিবীর হাই শুনিয়া তুড়ি দিতে লাগিলেন। তুড়িধ্বনি বজ্রধ্বনি হইয়া পৃথিবীতে প্রতি-

ধ্বনিত হইল। এবং তাহা শুনিয়া পৃথিবীর আবার চেতনা আসিল।

নিতান্ত লজ্জিত হইয়া তখন তাঁহাকে দেবতাদিগের নিকট যাইতে হইল। স্বর্গে আসিয়া তিনি বলিলেন—"আপনাদের তুড়িধ্বনি আমাকে সচকিত করিয়াছে। কিন্তু আপনারা কি দিনরাত্রি তুড়ি দিতে পারিবেন? তাহা না হইলেই বা আমার সজাগ অবস্থা কেমন্ করিয়া থাকে? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বক্তা, উপদেষ্টা, আচার্য্য, উপাচার্য্য, উপাধ্যায়, গায়ক, রিফর্মার আসিয়া আমাকে কাবু করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের কথা শুনিলেই আমার ঘুম আসে। আর না আসিবেই বা কেন? বড় বড় সংস্কৃত শ্লোক, বড় বড় সমাস, মানে নাই অথচ ব্যগ্রতাপূর্ণ আদেশ, এ সকল আপনারা কি আমার উপকারার্থ পাঠাইয়াছেন?"

দেবতারা ভাবটা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু বুঝিয়া করিবেন কি? দেবব্যবস্থা কি উল্টান যায়? সকলেই থাকিবে। যাহারা জ্বালাতন করিবার তাহারা দিনরাত্রি জ্বালাতন করিবে। ঢেঁকির কচকচানি চলিবে। শিক্ষক মাথা নাই মুণ্ড নাই এমন কথা শিক্ষা দিবেনই। উপাচার্য্য ন্যায়সঙ্গত কি অন্যায়সঙ্গত, অর্থপূর্ণ কি অর্থশূন্য বিধি দিবেনই। তার্কিকেরা ছায়াতে বস্তু আছে কি বস্তুতে ছায়া আছে এ বিষয়ে টিকি নাড়িয়া তর্ক করিবেনই। বক্তারা দেশের হিতসাধনের জন্য প্রতিনিধিশাসন চালাইবার জন্য লম্বা লম্বা কথা প্রয়োগ করিবেনই। পুরাকালে আর্য্যেরা আমাদের অপেক্ষা সহস্র গুণ ভাল ছিলেন, তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা দশগুণ অধিক বাঁচিতেন, বিশগুণ ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া নাক ডাকাইতেন, এবং অনেকগুণ অধিক

পরিমাণে স্বপ্ন দেখিতেন; তখন বেদ পড়িয়া লোকে ওলাউঠা এবং মাথাধরা রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইত—এই সকল আশ্চর্য্য যুক্তি দেখাইয়া সনাতন ধর্ম্ম-প্রচারকেরা বজ্র-নিনাদে ঘুমন্ত ভারতকে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিবেনই। ঠাট সব বজায় থাকিবে অথচ পৃথিবী হাই তুলিবে না—এমনটি কিসে হয়?

দেবতারা ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে একটি চমৎকার সিদ্ধান্তে আসিলেন। তাঁহারা পৃথিবীকে বলিলেন—"বাছা, তুমি আর হাই তুলিও না। দেখ, ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন, বিষ্ণু পালন করিতেছেন, এবং মহেশ্বর প্রলয় করিবেন। কিন্তু তুমি হাই তুলিলে ব্রহ্মা আর সৃষ্টি করিবেন না, বিষ্ণু ঘুমন্ত জগতকে আর পালন করিতে পারিবেন না। তিনিও নিদ্রা যাইবেন, এবং তিনি নিদ্রা গেলে নিদ্রাবস্থায় পাইয়া মহেশ্বর সকলকে প্রলয়ে পাঠাইবেন। সুতরাং তোমাকে জাগিয়া থাকিতেই হইবে। এখন তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন কর। আমরা শীঘ্র ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইতেছি।"

এই বলিয়া তাঁহারা অহঙ্কার শর্ম্মাকে স্মরণ করিলেন। ইনি একজন বিখ্যাত পুরুষ। ইহাঁর মাথা কেবল নিম্ন দিকে থাকে, সুতরাং ইনি সকল লোককে ইহাঁ অপেক্ষা নীচে দেখেন। এবং ইহাঁর মুখ হইতে "আমি আমি" রব দিন রাত্রি বাহির হইতেছে। অহঙ্কারকে দেখিয়া দেবতারা বলিলেন—"অহঙ্কার তুমি এত দিন একাকী ছিলে। এখন তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে। তুমি শীঘ্র পৃথিবীতে যাইয়া একটি সুন্দরী কন্যাকে বাছিয়া লইয়া তাহার সঙ্গে শুভ উদ্বাহে বদ্ধ হও।"

অহঙ্কার "আমি আমি" বলিতে বলিতে নামিয়া আসিলেন। নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে একটি পাত্রীকে তাঁহার

পছন্দ হইল। সেই কন্যার নাম হিংসা-দেবী। রূপবতী বলিয়া অহঙ্কার তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করেন নাই। অহঙ্কার ভাবিলেন—"আমি যেমন কেবল 'আমি আমি' করি, কেবল আমাকেই দেখি, হিংসা তেমনি কেবল 'এ, ও, সে' এই লইয়া থাকে এবং সদা অন্যকে দেখে।" একের অভাব অন্যেতে পূর্ণ হইলেই সেই বিবাহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিবাহ হয়। সুতরাং দুই জনের বিবাহ হইল।

অনেকদিন সুখে অতিবাহিত হইলে অবশেষে তাহাদের একটি পরমাসুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। দেবতারা তাহার স্বর্গে জাতকর্ম্ম করিয়া অবশেষে নামকরণও করিলেন। নাম হইল—পরনিন্দা।

পৃথিবী পরনিন্দাকে পাইয়া একেবারে আপ্যায়িত হইলেন। দুই জনের এমন ভালবাসা কেহ কখন দেখে নাই। দেবতাদিগের আদেশ অনুসারে পৃথিবীর যখনই হাই আসে অমনি পরনিন্দা আসিয়া তাঁহার কাছে বসেন, আর যেমন কাছে বসেন অমনি পৃথিবীর আর সে ক্লান্তি থাকে না। এইরূপে সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, রোগ-শোকে সকল সময়েই পরনিন্দা তাঁহার কাছে থাকেন। সুখের সময় তিনি তাঁহার সহিত কথা কহিয়া দশগুণ অধিক সুখী হন। দুঃখের সময় তাঁহার পানে তাকাইয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া যান। পরনিন্দার বচন-অমৃত পান করিলে রোগ যন্ত্রণা পলাইয়া যায়। পৃথিবী আর হাই তুলেন না। পরনিন্দা যে কি মিষ্ট সঙ্গী তাহা পৃথিবী জানিতে পারিয়াছেন।

ধর্ম্মকর্ম্ম চলিতেছে, বিদ্যাশিক্ষা সমান আছে। কিন্তু সে শ্রান্তির ভাব আর নাই। পরনিন্দাকে পাইয়া পৃথিবী এখন

আয়েস করিয়া বাঁচিতেছেন এবং দেবতারাও নিশ্চিন্ত হইয়া পৃথিবীর বিষয় আর ভাবেন না।

স্বরলিপি।

শুধু * ।

রাগিণী মিশ্র বেহাগ—তাল ফেরতা।

শুধু যাওয়া আসা ;
শুধু স্রোতে ভাসা ;
শুধু আলো আঁধারে
কাঁদা হাসা;

শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া ;
শুধু নব দুরাশায় আগে চলে' যায়
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা।

অশেষ বাসনা লয়ে' ভাঙ্গা বল,
প্রাণপণ কাজে পায় ভাঙ্গা ফল ;
ভাঙ্গা তরী ধরে' ভাসে পারাবারে,
ভাব কেঁদে মরে, ভাঙ্গা ভাষা !

হৃদয়ে হৃদয়ে আধো পরিচয়,
আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,
লাজে ভয়ে ত্রাসে, আধ বিশ্বাসে
শুধু আধখানি ভালবাসা।

---

* নূতন গান। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত।

৩|২

। ·সা সন্‌া॥ সা -া পা। -া গা· -পা। মা -গমগা -রা।
। শু ধু॥ যা ও য়া। — আ —। সা — —।

। -সা সা ন্‌া। সা -া গা। -া সা -া। গাঃ -মঃ -গমা।
। — শু ধু। স্রো—তে। — ভা —। সা — —।

। -পা মা গরা॥ {-া পা পা। পা -ধা ঞা। -ধঞধা পা -ধপা।
। — (শু ধু)॥ {— শু ধু। আ — লো। — আঁ —।

। মা -পমা গা}। -া -া -া। গা -া গা। -া গা -মা।
। ধা — রে}। — — —। কাঁ — দা। — হা —।

৪|২

। মা -গমা -পা। -মা গমগা রা॥ · · পা পা। পা পা নধা না।
। সা — —। — (শু ধু)॥ শু ধু। দে খা পা ও।

। র্সা -া র্সা র্সা। র্সা র্সা নর্সর্রা -র্সা। না -া ধপা পা।
। য়া — শু ধু। ছুঁ য়ে যাও —। য়া — শু ধু।

। পা ধা না র্সা। নর্রা -র্সা না -ধনা। ·পা না ধনা র্সা।
। দূ রে যে তে। যে — তে —। কেঁ দে চা ও।

। না -া গা মা। {পা পা পা পা। পা -া -া -া।
। য়া শু ধু। {ন ব দূ র্বা। শা য় — —।

। পা ধা ঞা ঞধা। (পা মপমা গা মা)}। পা -া -া -র্সা।
। আ গে চ লে। (যা য় ন ব)}। যা — — য়।

। র্সা ঞা ধা পা। মা -া -গরা -গা। গপা মা গা -রগা।
। পি ছে ফে লে। যা — — য়। মি ছে আ —।

। রগরা -সা সরা সন্‌া॥
। শা — (শু ধু)॥

॥{ সা সা। গা -া রা মা। গমা -গা রা সা। ন্সন্া -প্া ধ্া -ন্া।
॥{ অ শে। ষ—বা স। না — ল য়ে। ভা — ঙা —।

। (সা -া)} । সা -া -া -া। সা সা সা সা।
। (ব ল)} । ব ল্ — —। প্রা ণ প ণ।

। ন্সা -রা রা -া। রা -গা গা রগা। -মা মা গা -া।
। কা — জে —। পা — য়, ভা। — ঙা, ফ ল।

। গপা পা পা পক্ষা। পাঃ ক্ষঃ পা -া। পা ধা পা পগা।
। ভা ঙা ত রী। ধ — রে —। ভা সে পা রা।

। মপমা -া গা -া। গা মা পা র্সা। র্সাঃ -নধঃ না -া।
। বা —রে —। ভা ব কেঁ দে। ম — রে —।

। গা পা মপমগা -রগা। রসা -া -া -া॥ পা পা পা -র্সা।
। ভা ঙা, ভা —। যা — — —॥ হৃ দ য়ে —।

। না না নধা -না। র্সা -নর্সর্রা র্সা র্সা। র্সনা -র্সা র্সা -া।
। হৃ দ য়ে —। আ — ধ, প। থি — চ য়।

। র্সা র্সা র্সা র্সা। র্সা -না র্সর্রা র্সনা -র্সা। না -া নধা পধা।
। আ ধ খা নি। ক — থা —। সা — ঙ, না।

। -নর্সা র্সা না -া। ধপা পা পা পা। পা -া পা -া।
। — হি, হ য়। লা জে ভ য়ে। ত্রা — সে —।

। পা র্সা ৰ্সা -ৰ্ধা। পধপা -মা গা -া। গা গা গা গা।
। আ ধ, বি —। শ্বা — সে —। পা য়, আ ধ।

। গা -া গরা -গা। মা পা মপমগা -রগা। রা -সা সরা ন্া॥
। খা — নি —। ভা ল বা— —। সা — (শু ধু)॥

ব্রহ্মসঙ্গীত হইতে।

রাগিণী কানাড়া—তাল একতালা।

কি গাব আমি কি শুনাব
আজি আনন্দধামে।
পুরবাসী জনে এনেছি ডেকে
তোমার অমৃত নামে!

কেমনে বর্ণিব তোমার রচনা
কেমনে রটিব তোমার করুণা,
কেমনে গলাব হৃদয় প্রাণ
তোমার মধুর প্রেমে॥

তব নাম লয়ে চন্দ্র তারা
অসীম শূন্যে ধাইছে।
রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম
গ্রহ হতে গ্রহে ছাইছে।

অসীম আকাশ নীল শতদল
তোমার কিরণে সদা ঢল ঢল,
তোমার অমৃত সাগর মাঝারে
ভাসিছে অবিরামে।

৩+ ০
|

।২´।৩।০।১। ॥

॥ সা -মা মা। মা মা মা। মপা -গা মা। পা -মধা পা।
॥ কি — গা। ব, আ মি। কি — শু। না — ব।

। মপা মগা গা। গা -া রগমা। রা -া -সা। সরসন্‌া -সা -া।
। আ জি, আ। ন — ন্দ। ধা — —। মে — —।

। সা সমা মা। মা মা মা। মা পা পর্সা। র্সনা র্সা -ঞধা।
। পু র, বা। সী, জ নে। এ নে ছি। ডে কে —।

। ধঞা ধা ঞা। পধা মপা মপধা। পমা -ঙ্গা -রঙ্গমা। রা -া -সা॥
। তো মা র। অ মৃ ত। না — —। মে — —॥

। পনা না না। না না নর্সা। র্সা নর্সর্রা র্সা। র্সনা র্সা র্সা।
। কে ম নে। ব র্ণি ব। তো মা র। র চ না।

। পা র্সনা র্সা। র্রা র্র্মা র্মা। র্রা র্সনা র্সা। ঞধা ধঞা পধা।
। কে ম নে। র টি ব। তো মা র। ক রু ণা।

। মা পা পা। পা পা পধা। মা পমা পা। র্সনা -র্সা র্সা।
। কে ম নে। গ লা ব। হৃ দ য়। প্রা — ণ।

। ঞা ধা ধঞা। পা মা মধা। পধমা -ঙ্গা -রমা। রা -া -সা॥
। তো মা র। ম ধু র। প্রে — —। মে — —॥

। ধা ধা ধা। ঞধা পা মা। পা -া পা। পমা পা পা।
। ত ব, না। ম, ল য়ে। চ — ন্দ্র। তা — রা।

। মধা ধা ধা। ধা -ঞধা পধা। মপা -মপধা পা। ম -পমা -ঙ্গা।
। অ সী ম। শূ — ন্যে। ধা — ই। ছে — —।

। ঙ্গা ঙ্গা ঙ্গা। ঙ্গা ঙ্গা রঙ্গমা। রা রা রা। সন্‌া -সা সা।
। র বি, হ। তে, গ্র হে। ঝ রি ছে। প্রে — ম,।

। রা রমা মা। মা গমপা পা। পধা -া মা। পা -া -া।
। গ্র হ, হ। তে, গ্র হে। ছা — ই। ছে - -।

। র্সা না না। না না র্সা। র্সা নর্সর্রা র্সা। র্সা র্সনা র্সা।
। অ সী ম। আ কা শ। নী ল, শ। ত দ ল।

। র্সনা র্সর্রা র্রা। র্র্সা র্র্মা র্গমা। র্র্গা র্সা নর্সা। ঞা ধঞা পধা।
। তো মা র। কি র ণে। স দা, ট। ল, ট ল।

। মা পা পা। পা পা পধা। মা পমা পা। পর্সা র্সনা র্সঞা।
। তো মা র। অ মৃ ত। সা গ র। মা ঝা রে।

। ধঞা -ধা ধঞা। পা মপা মপধা। পমা -ঙ্গা -রঙ্গমা। রা -। -সা॥
। ভা — সি। ছে অ বি। রা — —। মে — —॥

হাইনের কবিতা।

(জর্ম্মান্ হইতে অনুবাদিত)

১

স্বপ্ন দেখেছিনু প্রেমাগ্নি জ্বালার,
সুন্দর চুলের, সুগন্ধি মালার,
তিক্ত বচনের, মিষ্ট অধরের,
বিমুগ্ধ গানের, বিষণ্ণ স্বরের।

সে সব মিলায়ে গেছে বহুদিন,
সে স্বপ্নপ্রতিমা কোথায় বিলীন।
শুধু সে অনন্ত জ্বলন্ত হুতাশ
ছন্দে বদ্ধ হয়ে করিতেছে বাস।

তুমিও গো যাও, হে অনাথ গান,
সে স্বপ্নছবিরে করগে সন্ধান।
দিলাম পাঠায়ে, করিতে মেলানী,
ছায়া-প্রতিমারে বায়ুময়ী বাণী।

২

আঁখি পানে যবে আঁখি তুলি,
দুখ জ্বালা সব যাই ভুলি।
অধরে অধর পরশিয়া
প্রাণমন উঠে হরষিয়া।
মাথা রাখি যবে ওই বুকে
ডুবে যাই আমি মহা সুখে।
যবে বল তুমি, “ভালবাসি,”
শুনে শুধু আঁখিজলে ভাসি।

৩

প্রথমে আশাহত হয়েছিনু
ভেবেছিনু সবে না এ বেদনা ;
তবুত কোনমতে সয়েছিনু,
কি করে' যে সে কথা শুধায়োনা !

৪

নীল বায়লেট নয়ন দুটি করিতেছে ঢলঢল,
রাঙা গোলাপ গাল দুখানি, সুধায় মাথা সুকোমল।
শুভ্র বিমল করকমল ফুটে আছে চিরদিন !
হৃদয়টুকু শুষ্ক শুধু পাষাণসম সুকঠিন !

৫

গানগুলি মোর বিষে ঢালা ;
কি হবে আর তাহা বই ?
ফুটন্ত এ প্রাণের মাঝে
বিষ ঢেলেছ বিষময়ী !

গানগুলি মোর বিষে ঢালা,
কি হবে আর তাহা বই ?

বুকের মধ্যে সর্প আছে,
তুমিও সেথা আছ অয়ি !

৬

তুমি একটি ফুলের মত মণি,
এম্‌নি মিষ্টি, এম্‌নি সুন্দর !
মুখের পানে তাকাই যখনি
ব্যথায় কেন কাঁদায় অন্তর !
শিরে তোমার হস্ত দুটি রাখি
পড়ি এই আশীষ মন্তর,
বিধি তোরে রাখুন চিরকাল
এম্‌নি মিষ্টি, এম্‌নি সুন্দর !

৭

রাণি তোর ঠোঁট দুটি মিঠি,
রাণি তোর মধুমাখা দিঠি,
রাণি, তুই মণি তুই ধন,
তোর কথা ভাবি সারাক্ষণ।
দীর্ঘ সন্ধ্যা কাটে কি করিয়া !
সাধ যায় তোর কাছে গিয়া
চুপিচাপি বসি এক ভিতে
ছোট খাট সেই ঘরটিতে ;
ছোট হাত খানি হাতে করে'
অধরেতে রেখে দিই ধরে !
ভিজাই ফেলিয়া আঁখিজল
ছোট সে কোমল করতল !

৮

বারেক ভালবেসে যে জন মজে,
দেবতাসম সেই ধন্য,
দ্বিতীয় বার পুন প্রেমে যে পড়ে
মূর্খের অগ্রগণ্য।

আমিও সে দলের মূর্খরাজ
দুবার প্রেমপাশে পড়ি ;
তপন শশি তারা হাসিয়া মরে,
আমিও হাসি—আর মরি !

৯

বিশ্বামিত্র, বিচিত্র এ লীলা !
দিবেরাত্রি আহার নিদ্রে ছেড়ে,
তপিস্যে আর লড়াই করে' শেষে
বশিষ্ঠের গাইটি নিলে কেড়ে।

বিশ্বামিত্র তোমার মত গরু
দুটি এমন দেখিনি বিশ্বে !
নইলে একটি গাভী পাবার তরে
এত যুদ্ধ এত তপিস্যে !

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। চৈত্র।—পঞ্জিকা বিভ্রাট। প্রবন্ধটি ভাল এবং আবশ্যক কিন্তু সাধারণের আয়ত্তগম্য নহে। জীবন ও কাব্য। লেখক বলিতেছেন, কবির জীবনের সঙ্গে তাঁহার

কবিতার ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে। গাছের সঙ্গে ফলের যোগ আছে বলাও যেমন বাহুল্য, কবির প্রকৃতির সঙ্গে কাব্যের প্রকৃতির যোগ আছে এ কথা বলাও তেমনি বাহুল্য। কিন্তু লেখক একটি নূতন সমাচার দিয়াছেন—তিনি বলেন বর্ত্তমান বাঙ্গলা কবিদের জীবনের সহিত কাব্যের সামঞ্জস্য নাই। বঙ্গ কবিদের জীবনবৃত্তান্ত লেখক কোথা হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করিলেন বলা শক্ত। সামান্যতম মানব জীবনেও কত প্রহেলিকা কত রহস্য আছে, তাহা উদ্ভেদ করিতে কত যত্ন, কত নিপুণতা, কত সহৃদয়তার আবশ্যক। লেখক ঘরে বসিয়া অবজ্ঞাভরে বঙ্গ কবিদের জীবনের উপর দিয়া, যে, তাঁহার মহৎ লেখনীর একটা কালীর আঁচড় চালাইয়া গিয়াছেন কাজটা তাঁহার মত লোকের উচিত হয় নাই। কারণ, তাঁহার প্রবন্ধে তিনি খুব উচ্চদরের নীতি-উপদেশ দিয়াছেন, অতএব লেখার সহিত লেখকের জীবনের যদি অবশ্যম্ভাবী যোগ থাকে তবে তাঁহার নিকট হইতেও ন্যায়াচরণ সম্বন্ধে মহৎ দৃষ্টান্ত প্রত্যাশা করিতে পারি। যাহা হউক্, একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত—আজকালকার কবি যদি কাব্যে কাপট্য করেন সত্য হয়, যাঁহারা সমালোচনা করেন কবিকে উপদেশ দেন তাঁহারা যে অকৃত্রিম সারল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহারও প্রমাণ আবশ্যক। আসল কথা, কাব্যই লিখুন্ আর সমালোচনাই লিখুন, সকল বিষয়েই অধিকার অনধিকার আছে, তাহাই বুঝিতে না পারিয়া অনেক লেখক মিথ্যা কাব্য লেখেন এবং অনেক সমালোচক কাব্য হইতে যথার্থ সত্য ও সৌন্দর্য্য উদ্ধার করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

সুখাবতী। বিখ্যাত ভ্রমণকারী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় সুখাবতী অর্থাৎ বৌদ্ধ স্বর্গ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ লিখিয়া-

ছেন। হিন্দু মুসলমানদের স্বর্গে যেরূপ ভোগের প্রলোভন আছে বৌদ্ধদের স্বর্গে সেরূপ নাই। বৌদ্ধ স্বর্গে প্রাণীগণ হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া পরস্পরের উপকার ও সুখবর্দ্ধনে নিযুক্ত। "তাঁহাদের এই মূলমন্ত্র, যে, জগতে যাহা কিছু সুখ আছে, সমস্তই পরের উপকার করিতে বাসনা করিলেই লাভ করা যায়। স্বার্থচিন্তাতে কেবল অনবচ্ছিন্ন দুঃখরাশিই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কল্পবৃক্ষগণেরও ফলপ্রদান সময়ে স্বভাবতই শরীর কম্পিত হইয়া থাকে, অপরিসীম ক্ষীর সমুদ্রও অমৃতাভিলাষী দেবগণ কর্ত্তৃক মথিত হইয়া কম্পিত হন, কিন্তু এই সুখাবতীবাসী বোধিসত্ত্বগণ পরার্থে শত শতবার শরীর দানে নিষ্কম্পভাবে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ। সে সময়ে তাঁহাদের দেহ আনন্দে পুলকোৎকর বহন করে।" আমরা এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম।

চৈত্র মাসের "সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় "প্রাচীন ভারত" প্রবন্ধে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ রাজা শিলাদিত্যের রাজত্ব কালীন "সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব" ব্যাপারের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। শিলাদিত্যের রাজত্বকালে পাঁচবার এই উৎসব কার্য্য যথাবিধি সম্পাদিত হইয়াছিল। * * *

গঙ্গাযমুনার সঙ্গম-স্থল পরম পবিত্র প্রয়াগ এই মহোৎসবের ক্ষেত্র। এই স্থানের পাঁচ ছয় মাইল পরিমাণের বিস্তীর্ণ ভূমিতে উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইত। দীর্ঘকাল হইতে এই ভূমি "সন্তোষক্ষেত্র" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। এই ক্ষেত্রের চারি হাজার বর্গ ফীট পরিমিত ভূমি গোলাপ ফুলের গাছে পরিবেষ্টিত হইত। পরিবেষ্টিত স্থানের বৃহৎ বৃহৎ গৃহে, স্বর্ণ ও রৌপ্য,

কার্পাস ও রেশমের নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য মূল্যবান্ দ্রব্য স্তূপাকারে সজ্জিত থাকিত। এই বেষ্টিত স্থানের নিকটে ভোজনগৃহ সকল বাজারের দোকানের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শোভা পাইত। এই সমস্ত গৃহের এক একটিতে একেবারে প্রায় সহস্র লোকের ভোজন হইতে পারিত। উৎসবের অনেক পূর্ব্বে সাধারণ্যে ঘোষণা দ্বারা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নিরাশ্রয়, দুঃখী বা মাতাপিতৃহীন, আত্মীয়বন্ধুশূন্য, নিঃস্ব ব্যক্তিদিগেকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পবিত্র প্রয়াগে আসিয়া দানগ্রহণের জন্য, আহ্বান করা হইত। মহারাজ শিলাদিত্য আপনার মন্ত্রী ও করদ রাজগণের সহিত এই স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। বল্লভী-রাজ ধ্রুবপতু ও আসাম-রাজকুমার এই করদ রাজগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। এই করদ রাজা ও মহারাজ শিলাদিত্যের সৈন্য, সন্তোষ ক্ষেত্রের চারিদিক বেষ্টন করিয়া থাকিত। ধ্রুবপতুর সৈন্যের বহুসংখ্য অভ্যাগত লোক আপনাদের তাম্বু স্থাপন করিত।

অসীম আড়ম্বরের সহিত উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইত। শিলাদিত্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিপোষক হইলেও হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা করিতেন না, তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়কেই আদরসহকারে আহ্বান করিতেন, এবং বুদ্ধের প্রতিকৃতি ও হিন্দু দেব-মূর্ত্তি উভয়ের প্রতিই সম্মান দেখাইতেন। প্রথম দিন পবিত্র মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইত। এই দিনে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য দ্রব্য বিতরিত হইত, এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুখাদ্য দ্রব্য অতিথি অভ্যাগতদিগকে দেওয়া যাইত। দ্বিতীয় দিনে বিষ্ণু ও তৃতীয় দিনে শিবের মূর্ত্তি মন্দিরের শোভা বিকাশ করিত। প্রথম দিনের বিতরিত দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ এই এক এক দিনে বিতরণ করা হইত। চতুর্থ দিন হইতে সাধারণ দান-কার্য্য আরম্ভ হইত। কুড়ি দিন

এখানে নিছনি কি গৌরবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? (১)
গোবিন্দদাসের একস্থানে আছে

"সই এবে বলি কিরূপ দেখিনু
দেখিয়া মোহন রূপ আপনে নিছিনু।"

তাহার পরই

'যাচিয়া যৌবন দিব শ্যাম রূপের নিছনি।'

এই শেষোক্ত নিছনি অর্থে 'উপহার' ধরা যাইতে পারে, কিন্তু 'আপনে নিছিনু'র 'আপনাকে ভুলিলাম' এরূপ অর্থ কি অধিক সংগত নহে? (২)

অন্যত্র

'পদপঙ্কজপরি মণিময় নূপুর রুণুঝুনু খঞ্জন ভাষ
মদন মুকুর জনু নখমণি দরপণ নিছনি গোবিন্দদাস।'

এখানে 'নিছনি' 'ভণিতা' স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে কি? (৩)
আর একস্থানে দেখিলাম,

'যশোদা আকুল হইয়া ব্যাকুলি রাইএরে করল কোলে
ও মোর বাছনি জান মু নিছনি ভোজন করহ ব'লে।'

এখানে 'নিছনি' দ্বারা বোধ হয় আশীর্ব্বাদ বুঝাইতেছে। (৪)
ঘনশ্যামদাস রচিত পদের একস্থানে আছে

---

১ এস্থলে "নিছনি" অর্থে পূজা। আমার প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি "নির্মঞ্ছন" শব্দের একটি অর্থ আরাধনা। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২ নিছন অর্থে যখন মোছা হয় তখন "আপনে নিছিনু" অর্থে আপনাকে মুছিলাম অর্থাৎ আপনাকে ভুলিলাম অর্থ অসঙ্গত হয় না। শ্রীরঃ—

৩ আমার মতে এস্থলে নিছনি অর্থে পূজার উপহার। অর্থাৎ গোবিন্দদাস চরণ-পঙ্কজে আপনাকে অর্ঘ্যস্বরূপে সমর্পণ করিতেছেন। শ্রীরঃ—

৪ "জান মু নিছনি" অর্থাৎ আমি তোমার নিছনি যাই। অর্থাৎ তোমার অশান্তি অমঙ্গল আমি মুছিয়া লই, যেরূপ ভাবে "বালাই লইয়া মরি" ব্যবহার হয় "নিছনি যাই" বলিতেও সেইরূপ ভাব প্রকাশ হইতেছে। শ্রীরঃ—

'নয়নে গলয়ে ধারা দেখি মুখখানি
কার ঘরের শিশু তোমার যাইতে মিছনি' । (৫)

আর একটি পদে

'সবার অগ্রজ তুমি, তোরে কি শিখাব আমি বাপ মোর যাইবে নিছনি।' (৬)

এবং

'নিছনি যাইয়ে পুত্র উঠহ এখন কহয়ে মাধব উঠি বসিল তখন।' (৭)

এই শেষোক্ত তিনস্থানে নিছনি কি অর্থে যে ব্যবহৃত হইয়াছে তা বুঝিতেই পারিলাম না। সম্ভবতঃ তিনটি প্রয়োগেরই এক অর্থ।

ভক্তিভাজন উত্তরদাতা উপসংহারে বলিয়াছেন "চণ্ডিদাসের পদাবলীতে নিছনি শব্দ কোথাও দেখি নাই" আমাদের বাড়ীতে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের রচিত একখানি পদাবলী আছে। মান্ধাতার জন্মের দুই পাঁচ বৎসর আগে কি পরে সে এডিশনের পুঁথি বাহির হইয়াছিল তা জানিবার কোন উপায় নাই, তবে আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হয় বেশী পরে নয়; চণ্ডিদাসের ভণিতা দেখিয়া তাহা হইতে চারিটি পদাংশ নিম্নে তুলিয়া দিলাম

'অমিয়া নিছনি বাজিছে সঘনে মধুর মুরলী গীত
অবিচল কুল রমণী সকল শুনিয়া হরল চিত।'

এ 'নিছনির' অর্থ কি 'জিনিয়া' ? (৮)

২। 'নন্দের নন্দন গোকুল কানাই সবাই আপনা বোলে
মোপুনি ইছিয়া নিছিয়া লইনু অনাদি জনম ফলে।'

---

৫ আমার বিবেচনায় এখানেও 'নিছনি' অর্থে বালাই বুঝাইতেছে। শ্রীরঃ—

৬ এখানেও তাহাই। শ্রীরঃ—

৭ 'নিছনি যাইয়ে' অর্থাৎ সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া। শ্রীরঃ—

৮ 'অমিয়া নিছনি' অর্থাৎ অমৃত মুছিয়া লইয়া। শ্রীরঃ—

এখানে 'নিছিয়া'র 'ক্রয় করা' অর্থই অধিক সম্ভব। (৯)

৩। 'তথা কনক বরণ কিরে দরপণ নিছনি দিয়ে যে তায়
কপালে ললিত চান্দ যে শোভিত সিন্দুর অরুণ আর।'

৪। 'তনু ধন জন যৌবন নিছিনু কালার পিরিতে।'

এই কয়টি পদ ভিন্ন অন্য কোথাও চণ্ডিদাস 'নিছনি' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন কি না জানি না, এবং উদ্ধৃত পদ কয়টি চণ্ডিদাসের কি না 'ভণিতা' ছাড়া অন্য উপায়ে তাহা আবিষ্কার করিবার যো নাই, ভণিতা দেখিয়া বিচার করিতে হইলে এ কয়টি চণ্ডিদাসেরই ইহা স্বীকার করিতে হইবে; তবে বটতলার প্রভুরা অনেক সময়ই 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপাইয়া থাকেন, বর্ত্তমান পদ কয়টি সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে কি না প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীতে বিশেষ অভিজ্ঞ ভক্তিভাজন উত্তরদাতা বোধ হয় তাহা বলিতে পারিবেন। *

৯ নিছিয়া লইনু—আরাধনা করিয়া লইনু অর্থাৎ বরণ করিয়া লইনু অর্থ হইতে পারে। শ্রীরঃ—

* উদ্ধৃত অংশগুলি চণ্ডিদাসের পদের অন্তর্গত সন্দেহ নাই।

'নিছনি' শব্দ যদি নির্মঞ্ছন শব্দেরই অপভাষা হয় তবে নির্মঞ্ছন শব্দের যতগুলি অর্থ আছে নিছনি শব্দের তদতিরিক্ত অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বিরল। দীনেন্দ্রকুমার বাবু নিছনি শব্দের যতগুলি প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সকলগুলিতেই কোন না কোন অর্থে নির্মঞ্ছন শব্দ খাটে।

দীনেন্দ্র বাবু শ্রম স্বীকার করিয়া এই আলোচনায় যোগ দিয়াছেন সে জন্য আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমাদের প্রাচীন কাব্যে যে সকল দুর্ব্বোধ শব্দ প্রয়োগ আছে সাধারণের মধ্যে আলোচিত হইয়া এইরূপে তাহার মীমাংসা হইতে পারিলে বড়ই সুখের বিষয় হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রশ্ন।

গত সংখ্যক সাধনায় প্রকাশিত "অভিব্যক্তির নূতন অঙ্গ" নামক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার একটি প্রশ্ন আছে, আপনারা ইহার সদুত্তর প্রদান করিলে বাধিত হইব। বাইস্‌মান প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতেরা যখন লামার্ককে একেবারে উড়াইয়া দিয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকেই অভিব্যক্তির একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং বাহিরের প্রভাব কিম্বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচালনাজনিত পরিবর্ত্তন উত্তর বংশে সংক্রামিত হয় বলিয়া স্বীকার করেন না। তখন লামার্কের নিয়ম দুইটিকে অভিব্যক্তির অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা যায় কিরূপে?

পাঠক। কলিকাতা।

এই প্রশ্নের উত্তর ৫৫৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল। সম্পাদক।

উত্তর।

গত সংখ্যক সাধনায় শ্রীযুক্ত বাবু জগদানন্দ রায় মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন, "চিম্‌নি বসাইবার পূর্ব্বে কেরোসিন ল্যাম্পের শিখা অপরিষ্কার ও ধূমাচ্ছন্ন থাকে কেন? চিমনি বসাইলে কি কারণে দীপশিখা উজ্জ্বলতর ও ধূমবিহীন হয়?" ইহার উত্তর এক কথায় দেওয়া সহজ নহে। যে কারণে দীপশিখা চিমনি বসাইবার পর উহা নির্ধূম ও উজ্জ্বলতর হয়, তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমে বুঝা আবশ্যক দীপশিখা কি? এবং তৈল প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ কি প্রকারে দগ্ধ হয়?

অঙ্গার (কার্ব্বন) অথবা জলজানের (হাইড্রোজেনের) সহিত অম্লজান (অক্‌সিজেন) মিশ্রিত হইতেই প্রজ্বলিত হইয়া আলোক উৎপন্ন হয়। বায়ুতে শতকরা ২৩ ভাগ অর্থাৎ প্রায় এক চতুর্থাংশ অক্‌সিজেন বাষ্প থাকে। জ্বলন্ত পলিতা বা একখণ্ড ফসফরস অক্‌সিজেন-পূর্ণ বোতলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। অক্‌সিজনের সহায়তা ভিন্ন অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না। পৃথিবীর অনেক বস্তুর সঙ্গে অক্‌সিজেন সহজে মিশ্রিত হইয়া যায়। বিশেষতঃ যে সকল পদার্থে কার্ব্বন বা হাইড্রোজেনের ভাগ অধিক, (যেমন ঘৃত, তৈল, চর্ব্বি, পাথুরিয়া কয়লা ও কাষ্ঠ প্রভৃতি) সেই সকল পদার্থের সহিত অকসিজেন অতি সহজেই মিশ্রিত হয়। অকসিজেন অন্য পদার্থে মিশ্রিত হইলে তাপ উৎপন্ন হয়। তাহাকেই আমরা দগ্ধ হওয়া বলি।

সকল পদার্থ এক প্রকারে দগ্ধ হয় না। কোন পদার্থ পচিয়া পচিয়া কোন পদার্থ মরিচা ধরিয়া ও কোন কোন পদার্থ অগ্নিবৎ হইয়া পুড়িতে থাকে। কোন পদার্থে অল্পে অল্পে অক্সিজন মিশিলে তাহাকে পচিয়া যাওয়া বলে। যে পদার্থে অকসিজেন খুব শীঘ্র শীঘ্র মিশ্রিত হয়, তাহা ধূধূ করিয়া জ্বলিতে থাকে। বারুদে অগ্নি সংযোগ করিলে, অক্সিজেন মিশিতে কিছুই দেরী লাগে না তাই নিমেষ মধ্যে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে।

বলিয়াছি, কাষ্ঠ, তৈল, প্রভৃতি দাহ্য পদার্থে অঙ্গারের ভাগ অধিক থাকে। অক্সিজেন মিশ্রিত হইলে ঐ অঙ্গার কণাগুলি প্রজ্বলিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ধারণ করে। ইহাকেই আমরা অগ্নিশিখা বলি। দীপশিখারও উৎপত্তি এই-রূপেই হইয়া থাকে।

এই দীপশিখা তিন ভাগে বিভক্ত। (১) অন্তর্দ্দেশ, (২) মধ্যদেশ, (৩) বহির্ভাগ। শিখার ভিতরটি (অন্তর্দ্দেশ) অগ্নিময় নয়। ইহার ভিতর অঙ্গারবাষ্পাদি দাহ্য পদার্থ অপ্রজ্বলিত অবস্থায় থাকে। একটি কাঁচের নলের একমুখ ইহার ভিতর দিলে, অপর মুখ দিয়া বাষ্প নির্গত হইতে থাকে। এই বাষ্পে অগ্নিসংযোগ করিলেই উহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ইহাতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ স্থানের বাষ্প পুড়িতেছে না। এই অন্তর্দ্দেশে অক্সিজেন ভাল করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া এস্থানের অঙ্গারকণা প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ অপ্রজ্বলিত ভাবে অবস্থিত করে (২) মধ্য দেশে বায়ুর অক্সিজেন অধিক পরিমাণে যাইতে পারে, সে জন্য উহা অঙ্গারের সঙ্গে মিশিয়া জ্বলিতে থাকে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নয়। অনেক অঙ্গার কণা কঠিন অবস্থাতে রহিয়া যায়, উত্তাপে তাহারাই শুভ্র উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করিয়া আলোক প্রদান করে। শিখার এই ভাগই জ্যোতির্ম্ময়, অপর ভাগে আলো নাই। (৩) বহির্ভাগে অক্সিজেনের অভাব নাই; এই জন্য উহা দাহ্য বাষ্পের সঙ্গে মিশিয়া উগ্রতেজে পুড়িতে থাকে। অঙ্গারকণা সমুদায় যেমন এখানে আসিয়া পড়ে, অমনি জ্বলিয়া অঙ্গারক বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, জ্যোতির্ম্ময় হইবার অবকাশ পায় না। অঙ্গারকণার যে অংশ জ্যোতির্ম্ময় না হইয়া এইরূপে পুড়িয়া যায় তাহাই ধুমাকারে পরিণত হয়। তাই শিখার বহির্ভাগ হইতে আলো হয় না এবং তাহা অপরিষ্কার থাকে।

এখন যদি কোনও উপায়ে অঙ্গারকণার সহিত অক্সিজেনের অত্যধিক সংমিশ্রণ রহিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সমস্ত অঙ্গারকণাগুলি অল্পে অল্পে পুড়িয়া জ্যোতির্ম্ময় হইবার অবকাশ পায়, এবং দীপশিখার অপরিচ্ছন্নতা ও দূরীভূত হয়; চিম্‌নি বসাইলে সেই কার্য্য সাধিত হয়১ বলিয়াছি, বায়ুতে অক্সিজেন বাষ্প মিশ্রিত আছে। যতটুকু অকসিজেন মিশ্রিত বায়ু দীপশিখাস্থ অঙ্গার

---

১ বিশ্বকোষ অবলম্বনে এই পর্য্যন্ত লিখিত হইল।

কণাগুলির জ্যোতির্ম্ময় অবস্থা প্রাপ্তির জন্য আবশ্যক চিমনি বসাইলে তাহা অপেক্ষা অধিক বায়ু দীপশিখার নিকট যাইতে পরে না। এই জন্যই চিমনি বসাইতে দীপশিখা নির্ধূম ও উজ্জলতর হয়। কিন্তু চিম্নি ফাটা থাকিলে অথবা বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিলে চিমনি থাকা সত্ত্বেও দীপশিখা হইতে ধূম উত্থিত হইতে দেখা যায়। কারণ তাহাতে চিম্নির ভিতরে অধিক বায়ু প্রবেশ করে ও বায়ুস্থিত অক্সিজেন প্রভাবে অঙ্গারকণাগুলি জ্যোতির্ম্ময় না হইয়া একবারে পুড়িয়া গিয়া অঙ্গারকে বাষ্পে পরিণত করে। তাহাতেই ধূম উঠিতে থাকে। ইহা হইতে আরও একটা তত্ত্ব এই পাওয়া যাইতেছে যে দীপশিখায় অধিক বায়ু লাগিলে দাহ্য পদার্থ শীঘ্র পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। খোলা ল্যাম্প অপেক্ষা চিমনিযুক্ত ল্যাম্পে যে কম তৈল পুড়ে ইহাই তাহার প্রধান কারণ।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

বাবু জগদানন্দ রায়ের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

সূর্য্য ও চন্দ্রের আকার উদয় ও অস্তকালে বৃহত্তর দেখায় কেন? এই প্রশ্নের নানা লোকে নানা উত্তর দিয়া থাকে কিন্তু উহার প্রকৃত উত্তর সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মহলে কোন মতভেদ নাই। উদয় ও অস্তকালে এবং অন্য সময়ে আয়তনের যে হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষিত হয় তাহা মনের ভ্রম মাত্র। উপযুক্ত যন্ত্রের দ্বারা চক্ষুকে সাহায্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাস্তবিক আয়তনের কোনই তফাৎ হয় না। মনের এইরূপ ভ্রম হওয়া যদি কাহারও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে তিনি নিম্নলিখিত উপায় সহজেই সন্দেহ দূর করিতে পারেন।

শাদা জমির উপর যদি তিনি একটি কালো চৌকোনা দাগ করেন এবং কালো জমির উপর যদি একটি অনুরূপ শাদা দাগ করেন তাহা হইলে দুই দাগ মাপিয়া ঠিক সমান করিলেও শাদা দাগটির আয়তন অধিক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

চন্দ্র সূর্য্য সম্বন্ধে এইরূপ মনের ভ্রম হইবার কারণ এই যে, উদয় এবং অস্তের সময়ে উহারা ঘর বাড়ি গাছ পালার কাছাকাছি থাকে—আমরা উহাদের পার্থিব জিনিষের সহিত তুলনা করিয়া আয়তন স্থির করি। তাহার পর যখন শূন্যে উঠিয়া পড়ে তখন উহাদের সহিত তুলনা করিবার আর কিছুই থাকে না। অসীম আকাশে যে উহাদের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মনে হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

রাজা ও রাণী	(নাটক)	এক টাকা।
বিসর্জন	(নাটক)	এক টাকা।
রাজর্ষি	(উপন্যাস)	পাঁচ সিকা।
মানসী	(কবিতা)	দুই টাকা।
য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী	(ভূমিকা)	আট আনা।

উক্ত গ্রন্থকারের নিম্নলিখিত গ্রন্থ কলেজ ষ্ট্রীট্ পীপ্‌ল্ লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

কড়ি ও কোমল	(কবিতা)	এক টাকা।
সমালোচনা		এক টাকা।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

আর্য্যামি এবং সাহেবিয়ানা	দুই আনা।
সোনার কাটি ও রূপার কাটি	দুই আনা।
সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা	দুই আনা।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

সরোজিনী নাটক	(পঞ্চম সংস্করণ)	এক টাকা।

নূতন ডল্‌সেটিনা (হারমোনিয়ম)।

নগদ মূল্য ৬৫৲ হইতে ৭৫৲।

প্যারিস প্রদর্শনীতে সর্ব্বোচ্চ স্বর্ণমেডেলধারী বিখ্যাত ফরাসীদেশীয় হারমোনিয়ম আবিষ্কারক রডল্‌ফিল্‌স্ এণ্ড ডিবেন কর্ত্তৃক সলিড্ এবনাইজ্‌ড্ কাষ্ঠে প্রস্তুত। হাপর ভিতরে থাকাতে ঠাণ্ডা লাগে না পোকায় কাটে না। তিন গ্রাম, পাঁচ ষ্টপ্, দুই সেট্ রীড্ আছে। চাবিগুলি গজদন্তনির্ম্মিত ও চওড়া। স্বর প্রবল সুমিষ্ট ও দেশীয় সঙ্গীতোপযোগী। মজবুত বাক্সসমেত ওজনে ১২ সের, পরিমাণে ২৫ × ১৪ × ৮ ইঞ্চি। টেবিল ও বাক্স উভয় হারমোনিয়মই হয়। শিখিবার একখানি পুস্তকও দেওয়া হয়। দুই বৎসরের গ্যারাণ্টি।

চ্যালেঞ্জ মিউজিক্যাল বক্স বা আর্গিন যন্ত্র।

প্রত্যেকের নগদ মূল্য ৭৫৲।

বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী রাগরাগিণীযুক্ত এরূপ প্রবল ও সুমধুর স্বরবিশিষ্ট যন্ত্র এদেশে কখনও আসে নাই। ইহার কল অতিশয় মজবুত এবং দুইটি স্প্রিং থাকাতে একবার চাবি দিলে কুড়ি মিনিট বাজে। মাপ ১৮ × ১০ × ৭ ইঞ্চি।

১ নং	২ নং	৩ নং	৪ নং
১ বিদ্যাসুন্দর	১ কাফি সিন্ধু	১ ভৈরবী	১ সিন্ধু ভৈরবী
২ সারঙ্গ	২ গৌড় সারঙ্গ	২ বারোঁয়া	২ সিন্দুড়া
৩ দেশ	৩ পিলু জংলা	৩ কালাংড়া	৩ জয়জয়ন্তী
৪ ধানশ্রী পুরবী	৪ সোহিনী বাহার	৪ খাম্বাজ	৪ মুলতান
৫ আড়ানা বাহার	৫ বাউলের সুর	৫ বেহাগ	৫ ভুপালী
৬ ঝিঁঝিট	৬ বাগেশ্রী	৬ ঝিঁঝিট	৬ রামপ্রসাদী

ভারতবর্ষে একমাত্র এজেণ্ট ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্।

লালবাজার পুলিষ আদালতের পূর্ব্ব, কলিকাতা।

মূল্যপ্রাপ্তি।

বাবু হরকুমার সরকার	রাজসাহী	২৸৹
„ অনাথকৃষ্ণ দেব	কলিকাতা	২৸৹
„ গোপাললাল মিত্র	ঐ	২৸৹
„ রাধারমণ কর	ঐ	২
„ রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	২৸৹
„ মহিমচন্দ্র ঘোষ	কাছার	২৸৹
„ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	২
„ সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ	২
„ শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	২৸৹
„ সীতাকান্ত চট্টোপাধ্যায়	ঐ	২
কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় স্কোয়ার	বরিসাবেহালা	১৷৴৹
এ, সি, সরকার স্কোয়ার	ডোমার	২৸৹
বাবু রাজকুমার মুখোপাধ্যায়	বরিসাল	২৸৹
এস, পি, সিংহ স্কোয়ার	কলিকাতা	২৸৹
গোপালদাস সেন স্কোয়ার	ঐ	২
বীর নরসিং দে স্কোয়ার	ঐ	২৸৹
গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্কোয়ার	ঐ	২৸৹
টি, পালিত স্কোয়ার	ঐ	২
সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস স্কোয়ার	ঐ	২৸৹
এস, পালিত স্কোয়ার	ঐ	২
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্কোয়ার	ব্যারাকপুর	২৸৹
পি, এল রায় স্কোয়ার	কলিকাতা	২
প্রমথনাথ মিত্র স্কোয়ার	ঐ	২৸৹

ডাক্তার সিংহ	ফরিদপুর	২৸৹
অনারেবল চন্দ্রমাধব ঘোষ	কলিকাতা	২৸৹
অনারেবল ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	২৸৹
সার রমেশচন্দ্র মিত্র	ভবানীপুর	২৸৹
বাবু আশুতোষ বিশ্বাস	ঐ	২৸৹
পি, কে, চক্রবর্ত্তী স্কোয়ার	শিলিগুড়ি	২৸৹
বাবু নীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	২৸৹
„ অন্নদাপ্রসাদ মিত্র	ভবানীপুর	২৸৹
„ অমূল্যচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কালীঘাট	২৸৹
„ হরেন্দ্রনারায়ণ রায়	বালেশ্বর	২৸৹
এ, সি, ঘোষ স্কোয়ার	কলিকাতা	২৸৹
বাবু প্রসন্ননাথ মুখোপাধ্যায়	কালনা	২৸৹
„ যতীন্দ্রনাথ মুস্তফী	বগুড়া	২৸৹
„ দীপ্তেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	২
হিজ্ হাইনেস্ দি কুমার সমরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মণ্ বড় ঠাকুর বাহাদুর	ত্রিপুরা	২৸৹
বাবু নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী	কলিকাতা	২৸৹
„ পান্নালাল মল্লিক	ঐ	২৸৹
„ বেণোয়ারীলাল খাঁ	ঐ	২৸৹
„ কুঞ্জলাল দে	ঐ	২৸৹
„ জ্যোতিষরঞ্জন দাস	ভবানীপুর	২৸৹
„ অনুকূলচন্দ্র ধর	কলিকাতা	২৸৹
„ হরিমোহন লাহা	ঐ	২৸৹
„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	ঐ	২৸৹
„ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	ভবানীপুর	২৸৹

বাবু প্রভাসচন্দ্র মিত্র	ঐ	২৸৹
„ হেমচন্দ্র গোস্বামী	কলিকাতা	২৸৹
„ সাতকড়ি লাহিড়ী	বরাহনগর	২৸৹
„ কালিকৃষ্ণ দত্ত	ঐ	২৸৹
„ ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	২৸৹
„ ভুবনমোহন দত্ত	ঐ	২৸৹
„ দাশরথী লাহিড়ী	শ্রীরামপুর	২৸৹
কে, এম, ঘোষ স্কোয়ার	পূর্ণিয়া	২৸৹
বাবু রমণীমোহন ঘোষ	কলিকাতা	২
„ চারুচন্দ্র দত্ত	ডায়মণ্ডহারবার	১৸৹
„ গিরিশচন্দ্র চৌধুরী	রাজসাহী	২৸৹
„ দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায়	বর্দ্ধমান	২৸৹
„ কিশোরীমোহন বাগচী	কলিকাতা	২৸৹
„ নারায়ণকৃষ্ণ মিত্র	সিলিগুড়ি	২৸৹
„ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	যশোহর	২৸৹
„ রামপ্রাণ গুপ্ত	দিনাজপুর	১
„ প্রিয়নাথ সেন	নাইনিতাল	২৸৹
„ বেণীমাধব মিত্র	কলিকাতা	২
„ যোগেন্দ্রনাথ শীল	জব্বলপুর	২৸৹
„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	২
„ প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	ঐ	২
„ প্রসাদচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	এলাহাবাদ	২৸৹
„ শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	আসাম	২৸৹
„ সুবোধকুমার বসু	কলিকাতা	২৶৹
সুরেশচন্দ্র ঘোষ স্কোয়ার	শ্রীনগর	২৸৹

শ্রীমতী শতদলবাসিনী বসু	শরিসা	২
এইচ, সি, গোস্বামী স্কোয়ার	কলিকাতা	১৸০
কে, এল, বড়ুয়া স্কোয়ার	ঐ	২
আনন্দচন্দ্র আগরওয়ালা স্কোয়ার	ঐ	২
এল, এন, বেজবড়ুয়া স্কোয়ার	ঐ	২
বাবু শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়	পুরুলিয়া	২৸০
„ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	হাবড়া	২৸০
এন্, সি, বড়াল স্কোয়ার	কলিকাতা	২৸০
অপূর্ব্বচরণ গাঙ্গুলি স্কোয়ার	ঐ	২৸০
হিজ হাইনেস দি মহারাজা বাহাদুর	ত্রিপুরা	২৸০
কুমার সত্যবাদী ঘোষাল	ভূকৈলাস	২৸০
শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দেবী	কলিকাতা	২৸০
ডাক্তার ই, ডবলিউ, চেম্বার্স	ঐ	২৸০
আর মুখার্জী স্কোয়ার	কাশ্মীর	২৸০
নীলাম্বর মুখার্জী স্কোয়ার	কলিকাতা	২৸০
বাবু শ্রীশচন্দ্র রায়	মুঙ্গের	১।৵০
„ প্রমথনাথ রায় চৌধুরী	ময়মনসিংহ	২৸০
„ সত্যানন্দ বসু	কলিকাতা	২৸০
„ উপেন্দ্রচন্দ্র বসু	হুগলি	২৸০
„ অধরচন্দ্র কর্ম্মকার	জামালপুর	২
„ ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী	দিনাজপুর	২৸০
„ দিনেন্দ্রকুমার রায়	মেহেরপুর	২৸০
„ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	মজঃফরপুর	২৸০
„ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়	ঐ	।৶০
„ গণেশচন্দ্র দে	কলিকাতা	২৸০

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী	কৃষ্ণনগর	২৸০
বাবু ক্ষেত্রমোহন রায় চৌধুরী	বারুইপুর	২৸০
„ চারুচন্দ্র সোম	কলিকাতা	২
„ কুঞ্জবিহারী দত্ত	কলিকাতা	২৸০
„ গগণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	মুঙ্গের	২৸০
„ আনন্দপ্রসাদ দত্ত	মজঃফরপুর	২৸০
শ্রীমতী আল্‌তাফন্নেছা চৌধুরাণী	বগুড়া	২৸০
বাবু প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়	রাণিগঞ্জ	২৸০
„ গিরিজাভূষণ সেট	কলিকাতা	২
„ মন্মথনাথ ঘোষ	ঐ	২
„ হেমচন্দ্র ভঞ্জ	ঐ	২৸০
„ শ্যামাচরণ দত্ত	ঢাকা	২
সি, কে, আগরওয়ালা স্কোয়ার	ডিব্রুগড়	২৸০
বি, আগরওয়ালা স্কোয়ার	ঐ	২৸০
বাবু আনন্দকৃষ্ণ তরফদার	বগুড়া	২৸০
„ উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	কলিকাতা	২৸০
„ গগণচন্দ্র রায় স্কোয়ার	গাজিপুর	২৸০
„ সতীন্দ্রনাথ ঘোষ	কলিকাতা	২৸০
„ মহিমচন্দ্র মজুমদার	রঙ্গপুর	২৸০
„ চন্দ্রকান্ত রায়	নোয়াখালী	১।৵০
„ অম্বিকানাথ রায়	পাবনা	২৸০
„ কুঞ্জবিহারী ঘোষ	কলিকাতা	১।৵০
„ নিত্যানন্দ নন্দী	সিরাহাল	২৸০
আবদুল গফুর মিঞা সাহেব	ময়মনসিংহ	২৸০
বাবু চন্দ্রনাথ শর্ম্মা	সিলেট	২৸০

বাবু রামেন্দ্রনারায়ণ মিত্র	কলিকাতা	২
„ মধুসূদন রাও	কটক	২৸৹
„ কালীকৃষ্ণ মজুমদার	যশোহর	২৸৹
„ সতীশচন্দ্র বসু	কলিকাতা	২৸৹
„ উপেন্দ্রনাথ বসু	ঐ	২৸৹
„ কালিকুমার মুখোপাধ্যায়	মহাদেবপুর	২৸৹
মুরারীমোহন নন্দী স্কোয়ার	হুগলি	২
বাবু প্রকাশচন্দ্র ঘোষ	জব্বলপুর	২৸৹
শ্রীমতী সৌদামিনী চৌধুরাণী	দিনাজপুর	২৸৹
বাবু নীরদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	২৸৹
অনারারী সেক্রেটারী ইণ্ডিয়া ক্লব	ঐ	১৸৹
কুমার প্রমদানাথ রায় বাহাদুর	ঐ	২৸৹
মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর	নাটোর	২৸৹
বাবু যাদবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	২৸৹
„ হরিদাস রায় চৌধুরী	বড়িসাবেহালা	২
„ মথুরানাথ মৈত্র	ঘোড়ামারা	২৸৹
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত স্কোয়ার	লাহোর	২৸৹
বাবু ক্ষেত্রনাথ শিল	চুঁচুড়া	২৸৹
„ প্রসাদদাস মল্লিক	কলিকাতা	২
„ হরিদাস শাস্ত্রী	রাজপুতানা	২৸৹
„ বিজয়গোপাল পাল	কলিকাতা	২
„ কৃষ্ণপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	ঐ	২
„ ধৈর্য্যনারায়ণ দাস	দিব্রুগড়	২৸৹
„ কামিনীকুমার রায় চৌধুরী	বরিসাল	২৸৹
„ জানকীনাথ মজুমদার	দিনাজপুর	২৸৹

বাবু জ্যোতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	২৸০
„ যোগীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	রঙ্গপুর	২৸০
„ শশিভূষণ ঘোষ	কলিকাতা	২
„ রামশরণ সিংহ	ত্রিপুরা	২৸০
„ পূর্ণচন্দ্র সেন	কলিকাতা	২৷৶০
„ নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী	মহেশগঞ্জ	২৸০
„ গিরীন্দ্রনারায়ণ রায়	রঙ্গপুর	২৸০
„ রাধিকামোহন সাহা	পাবনা	২
„ চারুচন্দ্র রায়	বেহালা	২
ডাক্তার শিবচন্দ্র বসু	ঢাকা	২৸০
বাবু বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র	রামপুরহাট	২৸০
„ রামচন্দ্র মল্লিক	বোলপুর	২৸০
„ হরিদাস বসু	ঐ	২৸০
„ যোগেন্দ্র নাথ মিত্র	মহিষাদল	২৸০
„ বসন্তকুমার রায়	কলিকাতা	২।০
„ অনন্তনারায়ণ শীল	চুঁচুড়া	২৸০
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দে	কলিকাতা	২৸০
„ ইন্দ্রচাঁদ নাহাটা	ঐ	২
„ উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর	ঐ	২
হিজ হাইনেস্ দি যুবরাজ বাহাদুর	ত্রিপুরা	২৸০
হিজ হাইনেস্ দি কুমার দেবেন্দ্রচন্দ্র দেব বাহাদুর	ঐ	২৸০
ঠাকুর ধনঞ্জয় দেব বাহাদুর	ঐ	২৸০
হিজ হাইনেস্ দি কুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববাহাদুর	কুমিল্লা	২৸০
বাবু চারুচন্দ্র বসু	মেহেরপুর	২৸০
„ শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী	ভবানিপুর	২৸০

বাবু নিখিলকান্ত নাগ	ঢাকা	২৸০
„ হরিবিলাস আগরওয়ালা স্কোয়ার	তেজপুর	২৸০
„ অক্ষয়কুমার গোস্বামী	ময়মনসিংহ	২৸০
„ মণিমোহন সেন	বহরমপুর	২৸০
„ যোগেশচন্দ্র সেন	বরিশাল	২৸০
„ গণেশচন্দ্র গুপ্ত	ঐ	২৸০
কে, বি, দত্ত স্কোয়ার	মেদিনীপুর	২৸০
বাবু আনন্দপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	২৸০
„ বিনোদগোপাল মতিলাল	ঐ	২৸০
„ রমণীমোহন রায়	কাঁকিনা	২৸০
„ পুলিনচন্দ্র রায়	কলিকাতা	২
„ শ্যামাচরণ মৈত্র	তেজপুর	২৸০
„ বামনদাস মজুমদার	ফরিদপুর	৩॥/০
„ শ্রীনাথ চৌধুরী	পাবনা	২৸০
„ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	এলাহাবাদ	৩॥/০
„ লালবিহারী সাহা	কলিকাতা	২
„ কেদারনাথ বসু	সাগরদাঁড়ি	২৸০
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	কলিকাতা	২৸০
„ চন্দ্রকুমার সেন	বরিসাল	২৸০
„ যাদব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	চুঁচুড়া	২
„ নরেন্দ্রনাথ বসু	এলাহাবাদ	২৸০
„ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	২
„ পার্ব্বতীশঙ্কর রায়	ঢাকা	২৸০
„ নরেন্দ্রনাথ মিত্র	কলিকাতা	২
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু	যশোহর	২॥০
„ শ্যামাচরণ পাল	কলিকাতা	২॥০
কুমার রমেশচন্দ্র সিংহ	ময়মনসিংহ	২৸০
বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী	কলিকাতা	২
„ যোগেন্দ্রনারায়ণ রাহা	ঐ	২

স্থানাভাবে অবশিষ্ট মূল্যপ্রাপ্তি এবার স্বীকার করা গেল না।